# জঞ্জাল

তাপস মল্লিক

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক—
শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

কর—
কুমার চৌধুরী
প্রিন্টিং ওয়ার্কস
এ, তারক প্রামাণিক রোড
কাতা-৬

# ভূমিকা

বাঙলা সাহিত্যের পুণ্যাঙ্গণে একটা গল্প সঙ্কলনের এই জঞ্জাল নিয়ে ছাড়পত্রের উমেদারি—আমার এ উদ্যম হিতৈষী মাত্রেই সমর্থন-যোগ্য বিবেচনা করেননি। তবু জঞ্জাল প্রকাশিত হ'ল। সাহিত্যের বেসাতিতে কোন্ পণ্যটা দ্রুত বিক্রয়শীল আর কোন্‌টা নয়, সে সমস্যা মার্কেট রিসার্চ-এর হতে পারে—সাহিত্য সাধনার নয়। সম্প্রতি ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতেরা কিছু উত্তেজক সমীক্ষা চালাচ্ছেন, কিছু কিছু সুচিন্তিত লেখা চোখে পড়ছে—এই ভরসা। গল্পে দুর্বোধ্যতা. যার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সাহিত্যে ফিউডল্-পন্থী দু'একটি সাময়িকী, ভবিষ্যতের জন্য দুর্বোধ্যতর কিছুর ভূমিকা রচনা করছে কিংবা কালাতীত সুরুচির, তার উত্তর মিলবেনা শেকড়ের দিকে পোকা আরও কয়েক পা না এগোলে। সমাজ যেখানে ঊর্দ্ধগামী তেলা বাঁশে আনাড়ী বাঁদরের যোগ-বিয়োগ ফলের মত, সাহিত্যিকে সেখানে হয়ে উঠতে হবে 'মড্'—ফ্যাশন পত্রিকার পাতা থেকে খসে পড়া আজকের তরুণ-তরুণী যেমন শোভা পাচ্ছে শুয়োরের খোঁয়াড় তুল্য আবাসভূমে। বাঙালী তথা বৃহত্তর ভারতবাসীর এই হয়েছে আজকের সাচ্চা পরিচয়। এর মাঝে জঞ্জালের কটা গল্প যুগান্তরের সূচনা আনবে না। এই অধম বহু দেশে বহু সমৃদ্ধির দোর ছুঁয়ে পাওয়া হীনমন্যতায় সনিষ্ঠ চেষ্টা করে গেছে জঞ্জাল চিনবার। সে জঞ্জাল তার একান্ত আপনার, অথচ বর্জনীয়। যা চিনেছি, জঞ্জালে লেখা রইল।

জঞ্জাল সরাবে কে? আমরা যুগাবধি সেই শুদ্ধাচারী ধাঙড়ের জন্মলগ্নের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

—তাপস মল্লিক

# ॥ জামরঙ ॥

মেডিকেল পাশ করে বনবাসে এসেছি আমি। পালামৌর বন। গাঁয়ের নাম বালুমাত। রাঁচী থেকে চাতরা যাবার পথের ধারে কিছু বুনো মানুষের বসতি।

আমি এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার। আমার অভিজ্ঞতা মোট একবছর।

হাসপাতালের সামনেই এখানকার থানা। মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথ চলে গেছে রাঁচী থেকে চাতরা, আবার চাতরা থেকে গয়া পর্যন্ত। সারাদিনে তুবার মাত্র মুখর হ'য়ে ওঠে এই পথ। রাঁচী থেকে বাস আসে সকাল দশটায়। রাঁচীর দিকে বাস ফিরে যায় রাত আটটায়। তাছাড়া সারাদিন নিঝুম। কচিৎ কখনও গুরুভারে আর্ত কোন ট্রাক, আর নয় বেজায় ব্যস্ত জীপকার শান্তিভঙ্গ করে। দল বেঁধে হাট করতে আসে যত ওঁরাওভূঁইয়া, তারাও পথ চলে নিঃশব্দে। পালামৌর কোন কালো মেয়ে হয়ত হঠাৎ কাঁচা বয়সের কাকলী ছড়িয়ে যায় পথ চলতি প্রগল্‌ভতায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি। প্রি-মনশুনের দাক্ষিণ্যে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। কাদা হয়েছে হাসপাতালের সামনে। বিকেল বেলা। চুপ করে হাসপাতালের ঘরে বসেছিলাম। দেখছিলাম, পালামৌর কাদার রঙ্‌ও লাল। তাতে মাটির চেয়ে কাঁকড় বালি বেশী।

আকাশ মেঘে মেঘে ধূসর। ঝড় বৃষ্টি আসবে আবার।

কোয়েলিয়ার চারপাইটা এনে ওই জলকাদার মধ্যেই নাবাল ওরা। ঘরের মধ্যে বসেই দেখতে পেলাম চারপাই থেকে কাদার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

বাইরে উঠে গেলাম। হাসপাতালের বারান্দা থেকে নীচে নাবলাম। এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে।

তুজন পুরুষ আর তুজন মেয়েমানুষ সঙ্গে এসেছে কোয়েলিয়ার। পুরুষতুটো বয়ে এনেছে চারপাইটা। সেটার মাপ একটা জলচৌকির মত। হাত তিনেক

লম্বা। সেটাকে উল্টো করে চারপায়ার সঙ্গে বাঁশ বেঁধে একটা ডুলির মত বানান হয়েছে। তারই মধ্যে কোনক্রমে বয়ে আনা হয়েছে দেহটাকে।

কাঁকড় মাটির কাদার মধ্যে মুখগুঁজে পড়ে আছে কোয়েলিয়া। পিঠটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। দুপায়ে দুহাতে মাটি আঁচড়াচ্ছে। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে। নোংরা জামা কাপড় শয্যাবস্ত্র। দুর্গন্ধে শ্বাস নেওয়া যায় না।

চারপাই-এর ওপর একটা কাঁথা পাতা ছিল। রক্তে সেটা কালো হ'য়ে গেছে। শুধু রক্ত নয়। সেই সঙ্গে চাপচাপ কালো সাদা কি সব যেন। কি যে তা ঠিক বোঝা গেলনা। মাটিতেও বারকতক রক্তবমি করল কোয়েলিয়া। ভলকে ভলকে কালো রক্ত বেরোল। সেই সঙ্গে আরও কালোসাদা চাপচাপ পদার্থ।

একজন বলল, জামুন। অর্থাৎ জাম। রাক্ষুসী জাম গিলছিল গাছে চড়ে। সারাদিন রাশি রাশি জাম গিলেছে। নাবার সময় ডাল ভেঙ্গে পড়েছে ওপর থেকে। পেটে লেগেছে। এখন ওই বা বাঁচে কি করে, আর ওর—।

যন্ত্রণায় পাক খেয়ে উঠল কোয়েলিয়া। হঠাৎ একেবারে চিৎ হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে চমকে উঠলাম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ফেরালাম। উঃ, ছি ছি ছি! এরা কি মানুষ?

পূর্ণ মাতৃত্বের বৃদ্ধিতে কদাকার হয়ে উঠেছে ওইটুকু দেহটা। প্রায় বিবস্ত্র অবস্থা। কালো অপরিচ্ছন্ন দেহে যৌবনের জোয়ার দেখা দিয়েছে। তার ওপর সন্তানবতী। কাদা রক্ত আর জামে এক বিভৎস সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে। মুখের যতটুকু বোঝা যায় যন্ত্রণায় নীল। নীল হয়ে রয়েছে মুখের ভেতরটাও। জামরঙ।

ওদিকে ওরা আর এক নাটক জুড়েছে। সেইখানেই মাথা কুটছে একটা মেয়েমানুষ। বুক চাপড়াচ্ছে অন্যটা। পুরুষ দুটো অশ্লীল ভাষায় ধমকাচ্ছে তাদের। নরক বানিয়েছে হাসপাতালটাকে ওরা।

তার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। কোয়েলিয়াকে ধরাধরি করে হাসপাতালের বারান্দায় তোলা হল।

আমার কিছু করবার নেই। আমি একেবারে আনাড়ি। পেটে লেগেছে মেয়েটার। ওর এখন যা অবস্থা সাধারণ দশজনের মত চিকিৎসা হতে পারে না।

এতটুকু বোঝা সহজ ছিল ভ্রূণটা মারা গেছে। প্রাথমিক যা কিছু করা আয়ত্তের মধ্যে ছিল এলোমেলো ভাবে করলাম। এমন কেস কখনও হাতে আসেনি। না আছে আমার অভিজ্ঞতা, না আছে হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম। কোয়েলিয়া আমায় মহা ফাঁপড়ে ফেলল।

ওকে এখানে রেখে কোন লাভ নেই। অবস্থা যা যতশীঘ্র সম্ভব অপারেশন্ করাতে হবে। আমার হাসপাতালে তার ব্যবস্থা নেই। মান্দারে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আধুনিক হাসপাতাল হয়েছে। যে করেই হোক সেখানেই পাঠাতে হবে। মহাসমস্যা। মান্দার প্রায় মাইল পঞ্চাশেক। এতটা পাহাড়ী পথ আর বাইরে এই দুর্যোগ।

একমাত্র ভরসা লালতা প্রসাদের জীপকার। কথাটা মনে পড়তেই বর্ষাতি চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

গাড়ী পাওয়া গেল। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার আর কোয়েলিয়ার বরের সঙ্গে কোয়েলিয়াকে মান্দারে পাঠিয়ে দিলাম।

গাড়ী চলে গেল। বৃষ্টিতে হাসপাতালের সামনে থেকে কোয়েলিয়ার রক্ত ভেসে গেল। জামের কালো সাদা চাপগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল তখন।

চারপাইটা তুলে নিয়ে ওদের বাকী তিনজন গাঁয়ের দিকে ফিরে গেল।

লালতা প্রসাদের জীপকার ভোর রাত্রের দিকে ফিরে এল। কম্পাউণ্ডার জানাল, চমৎকার ব্যবস্থা ওখানে। অপারেশন হয়ে গেছে। মরা বাচ্চার মুখ দেখে কোয়েলিয়া ঘুমচ্ছে এখন।

* * * *

পরের বছর কলকাতা থেকে আমার ছোট মাসি এলেন। বিধবা মানুষ। বিয়ের বছরখানেক পরেই বিধবা হয়েছেন। ছেলেপুলেও হয়নি কিছু। মাসি আমার চেয়ে বয়সে তিনবছরের বড়। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন আমার। মামার বাড়ীতে ছোটমাসির সঙ্গে মানুষ হয়েছি। পড়াশুনা করেছি একসঙ্গে। পরে আমি ডাক্তারী পড়তে পাটনায় চলে আসি। মাসি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত আর বাঙলায় দুবার এম, এ, পাশ করেন। এখন ওখানেরই লেকচারার।

গরমের দুটো মাস আমার কাছেই থাকবেন মাসি। কলকাতার অজীর্ণ রুগী। হাল্কা পাখীর মত চেহারা। ওখানে খানিকটা জল বেশী খেয়ে ফেললে চোঁয়া ঢেকুর উঠত।

পালামৌর জলের গুণই আলাদা। পাথর খেয়ে পাথর হজম করতে লাগলেন মাসি। নেচে বেড়াতে লাগলেন বনে জঙ্গলে। সমাজের বাঁধন এখানে আলগা। সঙ্গে সমবয়সী বোনপো। বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নেই। এক নিরামিষ খাদ্যের সংস্কার টুকু রেখে বাকী সব ছাড়লেন। কিছুদিনের জন্যে আবার কুমারীব্রত নিলেন মাসি।

মুঠো মুঠো পিয়াল কনোয়দ বুনো খেজুর চিবোন। বনের মধ্যে ছুটোছুটি করতে করতে খপ. করে চেপে ধরেন আমায়, বলেন, মারব তোকে, ভারি ইয়ে না তুই। বিয়ে করিসনা কেন রে? ভাল লাগে এই জঙ্গলে একলা একলা। দাঁড়া, ফিরে যাই ওখানে, করছি তোর ব্যবস্থা।

কোয়েলিয়ার গল্প বললাম মাসিকে। লণ্ঠন জ্বলছিল মাঝখানে। ময়লা আলোয় মাসির চোখে জল চিক্‌চিক্ করে উঠল। চোখ মুছে বললেন, মরলনা কেন রাক্ষুসী?

জানতাম, জাম মাসির কাছে সুখাদ্যের সেরা। ভিজে চোখে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, মেয়েটার কোন ক্ষতি হয়নিত'?

—জানিনা, তবে ঘটনার তিনমাস পরে বাঘে খেয়েছে ওর মরদটাকে। ক্ষতি বলতে কি মিন্ করছ তুমি?

দুটো মাস চমৎকার কেটে গেল। এদিকে বর্ষার সময় হ'য়ে এল। মাসিকে এবার ফিরে যেতে হবে। শরীরটির বেশ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কলকাতার লোক চিন্‌তে পারলে হয়। দুমাসে পাঁচ বছর বয়স কমে গেছে মাসির। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, দেখো শিলু, চেহারাখানা যা বাগিয়ে যাচ্ছ, আবার এক নতুন মেসোর মাথা খেয়োনা।

ছাতুর দেশের রসিকতা আমার। কৌতুকের সঙ্গে কতখানি কটুতা মিশে ছিল ওজন করতে পারিনি। শুনে মাসি কেঁদে ভাসালেন। তাঁর কিছু অশ্রু আমাকেও সিক্ত করল। বিব্রত হয়ে আমি হাসপাতালে পালালাম।

ফিরে যাবার কথাবার্তা হচ্ছিল। মাসি বললেন, কেন তাড়াচ্ছিস্ রে? থাকতে দেনা তোর কাছে। বউ আন্, আপনি চলে যাব। চুপ করে রইলেন, আবার বললেন, না বাবা, ফিরেই যাই। ওদিকে আবার—, যা সব। এই যে এলাম, থাকলাম, এই নিয়েই দেখনা—। কবে তাড়াবিরে আমায়?

মাসি বোঝেন না, বর্ষা নেবে গেলে এদিকের নদীনালা সব ভরে যাবে। বাস

সার্ভিস কেটে দেওয়া হবে। লালতা প্রসাদের জীপকার নৌকোর কাজ দেবেনা।

যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। টোরি পর্য্যন্ত বাসে, টোরি থেকে ডিহিরি পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জারে সঙ্গে যাব আমি। ডিহিরি থেকে মেল ট্রেন ধরে মাসি একলাই ফিরে যাবেন। হাওড়ায় বাড়ীর লোক থাকবেন।

মাসির যাবার দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গল আমার। তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। আমরা তখনও বারান্দায় শুচ্ছি। পাশেই মাসির খাট। দেখি, উঠে বসে আছেন। আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। আমি চোখ খুলতেই মুখ ঘোরালেন। চোখ দুটো বড় করুণ মনে হ'ল। মন খারাপ রয়েছে মাসির।

উঠে পড়লাম। বললাম, চল শিলু, তোমায় আজ সূর্য্য ওঠা দেখাব। গেট্ আপ্।

যেমন অবস্থায় ছিলাম সেই ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। লম্বা পিচঢালা পথ। আমরা রাঁচীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। পথে লোকজন নেই। দুজনে আমরা পাশাপাশি মুখ বুঁজে হাঁটছি। কারুর কিছু বলবার নেই।

পাকা পথ ছেড়ে মেঠো পথ ধরলাম। তারপর মেঠো পথ ছেড়ে বিপথ। উঁচু নীচু টিলা খানাখন্দ ডিঙ্গিয়ে মাসিকে প্রায় কোলে তুলে একটা ছোটখাট পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এলাম। আর এগোবার পথ নেই। সামনে গভীর খাদ। বহু নীচে পাহাড়ী নদীর বালি রেখা। ওপারে বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তর। শালের আদিগন্ত বিস্তারে ভোরের আঁধার মুখ লুকিয়ে আছে। আরও পেছনে, দূর আকাশের কোল থেকে উৎক্ষিপ্ত আলোর ফোয়ারা। ক্রীমসন্ স্কারলেট ইনডিগোর আবীর উৎসব।

কোলে চড়ে এতটা পথ এসে মাসির অবস্থা কাহিল। হাঁফাচ্ছিলেন। তুলে একটা উঁচু পাথরের ওপর বসিয়ে দিলাম। বললেন, আমি কিন্তু খুব পারতাম। একহাতে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইলেন।

দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠাপড়া চলছে। আকাশের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন মাসি। মুখে আলো পড়ছে। চোখ ফেরালাম আমি। ভোরের আলোয় মাসিকে রক্তিম দেখাচ্ছিল। অপরিচিতার মত।

বেশ খানিকটা নির্বাক সময় কেটে গেল। একসময় কানের কাছে অতি ধীরে উচ্চারণ করলেন মাসি, অনুপূর্বাঃ রূপতে বাবশানা—

—সবটা বল। আমি জানতে চাইলাম।

—শুনবি! ঋক্‌-এ আছে, ঊষার প্রশস্তি।

কিয়াত্য যৎসময়া ভবাতি যা বুষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্

অনুপূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি।

—মানে বল। আমি ত' কিছুই বুঝিনা।

আমার কথা যেন কানে যায়নি মাসির। মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে চললেন, "কতকাল ধরে ঊষা উদিত হচ্ছেন, আরও কতকাল উদিত হবেন। আজকের ঊষা গতকালের ঊষার অনুসরণ করছেন। আবার আগামীকালের ঊষা আজকের এই দীপ্তিমান ঊষাকে অনুসরণ করবেন।" কত রাত্রি শেষে আমাদের জীবনেও এমনি কত ঊষা এল, কিন্তু কই, আঁধার ত' ঘুচল না। জেগে রইল আলোর আবর্তে আঁধারের পিপাসা। তাই আবার বলছি, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।

তমসা বিদীর্ণ করে জ্যোতির্ময় উদিত হলেন।

পালামৌর লাল মাটিতে পাহাড়ে প্রান্তরে প্রতিহত কৌমারবর্ণ আবীর ছড়াচ্ছে। দুপাশে শালের স্নিগ্ধবর্ণা শীর্ষে শীর্ষে মুঠোমুঠো আদিত্য রেণুর অপচয়। আমাদের মুখে মাথায় তারই পর্যাপ্ত দান। মুগ্ধ দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছিলাম। ক্রমে উপলব্ধি হচ্ছিল, এই অপরূপ থেকে রূপাতীতের অনুসরণ অসম্ভব নয়।

মাসি আমার চুলের মধ্যে থুতনি গেঁথে বসেছিলেন। হাতদুটো কাঁধের ওপর অলসভাবে ফেলা। খানিকক্ষণ পর মাথাটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ল। কয়েকফোঁটা অশ্রু টপটপ করে ঝরে পড়ল আমার কপালের ওপর। অনুভব করলাম তার তাপ এই ভোরের সূর্য্যকিরণের চাইতে বেশী নয়।

মাসি বললেন, জানিস্, অনেক অনেক পুরোন দিনে—

—সেই হর্ষবর্ধনের সময়।

—নারে, আরও অনেক অনেক—

—মানে, একেবারে সেই সভ্যতার আদিপর্বে!

—ঠিক তাই। সেই তখন, সবই এইরকম বন ছিল। মানুষও ছিল। তবে অন্যরকম মানুষ। না ছিল সমাজ. না ছিল নিয়ম কানুনের বালাই। কি যে যা তা ছিলনা মানুষগুলো—।

অবাক হলাম আমি। বলতে কি চান মাসি। এমন সুন্দর ভোর, আর

সেই আদিম বর্বরতার চর্চা। সামঞ্জস্য কোন্‌খানে? বললাম, দেখ শিলু, খাপছাড়া শোনাচ্ছে। এমন সুন্দর ভোরে খামকা কেন গুরুজনদের—

—থাম্‌ তুই, বেশ করব। ইস্‌, কিরকম সব বেপরোয়া ছিল। বিস্ট্‌— পশুদের মত। তফাৎ কোথায়। বিধিনিষেধের বালাই নেই যাদের?

বিদ্বেষের উষ্মায় ভোরের আলোয় মাসির গৌরী মুখ আশ্চর্য্য সুন্দর লাগছিল। ভোরের হাওয়ায় উড়ছে অবিন্যস্ত চুল। সেই অবস্থায় মাসির মনোভাব বহুলাংশে বুঝতে না পেরেও তারমধ্যে এক আশ্চর্য্য শুচিতার সন্ধান পেলাম।

আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলাম। মাসির ফিরে যাওয়া স্থির হবার পর থেকেই এমন স্তব্ধতাকে ভয় পেতে আরম্ভ করেছি আমি। তাই খাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, আচ্ছা শিলু, ধর যারা এত প্রিমিটিভ্‌ তাদের একজন ওইখান থেকে তরতর করে উঠে এল, দিলে আমায় একচড়ে সাবাড় করে। আর তোমায় কাঁধে তুলে—।

—দূর বোকা, চুপ কর। শিলুমাসি খপ্‌ করে আমার মুখটা চেপে ধরলেন। বললেন, নখদন্তের সামনে বন্দুক তুলে দাঁড়ানটা কি মানুষের পরাজয় রে। থাক্‌গে বাজে কথা— হ্যাঁরে, তুই পারতিস্‌, হঠাৎ এমনি বর্ব্বর হয়ে উঠতে? না না, আর কথা নয়, চলরে ফিরি এবার। তাড়াবিনা আজ আমায়! ফিরে গিয়ে এখানের জন্য বড্ড মন কেমন করবে। তুই বিয়ে না করলে কিন্তু আমি আর আসছিনা। কথা দে।

রোদ বাড়ছে। আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরছি আমরা। মাসির আবার মুখ খুলে গেছে। কথার বিরতি নেই।

যাবার সময় চোখে পড়েনি, ফেরার পথে পড়ল। একটা বাচ্চা জামগাছ। দুজনে আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম। অতটুকু গাছে আর পাতা দেখা যাচ্ছে না। ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। কালোয় কালো। অদ্ভুত বড় বড় পুরুষ্ট জাম। মাসি পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। আমিও ছুটলাম। হাতের মধ্যে যে কটা পেলেন পেড়ে পেড়ে মুখে পুরলেন মাসি। আমিও অনেক পাড়লাম। আর সব উঁচুতে। হাত যাচ্ছেনা। মাসি আব্দার ধরলেন, পাড়নারে, পাড়নারে লক্ষ্মীটি। আমি খুঁজে পেতে একটা শালের ডাল ভেঙ্গে আনলাম। আরও অনেক জাম পড়ল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে আঁচল ভরছেন মাসি। শাড়ীটা গেল।

এমনি সময় দূর থেকে ছুটে আসতে দেখলাম একটা মেয়েকে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল আমাদেরই সামনে। কোয়েলিয়া।

—আরে কোয়েলিয়া, তু! শিলু এই যে, এই মেয়েটাই, এর কথাই তোমায় বলছিলাম। সাড়ম্বরে দর্শনীয় একটা কিছু যেন মাসির সামনে মেলে ধরলাম আমি।

—তোকা। তোড়ি জামুন? হেসে লুটিয়ে পড়ছে যেন কোয়েলিয়া। কিসের এত উল্লাস ওই জানে। গায়ে উল্‌কি, একগাদা স্থূল গয়না, সেই অনুপাতে খুবই স্বল্প বাস, কোয়েলিয়াকে মাসি দেখছিলেন দৃষ্টিতে একপ্রকার বিজাতীয় বিদ্বেষ নিয়ে। কোয়েলিয়া সে দৃষ্টির ভাষা বোঝে না। তাই অবাধ উল্লাসে ও তুবড়ির মত কথার ফুল্‌কি ছুড়ছিল। বললে, রাম জানে, জাম আর সে খায় না। তবে, পেড়ে দিতে দোষ কি? উনি খাবেন। দেখবে আমরা কি রকম জাম পাড়ি!

সম্মতির অপেক্ষায় রইলনা। তরতর করে উঠে গেল গাছের মগডালে। প্রবল বিক্রমে দোলাতে লাগত সারাগাছটা। চেঁচিয়ে শোনাচ্ছে ওখান থেকেই, গতবছর এই গাছ থেকেই তো পড়েছিল। তাইত দেখছ এত জাম। জংলী মানুষেরা কেউ ছোঁয়না। তোমরা ইংরিজি পড়া মানুষ। তোমরা কেন খাবেনা? ওরা বলে, এ গাছে ডাইনী আছে।

ডাইনী গাছ দোলাচ্ছে। রাশি রাশি জাম ঝরে পড়ছে তলায়। মাটি কালো হয়ে গেল। আমাদের গায়ে মাথায় জাম পড়ছে। গাছের ওপর হি হি করে হাসছে কোয়েলিয়া। চিৎকার করে কতকি বলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে জাম পড়ার। ডাল ঝাঁকানর অবিশ্রান্ত শব্দ।

মাসির দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম আমি। দুহাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপছেন। আঁচলের সব জাম মাটিতে। আমি ভয় পেলাম। লাগল নাকি চোখে মুখে। কাছে গিয়ে মুখের হাত সরাতেই মাসি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমায় জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠলেন, নাবতে বল্ ওকে, ওযে আবার— বলনারে—।

মটাস্ করে একটা ডাল ভাঙ্গার শব্দ হল ওপরে। খপ্ করে অন্য একটা ডাল চেপে ধরল কোয়েলিয়া। এক মুহূর্তের জন্য সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই আবার সমান বিক্রমে গাছ দোলাতে লাগল কোয়েলিয়া।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাসি ছুট লাগালেন এবার। আমিও ছুটলাম পেছনে।

পাকা রাস্তার ওপর উঠে এলাম। ওদিকে গাছের ওপর থেকে ডাইনীর হাসি শোনা যাচ্ছে তখনও।

বাকী সারাটা পথ প্রায় ছুটেই এলেন মাসি। বাড়ী পৌঁছে একেবারে কাহিল অবস্থা। বারান্দায় তখনও বিছানা পাতাই ছিল। মাসি একেবারে তারমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমি যে কি করব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি খানিকটা কোরামিন এনে দিলাম। খেলেন সেটুকু। প্রথম বর্ষার ভ্যাপ্‌সা গরম। দরদর করে ঘামছেন মাসি। একটা তালপাখা নিয়ে ব্যাস্তভাবে বাতাস করতে লাগলাম। আলুথালু বেশে নির্জীবের মত পড়ে রইলেন মাসি।

স্টোভ জ্বালিয়ে খানিকটা দুধ গরম করার জোগাড় করছিলাম। মাসি কিছুতেই রাজী হলেন না। আমায় বললেন পাশে এসে বসতে। তালপাখাটা হাতে নিয়ে আমি গিয়ে বসলাম। আমায় জড়িয়ে ধরে চুপ করে শুয়ে রইলেন মাসি।

কেন মাসি এতটা উতলা হলেন বসে বসে তাই চিন্তা করছিলাম। কোন প্রশ্ন করার সাহস হচ্ছিল না। এই ভাবেই বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

এমন সময় মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল কোয়েলিয়া। ঝুড়িটা বারান্দায় নাবিয়ে দিল। ঝুড়ি ভর্তি বাছাবাছা উৎকৃষ্ট জাম।

আমরা সামলে বসার সুযোগ পাইনি। কোয়েলিয়া একগাল হেসে বলল, এই নাও বাবুজী, আমার মাঈজীর ভেট্। তোমার বহু বড় দুলারা। বলেই খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল।

ছিট্‌কে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ছি ছি। নির্বোধ মেয়ে। যা ভাল লেগেছে, ভেবে বসে আছে।

মাসিও বুঝেছিলেন। যেন ক্ষেপে উঠলেন হঠাৎ। শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে একটা নাটক সৃষ্টি হ'ল। ছুটে গিয়ে একটানে ঝুড়িটা তুলে নিলেন মাসি। সমস্ত জাম ছিটিয়ে ছত্রাকার করে দিলেন উঠোনের উপর।

—মুখপুড়ি, দূর হ, দূর হ, চিলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন মাসি। ছুটে এসে বিছানার উপর মুখ গুজে পড়লেন আবার। সমস্ত রাগ ক্ষোভ মুহূর্তে বাঁধভাঙা কান্নায় মূর্ত হল।

কোয়েলিয়া খানিক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। অপরাধ কি করেছে

কিছুই বুঝতে পারেনি। ঝুড়িটা তুলে নিল একসময়। মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

ছত্রাকার জামগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। উঠোনময় ছড়িয়ে রয়েছে ছোটমাসির সম্ভ্রম।

—শুনলি, শুনলি, মুখপুড়ি বিচ্ছিরি কি সব বলে গেল? বিছানার ওপর কেঁদে ভাসালেন মাসি।

—আরে দূর। বাদ দাও, তুমিও যেমন। জংলী মেয়ে, ওর কোন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে নাকি। এত রাগ করলে চলে!

—করবনা রাগ? হ্যাঁরে, তুই কি! মাসি উঠে এলেন আমার কাছে। চোখভরা জল। বললেন, হ্যাঁরে, তুই না ডাক্তার। চোখ বুজে ছিলি নাকি? দেখলিনা ওকে?

—মানে, কি বলতে চাও তুমি? আমি অবাক হলাম। কোয়েলিয়ার মধ্যে আমি নতুন কিছু লক্ষ্য করিনি। শুধু দেখেছিলাম, ওর গলার অলংকারে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে। কালো সুতোয় বাঁধা একটা ছোট ক্রুশচিহ্ন। মান্দারে যে মিশনারী ওর প্রাণ ফিরে দিয়েছেন, তিনি প্রাণের সঙ্গে নতুন ধর্ম্মও দিয়েছেন ওকে। আর কিছু, আর কিছু!

শিলুমাসি ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখে আর কথা নেই। দ্বিতীয়বার কথা বলতে অনেকটা সময় নিলেন। বললেন, ওকে দেখলিনা, বুঝলিনা কিছু! আমি কি এমনি কাঁদছিলাম? ওযে—, ওযে আবার মা হবে।

## ॥ সেই ক্ষত, অন্য মন ॥

আমার নাতির অন্নপ্রাশন। আমায় যেতে হবে আলিপুরদুয়ার থেকে অম্বরনাথ। দূরের পথ। এই দেড়হাজার মাইলের যাত্রা, এপ্রিল মাসের গরমে এই একষট্টি বছর বয়সে পোষায় না আর। তবে অন্নপ্রাশন যার সে আমার বড় ছেলের প্রথম সন্তান। তায় আবার পুত্রসন্তান। কাজেই কষ্টটুকু অক্লেশে সহ্য করতে পারব এমন ভরসা ছিল। তাছাড়া মাঝখানে বিরতি আছে যাত্রায়। এলাহাবাদে। সেখান থেকে আমার মেয়ে শান্তিকে তুলে নিতে হবে।

এখানে শান্তির সঙ্গে বৌমা শোভনার সম্পর্কটা পরিষ্কার করে রাখি। আমার একমেয়ে, দুই ছেলে। শোভনাও বাপমায়ের এক মেয়ে। তারও ভাই ছিল দুটি। ছোটভাই বলাই ছেলেমানুষ। বছর বাইশ-তেইশ হবে। সবে বি. এস্-সি. পাশ করে এলাহাবাদেই একটা ছোট্ট ফার্মে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকেছে। বড় ভাই দুলালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার মেয়ে শান্তির। দুলাল অপঘাতে মারা গেছে আজ প্রায় বছর দেড় আগে। বিলেত গিয়ে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এসেছিল। মারা গেল সেই ইলেক্‌ট্রিকের শকেই। কোম্পানী তার বিধবা স্ত্রী আর অনাথ সন্তানকে মোটা টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেছেন। ক্ষতি-পূরণ কতদূর হওয়া সম্ভব দেখার জন্যে একষট্টি বছর বয়সে আমি বেঁচে রয়েছি। আমার স্ত্রী আর দুইবেয়ান দীর্ঘদিন হ'ল গত হয়েছেন।

ওদের দুজনকে, শান্তি আর রূপকে নিয়ে আমায় যেতে হবে বঙ্কিম আর শোভনার প্রথম ছেলে বুলুর অন্নপ্রাশনে। শোভনার ছোটভাই বলাই যাবে সঙ্গে। সেই ছেলের মামা! মুখে ভাত দেবে। আত্মীয়স্বজন থেকে হাজার মাইল দূরে ওরা যদি অন্ততঃ আমাদের এই কজনকেও পায় এমন একটা উপলক্ষ্য আনন্দে ভরে উঠবে!

রূপ। আমার বিধবা মেয়ে শান্তির জীবনের সান্ত্বনা। বিলেত গিয়ে দুলাল বিদ্যেবুদ্ধি কি শিখে এসেছিল জানিনা, মনে হয়, ওদেশের স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে মনোহর শিশুগুলোকে দেখে তেমনি এক সন্তানের বাসনা নিয়ে এসেছিল। রূপের মধ্যে শান্তি তার সে বাসনা শতাংশে পূর্ণ করেছে। একবছর সাতমাস বয়েস হয়েছে

রূপের। দুচোখের নীল মণিতে ওর দুর্ভাগ্যের দুই সমুদ্র বুঝি থৈ থৈ করছে। গালে মাথায় চুলে রক্তাভা। ঠোঁট দুটি কচি লাল করমচার মত। রূপে স্বাস্থ্যে দুরন্ত রূপ সদাই উচ্ছল। এ পৃথিবীতে বিশ্বাসনীয় বলতে বোঝে দুটো মানুষকে। শান্তিকে আর শান্তির চাইতেও বেশী বলাইকে। রূপ আর বলাই তাই হরিহর আত্মা।

এলাহাবাদ থেকে অম্বরনাথ যেতে আমি চেয়ে চেয়ে রূপকেই দেখছিলাম। আর দেখছিলাম বলাই-এর দুটো চোখ। দর্শনীয় চোখ। রূপের দুচোখে নীলাম্বুধি সমুদ্রের অশান্ত নীল, বলাই-এর চোখে নিশান্তের নিবিড় তন্দ্রা। সুখস্বপ্নের আবেশটুকু সদাই লেগে রয়েছে।

দুলাল সুপুরুষ ছিল। বলাই কর্মঠ, রোগা। মাথায় ছ'ফুটের ইঞ্চি দুয়েক কম হবে। মুখের গড়ন প্রায় দুলালেরই মতন। রোগা মুখে ঢেউ খেলান চুল। লম্বা নাক, পাতলা ঠোঁটের ওপর একজোড়া কচি গোঁফ, আর সব কিছুর ওপর, সচরাচর চোখে পড়েনা এমন একজোড়া আশ্চর্য্য সুন্দর চোখ। ইংরিজিতে যাকে সার্প্ ফিচারস্ বলে তারই সুষ্ঠ সমন্বয়ে মুখখানাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বলাই-এর এই আকর্ষণীয় মুখই ওকে অমন বিব্রত করে তুলল। মেয়েটি বোধকরি একটু বাড়াবাড়িই করছিল। আর কেউ লক্ষ্য না করলেও শ্রীমান বলাই-এর এই বিব্রত দশা আমি উপভোগ করেছিলাম। যাক্। সে পরের কথা, মাথেরাণের পথে।

রঞ্জিত অম্বরনাথ মেশিন প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরীর চার্জম্যান। খাতির আছে তার। ফ্যাক্টরীর গাড়ী নিয়ে কল্যাণ স্টেশনে এসেছিল। শোভনা বাড়ীতে থাকতে পারেনি। বুলুকে অব্দি সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে হাজির। আমাদের পৌছতে দেখে ওদের উল্লাসের মাত্রা বলে বোঝান যায় না।

চমৎকার কোয়ার্টার পেয়েছে রঞ্জিত। ওদের ছোট্ট সংসারে আজ অভাব নেই কিছুর। অল্পের মধ্যে সমৃদ্ধ। ওদের সুখী দেখলাম। সে সুখে সাড়া দিতে গিয়ে মনের গহনে এক প্রচ্ছন্ন বেদনায় কম্পন জাগল। শান্তিকে দেখে আশ্চর্য্য হলাম। এত উচ্ছল এর আগে আর ওকে কখনও দেখিনি। স্রোতের অনুকূলে চমৎকার গা ভাসিয়ে দিতে জানে মেয়েরা। তবে এ বুড়ো চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। কলঘর থেকে বেরোবার পর আমি শান্তির চোখ লক্ষ্য করেছি। সবার নিভৃতে অঝোরে অশ্রু ঝরেছে।

অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অম্বরনাথের মত ছোট সহরে যতটা আড়ম্বর করে করা সম্ভব রঞ্জিত শোভনা তাতে ত্রুটি করলনা। ওদের দুজনের জীবনের প্রথম কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল।

রঞ্জিত শোভনার বড় বড় প্ল্যান ছিল। অজন্তা ইলোরার লোভ দেখিয়ে শোভনা এই বুড়োকে দেড়হাজার মাইল ছুটিয়ে এনেছে। আলিপুরদুয়ারে মাষ্টারী করি আমি আজও। আমার ছোট ছেলে টেক্সটাইলের কাজ শিখছে। তার চাকরীতে ঢুকতে এখনও বছর খানেক। যতদিন সমর্থ আছি কর্তব্যের শেষটুকু করে যাব, এই আমার পণ। বৌমা শোভনার এ এক মস্ত অভিযোগ। সে তার শ্বশুরদেওরকে এতদূরে এভাবে ফেলে রাখতে রাজী নয়। তাছাড়া দাদুভাইয়ের সারাদিনের সাথী হিসেবে আমার চেয়ে উত্তম প্রার্থী আর কে হতে পারে। ছুটির পনেরো দিন আমি তাই শোভনার অন্তঃপুরে বন্দী রইলাম।

অজন্তা ইলোরা শিকেয় উঠল। রঞ্জিত ছুটি পেলনা। বিশেষ কাজের চাপ তার। বেচারার দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে। রান্নাঘরে বউএর পাশে বসে ফোরম্যানকে বিশটা গাল পাড়ল। বাড়তি চা খেয়ে ফেলল দু' কাপ।

বলাই-এর দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বম্বে থেকে অম্বরনাথ এসেছিল। তারাও শোভনার ছোটভাইয়ের মত। মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে শোভনার ভাঁড়ার খালি করে যায়। ফিরে যাবার সময় বলাইকে বম্বে সহর দেখাতে সঙ্গে নিয়ে গেল তারা। অন্নজল ত্যাগ করল রূপ দুদিন। বলাই ফিরে আসার পর আমাদের আর কারুর কোথাও যাওয়া হয়নি। পনেরোটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। অম্বরনাথের ছোট্ট সহরে আমরা কুড়ের মত বসে রইলাম।

শেষের দিকে কি এক পর্ব উপলক্ষ্যে শনিবারে ছুটি পড়ল। শনি রবি দুটো দিন হাতে পাওয়া গেল। সেই সুযোগে মাথেরণ্ যাওয়া স্থির হ'ল।

অম্বরনাথের অনতিদূরে হাজি মালং-এর পাহাড়। সেখানে নাকি সবাই-এর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তার পাশেই আর এক পাহাড়। তারই শীর্ষে মানুষের কষ্টস্থাপিত এক শৈলসহর। মাথেরণ। মাথেরণের এ ভৌগোলিক তথ্য আমার পরের মুখে শোনা। কতদূর সত্যমিথ্যা বলতে পারবনা।

আমরা বাড়ী শুদ্ধ্ সবাই চলেছি। দলে বেশ ভারী। বুলু আর রূপকে ধরলে সাকুল্যে সাতজন। অম্বরনাথ থেকে ইলেক্ট্রিক্ ট্রেন যায় নেরল্। নেরল্ থেকে মিটার গেজে ডিজেল ট্রেন যায় মাথেরণ্। এই হ'ল যাত্রা। ঘণ্টা তিনেকের

পথ। নেরল্ যেতে লাগে মিনিট কুড়ি। বাকী সময় ডিজেল ট্রেন ধুকধুক করে পাহাড়ে ওঠে।

ভোর সাতটায় ট্রেন ছিল অম্বরনাথ থেকে। আমাদের কারুরই সময়মত ওঠা হয়নি। ট্রেন ফেল করার ভয়ে চা বিস্কুট দিয়ে কোনক্রমে প্রাতঃরাশ সেরে ছুট লাগালাম আমরা। নেরল্ পৌঁছলাম সাড়ে সাতটা নাগাদ। প্লাটফর্মের বিপরীত দিকে মাথেরণ্ যাবার ট্রেন অপেক্ষায় রয়েছে। ট্রেন যেন একসার দেশলাই-এর বাক্স। নতুন রঙ করা হয়েছে বলে দোকানের খেলনার মত মনে হচ্ছে। রূপ খুব খুশী। চোদ্দ চুপড়ী কথা শিখেছে ছেলেটা। বলাই-এর কোলে চেপে অনর্গল বকে যেতে লাগল। ট্রেন তখনই খালি। আমরা একটা কামরার এককোণ দখল করে বসলাম। স্টেসনের কেটেরার এসে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জিত শোভনা মোটা রকম প্রাতঃরাশের আয়োজন করল। বলাই বাচ্চা দুটোকে নিয়েই মেতে আছে। দুটোকে দুকোলে নিয়ে সারা স্টেশনের সমস্ত বিস্ময়কর জিনিষগুলো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এসে কামরার মধ্যে গলা বাড়াচ্ছে। হয় শান্তি নয় শোভনা কিছু একটা মুখে পুরে দিচ্ছে তার। এইভাবে প্রাতঃরাশ শেষ হল।

এমনি সময় বম্বের ট্রেন এসে পড়ল। এসেছে অম্বরনাথের ওপর দিয়েই। তবে থামেনি। থামল নেরলে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে নেবে পড়তে লাগল বম্বে মহানগরীর প্রমোদ বিলাসী তরুণ তরুণীরা। ছুটিতে আমোদ করতে যাচ্ছে সব। দেখতে দেখতে নেরলের ছোট্ট প্লাটফর্ম যেন এক আন্তর্জাতিক ফ্যাসন প্যারেডের মঞ্চ হয়ে দাঁড়াল। মেয়ের সংখ্যাই বেশী। বলিহারি সাজসজ্জা প্রসাধন। শোভনা ওদের দেখে রাগে গজরাচ্ছে। তার ধারণা পৃথিবীর সেরা নির্লজ্জ মেয়েগুলোই আজ মাথেরণে গিয়ে ভীড় করবে। শান্তি আর রঞ্জিত খুঁচিয়ে ওর রাগ বাড়াচ্ছে। শ্রীমান বলাই এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরকম নির্লিপ্ত। ও মেতে আছে রূপ আর বুলুকে নিয়ে। এত যে সারিসারি রম্ভা মেনকারা রূপের তুফান তুলে দিল নেরলের নগণ্য স্টেশনে বলাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করল না।

শোভনা একটু অসহিষ্ণু প্রকৃতির মেয়ে। রাগ হবারই কথা তার। সহযাত্রিনীদের মধ্যে যেটিকে সে সবচেয়ে বেহায়া বলে ঘোষণা করল সেই এসে জুড়ে বসল তার পাশের বেঞ্চিটি।

মেয়েটির সঙ্গে পুরুষ সঙ্গী নেই কেউ। বছর তিনেকের ছেলে রয়েছে একটি। দেখলাম তার চোখের মণিদুটোতেও রূপেরই মত নীল। তবে রূপের মত অমন ডাকাত নয়। বেশ শান্তশিষ্ট গোছের। মেয়েটি নিশ্চয় বাচ্চাটার মা। শোভনার ধারণাবিদ্বেষ দুষ্ট হলেও, আর যাই হোক আমাদের সমাজে আদৃতা হবার মত নয়। রূপ আছে, তবে তাকে শ্রীমণ্ডিত না করে সর্বনাশা করা হয়েছে। বসনে ভূষণে প্রসাধনে লোভী পুরুষের মরণসজ্জা। একটা বিষয়ে আমাদের বলাই-এর সঙ্গে মিল আছে। দুজনের পরনেই আঁটসাট ফুলপ্যান্ট আর হাফ্‌হাতা সার্ট। কাটে ছাঁটে কিছুটা প্রভেদ থাকলেও লম্ফে ঝম্পে সমান সুবিধাজনক।

সারা গাড়ী ভরে গেছে। ওরা দুই মায়ে দুই ছেলেকে দুধ খাওয়াবার নামে যুদ্ধ বাধিয়েছে। গ্ল্যাক্সো সঙ্গে এনেছে শোভনা। কেটেরার ইতিমধ্যে এক কেটলী গরমজল দিয়ে গেছে। সকালে অত তাড়াহুড়োর মধ্যে ফ্লাস্কে দুধ নেওয়া হয়েছিল। বোধহয় পরিষ্কার ছিলনা তাই নষ্ট হয়ে গেছে। তা সে গ্ল্যাক্সোই হোক্ আর দুধই হোক তরল পানীয় দেখেই আমার দুই নাতি মিলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ থামল একসময়, গ্ল্যাক্সো যতটুক পেটে গেল সে কৃতিত্ব বলাই-এর, শাস্তি শোভনার নয়।

ফুলপ্যান্ট পরা মেয়েটি এতক্ষণ মুখে নিরপেক্ষ হাসি মেখে যুদ্ধ দেখছিল। হঠাৎ দেখলাম সে তার বিরাট ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ে তিনচার প্যাকেট ক্যাডবেরির মিল্ক চকোলেট্ বার করল। কোন রকম সৌজন্য না করে এদিকের বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রথমেই ধরিয়ে দিল রূপের হাতে। বলু তখন শোভনার জামা কাপড়ের আড়ালে লজ্জাকর কিছু একটা করছে। চকোলেট্ তার অনুমোদিত খাদ্য না হলেও এই পনেরো দিনে বলাই ছোঁড়া ওকে সর্বভুক করে তুলেছে। রূপের রসনার সঙ্গে এই মিল্ক চকোলেটের বড় গভীর প্রীতি। মুগ্ধের মত দুহাত বাড়িয়ে প্যাকেট দুটো নিল সে। আমি দেখলাম মেয়েটিও মুগ্ধের মতই রূপের দিকেই চেয়ে আছে।

কামরার মধ্যে বেঞ্চিগুলো আড়াআড়িভাবে পাতা হয়েছে। দুটো মুখোমুখি বেঞ্চি মিলিয়ে একটি করে ভাগ। দুই ভাগের দুই পিঠাপিঠি বেঞ্চির পিঠ রাখার খাড়াই অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। একেবারে প্রান্তের ভাগটিই আমরা দখল করেছি। পরের ভাগে মেয়েটি, আর তার বাচ্চা। মেয়েটি ঝুঁকে পড়েছে আমাদের ভাগের

দিকেই। দেখছে রূপকে। বলাই-এর ঠিক কাঁধের ওপরেই মেয়েটির মুখ। বলাই স্বস্তি পাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে সরতে সরতে হঠাৎ এসে আমার বেঞ্চিতে অর্থাৎ ঠিক মেয়েটির মুখোমুখি বসে পড়ল। ব্যবধানটুকুই সে চাইছিল তাই মুখোমুখি বসতে বাধ্য হল। বলাই-এর মুখের দিকে তাই হঠাৎ চোখ পড়ল মেয়েটির।

মেয়েটির ওষ্ঠেগণ্ডে কিছু কৃত্রিম রক্তাভা ছিল। তবে সেই প্রলেপের তলায় তার নিজস্ব বর্ণ ছিল অনুরূপ। সেই রক্তিম মুখ আমি হঠাৎ একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠতে দেখলাম। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। মেয়েটির দৃষ্টি বলাই-এর মুখের ওপর নিবদ্ধ। নিষ্পলক। বলাই রূপের চকোলেট্ ছাড়িয়ে দিতে ব্যাস্ত। মেয়েটি স্খলিত ভাবে বসে পড়ল নিজের আসনে। তারপরেই হঠাৎ একেবারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরিবর্তনটা কষ্টকৃত। ছেলেকে চকোলেট্ ছাড়িয়ে দিচ্ছে। মুখে ঝল্‌মলে হাসি। সেই হাসি থেকে সেই মুহূর্তে অকৃত্রিম বাৎসল্য ঝরে পড়ছিল।

ডিজেল ট্রেন পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছে। নেরল্ থেকে মাথেরণ সমস্ত পথটা এইভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে তৈরী। পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে হয়। স্থানে স্থানে বাঁক এত জটিল যাকে সত্যই হেয়ার-পিন্-বেল্ড বলা চলে। সামনের ইঞ্জিন পেছনের গার্ডের কেবিনের প্রায় পাশাপাশি হয়ে বিপরীত দিকে এগোচ্ছে দেখা যায়।

গাড়ী যাচ্ছে শামুকের গতিতে। যতই ওপরে উঠছি পৃথিবী সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠছে। নিম্নে সমস্ত পৃথিবী ছত্রাকারে বিস্তীর্ণ। পাহাড় আর প্রান্তর। ছোট ছোট জনপদ। নীল সলিলা নদী। সমতলের ওপর ঋজু দীর্ঘ ব্রডগেজের রেলপথ চলে গেছে। বন্ধ্যা জমির স্থানে স্থানে কিছু কর্ষিত ক্ষেত চোখে পড়ে। বোঝা যায় সবই প্রায় শষ্যহীন। আবার এখানে পাহাড়ের রুক্ষ বুকে বুনো ফুলের সম্ভার। সব মিলিয়ে প্রকৃতির বিশৃঙ্খল প্রদর্শনী। যতই ওপরে উঠছি অস্বচ্ছ নীল ধোঁয়ায় নীচের প্রকৃতি ম্লান হ'য়ে আসছে। নীচের দিকে তাকালে যে পথ ধরে উঠে এলাম গাছ পালার আড়ালে টুক্‌রো টুক্‌রো চোখে পড়ে। মাথার ওপর দেখতে পাই যে পথ ধরে যেতে হবে তারই নিশানা। রোমাঞ্চ জাগে! মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই প্রাণঘাতী পথের দুপাশে শিলাময় প্রকৃতির কঠোরে কোমলে মেশান বিচিত্ররূপ দেখতে দেখতে উর্দ্ধপানে চলেছি আমরা।

এর মাঝেও মানুষ আছে। অভাবে দুঃস্থ মানুষ। এই চলমান পিঞ্জরের মধ্যে যে কটি চিড়িয়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চলেছে তাদের করুণাভিক্ষা করছে। ডিজেল ট্রেন পাহাড়ের গা বেয়ে সরীসৃপের মত ওপরে উঠছে। রেললাইনের পাশে একটা মানুষ কোনক্রমে দাঁড়াতে পারে এতটুকু স্থান। তারপর মৃত্যুর মনোহর অঙ্ক। সেই পথের পাশাপাশি ছুট লাগিয়েছে এই মুলুকের গুটিকতক কিশোর সন্তান। কাঁটা ডালে বুনোফুল গেঁথে গেঁথে অপরূপ পণ্য বানিয়েছে ওরা। একহাতে একগোছা সেই ডাল আর অন্যহাত খালি। লাফিয়ে উঠে পড়ছে চলন্ত ট্রেনে। কাঠবেড়ালীর মত এককামরা থেকে অন্য কামরায় চলে যাচ্ছে। হাতে ফুলের ডাল। ফুলের মূল্য নামমাত্র। জীবনের মূল্য নেই, নিরাপত্তার চিন্তা নেই তাই।

বলাই গলা বাড়িয়ে তিনডাল ফুল কিনল। আমি বাইরের দিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। বলাই-এর এই ফুলকেনা থেকেই ভেতরে চোখ পড়ল।

প্রথম ডালটা বলাই দিল রূপকে। একটা তোলা রইল বুলুর জন্য। সে তখন ঘুমচ্ছে। বলাই দেখলাম ভুনস্বর ভাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে তৃতীয় ফুলের ডালটা বাচ্চাটার হাতে ধরিয়ে দিল। তার মায়ের দৃষ্টি বাইরের দিকে। মুগ্ধ বিষণ্ন দৃষ্টি। বর্তমান পার্শ্বিকের অতীত অন্য কোন কল্পনা-লোকে। মুখ ফিরিয়ে বলাইকে মৌখিক ধন্যবাদটুকু জানাতে পারল না। রঞ্জিত শান্তি শোভনা সব চেয়ে আছে বাইরের দিকে। বোধকরি সবকটি মাথেরণ্‌ যাত্রীই এইভাবে বাইরের প্রকৃতির শোভায় সমাবৃত। অধিকাংশ তরুণ মন। তাছাড়া, সময়টা এপ্রিল—পূর্ণ বসন্ত।

আমিও আমার একষট্টি বছরের জীর্ণ দৃষ্টি বাইরের দিকে ফেরালাম। কাঁটাডালে হাত না কাটে এই ভয়ে বলাই বাচ্চাদুটোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বসে রইল।

এইবার আমি মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করলাম। যে মুগ্ধ দৃষ্টি খানিক আগে বাইরের প্রকৃতিতে নিবদ্ধ ছিল, এখন তা স্থির হ'য়ে আছে বলাই-এর মুখে। মেয়েটির চোখদুটি সুন্দর। দীর্ঘপল্লবে স্বপ্নময়। তাই বোধকরি সুন্দর চোখের প্রতি তার এই মোহ। আমাদের বলাই হয় বেজায় লাজুক, আর নয় নারী বিদ্বেষী। শোভনার মত প্রগতিশীলাদের প্রতি সংস্কারগত বিদ্বেষ পোষণ করে, এমনও হতে পারে। বলাই চেয়ে আছে বাইরের দিকে। ভাবনির্লিপ্ত,

দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা প্রচ্ছন্ন রেখেছে। ওপক্ষের বিকার নেই। মুগ্ধ চোখের বিষণ্ণতায় অল্প অল্প করে তৃষ্ণার অঞ্জন লাগছে। দৃষ্টি ফিরে গেল। কখনও বাইরের প্রকৃতির দিকে, কখনও অন্য কোথাও। অবশ্য তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারছে না। মৌলোভী ভোমরার মত ফিরে ফিরে আসছে। ট্রেন চলেছে। কামরার মধ্যে দুটি অসমবয়সী ছেলে মেয়ের এই অবৈধ খেলা চলেছে সেই সঙ্গে।

একষট্টি বছর বয়স হয়েছে আমার। এতটুকু বুঝতে পারছি, শ্রীমান বলাই বৃথাই শঙ্কিত হয়ে উঠছে। মেয়েটির দৃষ্টিতে যে মোহ সে তার প্রতি নয়। সে অন্য কেউ। মনের সমুদ্রে স্মৃতির মন্থন চলেছে। শোভনা বিশ্বাস করতে পারবে কিনা জানিনা। আমি পারছি। এ মেয়ে জীবনে গভীরতার সন্ধান পেয়েছে। আহতা হরিণী বিদ্ধ বানের গোপন ব্যথা লালন করে যাচ্ছে অন্তরের নিভৃতে। সেই প্রাচীন ক্ষতমুখে শোণিতের নির্ঝর ছুটেছে।

নেরল্ থেকে মাথেরণ্ যেতে দুটো ষ্টপেজ পড়ে মাঝখানে। স্টেশন না বলে ষ্টপেজ বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে। পাহাড়ের অঙ্গচ্ছেদ করে দু-টুক্রো সমতল জমি বানান হয়েছে। একটি করে ঘর আছে। গুটিকতক মানুষ।—সিগন্যাল্, ল্যাভেটরী আর সবচেয়ে যা অপরিহার্য—জল। একটি স্টেশনের নামই মনে আছে আমার। ওয়াটার পাইপ। মনে থাকার কারণও নামের এই বৈচিত্র্য। ঠিক যে কোনটার নাম ওয়াটার পাইপ তাও মনে নেই আমার। হয়ত প্রথমটারই।

ট্রেন থামল মিনিট দশেক। জলের তাড়ায় অধিকাংশ যাত্রীই হুড়হুড় করে নেবে গেল। জলের জায়গায় ভীড় হ'ল বেশ। বলাই আগেই নেবে গেছিল। ছেলেটা করিৎকর্মা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজে জল খেয়ে, দুপাত্র জল এনে আমাদের সবাইকে খাইয়ে দিল। আমদের সহযাত্রিনী তখন খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ভীড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে জলের পাত্র। একলা ছেলেকে ফেলে নেবে যাবে, ট্রেন ছাড়ার আগে জল নিয়ে ফিরে আসবে—এমন ভরসা নেই। অথচ মা ছেলে দুজনেই তৃষিত। বলাই-এর কাছ থেকে এতটা আশা করিনি। আমাদের জল খাইয়ে কামরায় উঠল না। কোন রকম সৌজন্য না করে মেয়েটির হাত থেকে জলের পাত্রটা নিয়ে নিল। পাথর ছড়ান লাইনের পাশ দিয়ে ছুট লাগাল আবার।

ট্রেন প্রায় ছাড়ছাড়। গার্ডসাহেব হুইসিল দিচ্ছেন। শোভনা কামরার

বাইরে দেড়হাত গলা বার করে রাগে গজরাচ্ছে। মেয়েটিও দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছেড়ে দিল। জলের জায়গায় যে কজন যাত্রী ছিল যে যার কামরায় উঠে পড়ল। বলাই তখনও জল নিচ্ছে। সে নিজে আর পিছিয়ে এলনা। আমরাই এগিয়ে গেলাম তার কাছে। বলাই তখন বকশিশ্ দিচ্ছে জলওয়ালাকে। তারপর ট্রেনের পিছু পিছু লম্বা কদমে হেঁটে, আগে মেয়েটির হাতে জলভরা পাত্রটি সন্তর্পণে ধরিয়ে দিল। তারপর তার খেলোয়াড় সুলভ দক্ষতায় নিরুদ্বেগ সাচ্ছন্দে উঠে পড়ল ট্রেনে। শোভনা গুম করে এক কিল বসাল তার পিঠে। বললে, বড় ইয়ে হয়েছে তোর, না। ঢং দেখেই গলে গেলি। খুব পরোপকার শিখেছিস ?

বলাই বলল, সব কিছুতে হিংসুটিপানা করবিনা। জলটা মোটেই ওর জন্যে আনিনি। দেখ দিখি, বাচ্চাটার কত তেষ্টা পেয়েছিল।

তা সত্যি। ছোট্ট পাত্রের জলটুকু নিঃশেষ করে দিল বাচ্চাটা। মা তার মুখ টিপে হাসছে তখনও। ভাষা না বুঝলেও শোভনার রাগটুকু বুঝেছে। তার নিজের কপালে জল জুটল না।

প্রসঙ্গে তখনও ছেদ পড়েনি। শোভনা তারই জের টেনে বলল, যা না, নেবে যা, ওর জন্যে এনেদে। জল কেন, ভাগীরথী আনতে ছুটবি। তোরা সব পারিস্।

কপট বিস্ময়ে বিরাট দুচোখ বিস্ফারিত করে বলাই প্রশ্ন করল, রঞ্জিতদা, তাই বুঝি ?

রঞ্জিত হো হো করে হেসে উঠল। শোভনা তার ছোট্ট মুঠি দিয়ে আবার কিল্ বসাল বলাই-এর পিঠে।

রূপের বোধহয় এতটা সহ্য হল না। সেও তার ততোধিক ক্ষুদ্র মুঠি তুলে নীল চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করল শোভনাকে, মার্লে কেন আবাল ?

এবার আমরা দুভাগের সবকটি মানুষ সশব্দে হেসে উঠলাম।

এরপর ভাব জমে গেল। শোভনা অবশ্য নিরপেক্ষ। শান্তি হিন্দী জানেনা। ইচ্ছা থাকলেও কথা বলার উপায় নেই তার। ভাব যাদের হল তাদের ভাষার প্রয়োজন ছিল না। ক্যাডবেরীর লোভে রূপ বেঞ্চি ডিঙ্গিয়ে ওপিঠে চলে গেল। তবে বেশীক্ষণ থাকতে চাইছেনা। কেননা বলাই এপিঠে। রূপ একবার

মেয়েটির কোল থেকে বলাই-এর কোলে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বলাই-এর কোল থেকে মেয়েটির কোলে চলে যাচ্ছে। ওদিকের ছেলেটি তার মায়ের ওপর রূপের এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্ষুণ্ণ হলনা। দুটিতে আস্তে আস্তে ভাব জমে উঠল। শোভনা আর রঞ্জিত বাদে সবাই ওদের খেলা দেখছে। মেয়েটি এবার নিঃসঙ্কোচে তাকাবার সুযোগ পেয়েছে বলাই-এর দিকে। দু-একবার চোখাচোখি হলনা এমন নয়। বলাই সঙ্কোচ এড়াতে সচেষ্ট রয়েছে। লজ্জাটা প্রকাশ পাচ্ছেনা তার।

পাহাড়ের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে ট্রেন সঠিক কোন্ দিকে চলেছে বোঝা যাচ্ছেনা। সমতলের বুকে ছোট্ট একটা সহর প্রায় সারাক্ষণই চোখে পড়ছে। একবার সেটা ডানদিকে পড়ছে আবার কিছুক্ষণ পরে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। ব্রডগেজ লাইনের ওপর দিয়ে সরীসৃপের মত ট্রেন চলে যাচ্ছে। স্বর্গলোক থেকে মর্তের সার্ভে করছি আমরা। নীল ধোঁয়ায় নীচের সবই ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। যতই ওপরে উঠছি বনজঙ্গল ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। স্থানে স্থানে গাছপালা এত নিবিড় যা ভেদ করে দৃষ্টি চলেনা। ওপরের বন আরও ঘন। আমরা একেবারে শীর্ষে গিয়ে পৌঁছতে চাই।

দুনম্বর স্টেশন এসে গেল। বন্য পৃথিবী একটু মুখর হ'ল আবার। পাতার ঠোঙায় কাল কাল বুনো ফল বিক্রী হচ্ছে। বলাই আবার জল খাওয়াল সবাইকে। এবার আর মেয়েটি বাদ গেলনা। দরজায় দাঁড়িয়ে গোড়া থেকেই আবেদন জানাচ্ছিল একটা বুনো ছেলে। হাতে বুনো ফলের ঝুড়ি। কিছু বিক্রী হলে অন্নসংস্থান হয় বেচারীর। বলাই প্রথমে দুটো মুখে পুরে দেখল। শান্তিও নিল দুটো। দেখে আমি আমোদ পেলাম। দুটি করে ফল চেখে দেখতে ওদের দুজনেরই চোখ কেমন লোভাতুর হয়ে উঠল। বোঝা গেল অচেনা ফল স্বাদে লোভনীয়। ভাল লাগলেই হল। বলাই কিনে ফেলল সবকটা ঠোঙা। মোট আটটা। দাম জানতে চায়নি বলাই। গোটা একটা টাকা দিল ছোঁড়ার হাতে। তারপর আতিথেয়তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফেরত পয়সার বিষয় বাবুর নির্লিপ্ততা দেখে ছোঁড়াটা উল্লাসে ছুট লাগাল হঠাৎ।

আমরা সবাই বুনো ফল খাচ্ছি। চার্জম্যান রঞ্জিত বাদে। রূপের চেহারা দেখবার মত। বুনো ফলের লাল রসে রাঙা হয়ে উঠেছে। তার বন্ধুটির দশাও

অনুরূপ। বলাই মেয়েটিকেও এক ঠোঙা ফল দিয়েছে। সেও খাচ্ছে একটি-দুটি। একষট্টি বছরের বুড়ো আমিও খাচ্ছি। ওদের মত আমার মুখও রাঙা হ'য়ে থাকবে।

সমুদ্রতল থেকে আড়াই হাজার ফিট্ ওপরে উঠে এসেছি আমরা। মাথেরণ্ স্টেশন। মাথেরণ্ প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ পরিকল্পনায় তৈরী করা হয়েছে একে। সৃষ্টিকর্তা কোন এক ইউরোপীয়ান। পার্কের মধ্যে আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এখানে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে আজকের মাথেরণ্। বম্বে সহরের প্রমোদবিলাসী তরুণ-তরুণীদের ফ্যাসনের সঙ্গে তাল রেখে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ট্রেন ছেড়ে সবাই নেবে পড়েছি আমরা। আর সব যাত্রীরা অধিকাংশই স্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। আমরা কোন্ হোটেলে উঠব জানতে চাইল মেয়েটি।

আমরা কোন হোটেলে উঠব না। তিনটের ডাউন ট্রেনে অম্বরনাথ ফিরে যাব। এ সংবাদ মেয়েটির পক্ষে বড় মর্মান্তিক মনে হল। অভিযোগ জানাল এমন আসার কি অর্থ হয়; দেখা হল কি!

যাই যাই করেও দু-একটা আজে বাজে কথা বলে নিচ্ছে। রূপকে আদর করে নিল। ক্যাডবেরীর ভাঁড়ার শূন্য সে দুঃখও জানিয়ে রাখল। দৃষ্টি বলাই-এর মুখে। বয়োজ্যেষ্ঠ বলে আমায় বিনীত নমস্কার জানাল। তারপর সৌজন্যসূচক অথচ সম্পূর্ণ নৈরাশ্যযুক্ত 'আবার দেখা হবে' বলে বিদায় নিল। ছেলের হাত ধরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে।

বলাই-এর প্রতি তার শেষ বিদায়ের দৃষ্টিটুকু, আমায় বিষণ্ণ করে গেল। সে দৃষ্টিতে বেদনা মূর্ত হয়েছিল। কে তুমি, দেখা হবে না আর, কে তুমি জানা হল না, কে তুমি?

আমরা সবাই তখনকার মত স্টেশনেরই একটা বেঞ্চি জুড়ে বসলাম। স্নানাগার থেকে বলাই খানিকটা গরমজল জোগাড় করে আনল। গ্লাক্সো খাওয়ান হল রূপ আর বুলুকে। তাতে কিছুটা সময় কাটল। আমাদের হাতে তখনও ঘণ্টা চারেক সময়। এর মধ্যে মাথেরণের যতটা সম্ভব দেখে নিতে হবে। খাওয়া

দাওয়া স্টেশনের রেস্তোরাঁয় সেরে নিলে মন্দ হয় না। তবে যা ভীড় সহজে তা সম্ভব হবে না।

আমরা সবাই বেড়িয়ে পড়লাম। লাল ধূলোর কাঁচা পথ। যাকেই দেখছি ধূলোয় লাল হয়ে রয়েছে। দুপাশে ঘন বন। গাছ কেটে শৌখিন মানুষ বাংলো বানিয়েছে তার মধ্যে। স্টেশনের সামনে একসার দোকান। রেস্তোরাঁ। ফটো তোলার স্টুডিও রয়েছে। সামনেই এক মস্ত হোটেল। রাস্তার ধারে হাতে টানা রিক্সার লম্বা সারি। রঙ-এর বাহার আছে রিক্সাগুলোর। বসার জায়গা একজনের। দুজন হলে কাঁঠাল গাদা। রিক্সা টানবে একজন, ঠেলবে দুজন। তানাহলে এমন উঁচুনীচু কাঁচা পথে চলবে কি করে! চারদিক জুড়ে বেশ একখানি শান্ত ছবি। বনে পাখীও কম। থাকলেও বোধহয় শান্তিভঙ্গের ভয়ে ডাকত না।

আমরা মাঝসহরের পার্কে এসে পৌছলাম। বন জঙ্গল পাহাড় কেটে একটুকরো সমতল জমি বানান হয়েছে। সার মাটি ইত্যাদি এনে ফেলা হয়েছে নীচের সহর থেকে। ফল ফুলের গাছ লাগান হয়েছে নানান প্রকার। যত্নের ত্রুটি না থাকলেও কোনটিই যে বিশেষ সুফলা হয়ে উঠতে পারেনি দেখেই বোঝা যায়। ফুলের কেয়ারিতে সামান্য কিছু ফুল ফুটেছে। মাথেরণের স্রষ্টা কর্তার মর্মর মূর্তি রয়েছে মাঝখানে।

পার্কের পাশেই এক হোটেল। বুলু আমার কোলে ছিল। আমি ঘুরতে ঘুরতে হোটেলের গেট অব্দি চলে গেছিলাম। বাইরে থেকেই দেখতে পেলাম আমাদের সহযাত্রিনী সেই আধুনিকা এসে উঠেছে এই হোটেলে। হোটেলের গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। মেয়েটির ঘরটিও চেনা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার আমি পার্কের মধ্যে ফিরে গেলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। রঞ্জিত, শান্তি, শোভনা ঘোরাঘুরি করে হয়ত ক্লান্ত। তিনজনে চুপ করে একটা গাছের তলায় ছায়া দেখে বসে আছে। বুলু আমার কোলে ঘুমুচ্ছে। বলাই আর রূপের দেখাই নেই। আমি বরাবর লক্ষ্য করছি এই দুজনেরই অফুরন্ত জীবনীশক্তি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের দুজনকেও দেখা গেল। বলাই তার সুদৃশ্য গগল্‌সখানা পড়িয়ে দিয়েছে রূপের চোখে। পার্কের পাশে বনের মধ্যে থেকে বেড়িয়ে আসছে দুজনে।

হেঁটে হেঁটে আর এই দুপুর রোদে কোথায় বেড়াবো আমরা। ক্ষিদে পেয়েছে সকলেরই। আমরা উঠলাম। আবার সেই লাল ধুলোর পথ। পথে এখন আর লোকজন নেই। আমরা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের কাছাকাছিই এসে পৌঁছলাম। কি ধরনের খাওয়া-দাওয়া হতে পারে তাই নিয়ে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে চাপা আলোচনা হচ্ছে দলের শেষে। আগে আগে রূপকে কাঁধে নিয়ে পথের ওপর ছুটোছুটি করছে বলাই। ওদের অভিধান বহির্ভূত বহু শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে। বুলু আমার কোলে। দলের মাঝখানে আমি আর শান্তি চলেছি।

রঞ্জিত আর শোভনা পিছিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মনে হল কর্তা-গিন্নীর সংলাপে কিছুটা উদ্বেগ এসেছে। চাপা সন্ত্রস্ত কথাবার্তা। কানে না এলেও অপ্রিয় কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হল। ব্যাপার কি ? আমরা থামলাম। রঞ্জিত আর শোভনা দুজনেই পথের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পকেট হাতড়াচ্ছে রঞ্জিত। শোভনা উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পরপর সবকটা পকেট হাতড়ে দেখল রঞ্জিত। রুমাল-টুমাল যা কিছু ছিল বার করে ফেলল। সে সব ঝাড়াঝাড়িও হ'ল। কিছু একটা খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত। দুজনে বচসা বাধাল মাঝপথে।

ওরা দুজন পিছিয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝতে না পেরে আমি আর শান্তি ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে বলাইও এসে পড়েছিল আমাদের মধ্যে।

রঞ্জিত ততক্ষণে পথের ধারে একটা পাথরের ওপর কিটব্যাগখানা খুলে ফেলেছে। তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজতে আরম্ভ করেছে তার মধ্যে।

ব্যাপার গুরুতর। টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে শোভনা রঞ্জিতের হাতে মাত্র কুড়িটা টাকা দিয়েছিল। তার থেকে টিকিট প্রাতঃরাশ এইসব হয়েছে। তাছাড়া আরও একশোটা টাকা শোভনা সঙ্গে নেবে এই কথা ছিল। সকালে অত তাড়াহুড়োর মধ্যে কি যে কথাবার্তা হয়েছে ওরাই জানে। টাকাটা হয় সঙ্গে আসেনি, আর নয় এলেও যে কোথায় সংরক্ষিত আর তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। শোভনা বলছে, তার পরিষ্কার মনে আছে একটা একশোটাকার নোট সে রঞ্জিতের পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিয়েছিল। রঞ্জিত বলছে, কখখনো নয়,

অত পাতলা পাঞ্জাবীর পকেটে একশ টাকার নোট অন্ধেও দেখতে পাবে। দেখেছে কেউ ?

কেউ দেখেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও টাকা পাওয়া গেল না। রঞ্জিতের পকেট, কিট্‌ব্যাগ, শান্তি শোভনার আঁচল, বটুয়া সব শূন্য। টাকা নেই।

মাঝরাস্তায় আমরা সবাই মুখ ক্যাকাশে করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কাছে একটা কাণাকড়িও নেই। আমার মানিব্যাগ প্রথমদিন থেকেই শোভনার জিম্মায়। রঞ্জিতের কাছে সব ঝেড়েঝুড়ে বেরুল দুটাকা দশআনা। শ্রীমান বলাই তার বম্বে থেকে কেনা নতুন মানিব্যাগখানা ম্লানমুখে বার করে দিল। তারমধ্যে পাওয়া গেল একটা পাঁচ টাকার নোট, একটা একটাকার, একটা অচল আধুলি আর তিনটে দশ নয়ার কয়েন। চাঁদা করে সব মিলিয়ে হ'ল সাত নয়া পয়সা কম ন' টাকা। মানুষ আমরা বাচ্চা দুটোকে বাদ দিলে পাঁচজন। একবারের খেতে লাগবে কম করে দশ টাকা। ফিরে যাওয়ার ভাড়াও ঐ রকম।

ন' টাকায় হয় খাওয়া নয় ফিরে যাওয়া কোনক্রমে হ'তে পারে। এই দুইয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করতে হবে। এই হল সমস্যা। লালধূলোর মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃথাই আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ওদিকে অল্প অল্প করে বাচ্চা দুটোর মেজাজ বিগ্‌ড়োচ্ছে। শোভনার কথা বাদ দিলাম। ও একটুতেই নার্ভাস প্রকৃতির। রঞ্জিতের মুখ একেবারে কাল হয়ে গেছে।

শান্তি আর বলাই ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব হাল্কা করার চেষ্টা করছে। খাওয়া না যাওয়া এই নিষ্পত্তির জন্য বলাই তার অচল আটানি দিয়ে টস্‌ করল। স্থির হল খাওয়া। ওরা ছেলেমানুষ তাই নিয়ে যতটা সম্ভব আমোদ করল।

রঞ্জিত বলল, এককাজ করা যাক্, না খেয়ে ত' আর থাকা যাবেনা। যা হোক কিছু খেয়েই নেওয়া যাক্। না হয় বিনা টিকিটেই ফেরা যাবে। অম্বরনাথের স্টেশনমাষ্টার বাঙালী। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। ফাইনটাইন যা দিতে হয় ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই।

রঞ্জিত পুরোটা ভেবে দেখেনি। মাঝখানে নেরল-এ গাড়ী বদল আছে। সে গাড়ী আসে পুণা থেকে। ধরতে পারলে রেলকোম্পানী পুরো পথের ভাড়া আদায় করে ছাড়বে। দুটি মেয়েমানুষ দুটি বাচ্চা সঙ্গে, এমন ঝুঁকি

নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই সংখ্যাগুরুদের প্রতিবাদে রঞ্জিতের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

আমি বললাম, এক কাজ করো রঞ্জিত, তুমি গিয়ে এখানকার স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা কর। তোমার আইডেন্‌টিটি কার্ডখানা এনেছ? আননি, যাই হোক্‌, তবু যাও। অবস্থাটা বুঝিয়ে বল ওঁকে। আমার মনে হয় কিছু একটা উপায় বাত্‌লাতে পারবেন। গিয়ে দেখ তুমি।

বলাইটা পাগলা। বল্লে, আচ্ছা, এককাজ করলে হয়না। বাড়ীর চাবি আর একটা টাকা আমায় দাও। এখান থেকে নেরল্‌ যাবার হাঁটা পথ আছে। ছুটতে ছুটতে চলে যাব। নেরল্‌ থেকে অম্বরনাথ গিয়ে ফিরে আসতে বড় জোর একঘণ্টা লাগবে। পনোরো মিনিট পরপর ত' ট্রেন। তিনটের মধ্যে টাকা নিয়ে ঠিক ফিরে আসব আমি। তোমরা খেয়েটেয়ে তৈরী থেকো।

শোভনা মাঝরাস্তায় গুম্‌গুম্‌ করে তিনটে কিল বসাল বলাই-এর পিঠে। তার অমন সোজা সমাধানটাও তিন কিলে বাতিল হ'য়ে গেল।

শোভনা রঞ্জিতকে বলল, বাবা যা বললেন, তাই করোতো তুমি। আগে চল, যা পাওয়া যায় কিছু খাওয়া যাক্‌। আর থাকা যাচ্ছে না।

অগত্যা আমরা একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেস্তোরায় গিয়ে উঠলাম। ধূলোয় ঘামে ভূতের মত চেহারা হয়েছে সব কজনের। সহৃদয় এক বেয়ারা সঙ্গে দুটি মেয়েমানুষ দেখে মুখ হাত ধোবার জলের ব্যবস্থা করে দিল। সব চেয়ে সস্তা খাবার জুটল আমাদের কপালে। আহার্যের দাম এখানে অম্বরনাথের দুগুণ। খিদের মুখে যা পাওয়া গেল উদরস্থ করে আবার আমরা পথে পা বাড়ালাম।

গুটিগুটি আবার স্টেশনে ফিরে এলাম আমরা। গাড়ী চড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব। এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী। রঞ্জিত বেচারা সাহস করে গেল স্টেশন মাস্টারের কাছে। অনিশ্চিতের বোঝা নিয়ে আমরা আবার আমাদের পরিচিত বেঞ্চিটা দখল করে বসলাম। বলাই শোভনাকে ভরসা দিল, বেঞ্চি ফ্রি, ভাড়া লাগবেনা। চোখ পাকিয়ে কিল তুলল শোভনা। রূপকে নিয়ে বলাই পালাল।

বুলু আমার কোলে। ঘুমুচ্ছে। বলাই তার নিয়ম মাফিক রূপকে বয়ে বেড়াচ্ছে। বেঞ্চির ওপর মুখ বুজে বসে আছে শান্তি আর শোভনা। ওরা ডবল ননদ ভাজ। এখন দেখে কষ্ট হয়, অবস্থার পাকে পড়ে দুজনেই বাক্‌-সংবরণ করেছে।

রঞ্জিত ফিরে এল খানিকক্ষণ পর। মুখ দেখে বিশেষ উৎফুল্ল মনে হল না। বললে, স্টেশন মাস্টার নেই এখানে, এসিস্টেন্ট একজন বিশেষ ভরসা দিতে পারলেন না। বলেছেন চেষ্টা করবেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার দেখা করতে বলেছেন। দেখা যাক্।

রঞ্জিত গিয়ে পাশের বেঞ্চে মুখ গোমড়া করে বসল। শোভনার মুখেরও আয়তন বেড়েছে। ফিরে গিয়ে কর্তাগিন্নীর হবে একচোট। ইন্ধন জড় হচ্ছে।

সব অপদার্থ। কিছু হবেনা এদের দ্বারা। দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। কি করব, কোথায় যাব কিছুই চিন্তা করিনি। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা ঝিলিক্ দিল মনে। বুলুকে শান্তির কোলে চাপিয়ে দিলাম। বলাই তখন রূপকে কাঁধে নিয়ে লাইনের ওপর হাঁটছে। বলাইকে ডাক দিলাম। দ্রুত অথচ কিছুটা শঙ্কিতভাবে বলাই সামনে এসে দাঁড়াল।

বললাম, রাখ রূপকে, আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—উচ্ছন্নে, আয় শিগ্‌গির, ধমক লাগালাম আমি।

বলাই আর বাক্যব্যয় না করে আমার সঙ্গে উচ্ছন্নে চলল।

স্টেশনের বাইরে এসে খোল্‌সা করে পরিকল্পনাটা বোঝালাম বলাইকে। একমাত্র ভরসা আমাদের সহযাত্রিনী সেই আধুনিকা। পার্কের সামনে হোটেলটায় উঠেছে সে। কামরাটাও আমার দেখা আছে। এখন বলাই ছোঁড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলেই কার্যোদ্ধার হয়। আমার মত একজন নীতিবাদীকে কটা বিপন্ন মানুষের স্বার্থে সুবিধাবাদী হতে হচ্ছে। না হয় মেয়েটির কাছে দোষী হয়েই থাকব।

ঘরটা বলাইকে দেখিয়ে দিয়েই ফিরে আসব আমি। বাকীটুকুর দায় তার।

বললাম, দেখ, সামান্য দশটা টাকার প্রয়োজন। তোকে কোন চাতুরী করতে বল্‌ছি না। মাথাটা নুইয়ে চেয়ে নিবি। ঠিকানা লিখে নিবি নিশ্চয়। ডাকে টাকা ফেরৎ যাবে। আর, হ্যাঁ, দেরী করবিনা। চল্।

আমি ফিরে চললাম। এবার বলাই সামলাক। হোটেলের সেই বিশেষ কামরাটিতে এই দুটি অসমবয়সী ছেলেমেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কি আচরণ করল সে উপাখ্যান বলাই নিজেই বলুক। আমি তা জানতে পারিনি।

মাস্টারমশাই আমাকে বেশ ফাঁসালেন। হাতে আর সময় নেই, টাকাকড়িও সব ওঁরাই সঙ্গে রেখে নিলেন, নাহলে আমি ঠিক লাফাতে লাফাতে নেরল্ চলে যেতাম। টাকাও নিয়ে আসতাম, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারও হত। তা না, এই দুর্ভোগ।

আমার ভয় হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর ভদ্রমহিলা আমায় আহার না করেন। কারুর কাছে টাকা ধার চাওয়া এক বিশ্রী ব্যাপার। ওঁরা আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে এইসব করাচ্ছেন।

বাচ্চাটা আমায় আগেই দেখতে পেয়েছিল। আমি গেট্ দিয়ে ঢুকতেই টলমল করতে করতে এগিয়ে এল। বৌদি বলে, আমি নাকি বাচ্চাদের বশ করার যাদু জানি। যাদুটাদু কিছুই জানিনা, তবে বাচ্চা পেলেই আদর করি। তাই আমার প্রায় অপরিচিত এই বাচ্চাটাকেও আমি ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম।

এমনি সময় সেই ভদ্রমহিলা, সম্ভবত ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, বাইরে এসে আমাদের দেখতে পেয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আমি ততক্ষণে এগিয়ে গেছি। উনি অবাক হ'য়ে চেয়ে আছেন আমার দিকে। দেখলাম, ওঁর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুতরকম স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আমি যে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই দৃশ্য মনে হচ্ছে উনি যেন অপার্থিব কিছু একটা ভ্রমে দেখছেন। এই প্রথম আমিও ওঁকে নিঃসঙ্কোচে দেখলাম। ট্রেনের জামাকাপড় বদ্‌লে ফেলেছেন। সাদা সালোয়ার আর নীল চুস্‌ত লতার মত দেহটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। হাতের ওপর হাল্‌কা নীলরঙের দোপাট্টা। প্রসাধন ম্লান। চুল এলোমেলো। এখন দেখলে দিদিও স্বীকার করত, উনি দর্শনীয়া।

হঠাৎ তরতর করে নেবে এলেন। একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টি বদলায়নি। কিছুক্ষণ একভাবেই চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্নের ঢেউ থৈ থৈ করছে। স্বর ব্যাকুল হল, কেন এলে তুমি আবার? কে তুমি? বল না?

উনি আমায় হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। বসালেন। একেবারে গা ঘেঁষে বসলেন। সেইভাবেই চেয়ে রইলেন আমার দিকে। কি করব আমি। চুপ করে বসে রইলাম। ওঁর দিকে তাকাতে পারছিনা। বুঝতে পারছিনা আমাকে

ওঁর এত ভাল লাগছে কেন ? উনি আমায় ইচ্ছে করে বিব্রত করছেন না বুঝতে পারছি। তবু আমি সহজ হতে পারছিনা। কতক্ষণ এইভাবে কাটবে কে জানে।

একসময় খুব সংযতভাবে প্রশ্ন করলেন, বল, তুমি কে ?

—আমি আপনার কেউ নই। অসহিষ্ণু হলাম আমি, বললাম, দেখুন, আমরা বড় মুশকিলে পড়েছি। আমাদের টাকাকড়ি সব হারিয়ে গেছে। আমরা একেবারে ষ্ট্রাণ্ডেড্। ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই। আপনি দয়া করে আমায় দশটা টাকা দিন। টাকার জন্যেই এলাম আমি। আমাদের সাহায্য করুন।

অনেকক্ষণ উনি কোন কথা বললেন না। আমার আবেদন যেন কানে যায়নি। সেই অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টি, আমার দুচোখ থেকে সরতে চাইছে না। মুখে কথা নেই। ওঁর হাতের মধ্যে আমার হাতদুটো ঘেমে উঠছে।

কথা বললেন একসময়। গলার স্বর একেবারে অস্ফুট হয়ে উঠেছে, দেবনা টাকা। তাহলে ত' যাওয়া হবে না তোমার। এইখানেই থাকতে হবে। বল, যদি না দি। বলনা, যদি এখানে ধরে রাখি আমি তোমায়। না যেতে দি। কথা বল।

—কি বলব বলুন, আমি আপনার কে ?

—তুমি নও। কিন্তু ঠিক তোমার মতন। ঠিক ওই চোখ, নাক, ঠোঁট। কিন্তু বিশ্বাস কর, তাকেও আমি ধরে রাখতে চাইনি। তোমাকেও রাখব না। টাকা নাও, চলে যাও তুমি। আর কখনও ফিরে এসনা। তুমি কে, শুধু বলে যাও।

—আপনি কার কথা বলছিলেন ?

এবার উনি নিরুত্তর। নিষ্পলক দৃষ্টিতে না জানি কোন্ নিষ্ঠুর স্মৃতির জ্বালা। বাষ্পে ভরে উঠল দুচোখ। দুজোড়া পল্লব একত্র হল। অশ্রু ঝরে পড়ল দুগাল বেয়ে। আমার হাতদুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন উনি। বুঝতে পারলাম ভেতরে তুফান উঠেছে, সেই উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করছেন।

তারপর, এমন সংযোগে যা অনিবার্য, তাই ঘটল। হোটেলের কামরায় বসে ভদ্রমহিলার জীবনের গোপনতম কাহিনী শুনলাম। উনি মন্ত্রমুগ্ধের মত অকপটে সব বলে গেলেন। শুনতে শুনতে ব্যথায় ধিক্কারে লজ্জায় মাথা নত হ'য়ে এল আমার।

ভদ্রমহিলা জাতে পার্শী। অতীত পরিচয় অলুপ্ত থেকে গেছিল। বর্তমানে উনি বম্বের এক আধুনিক রেষ্টুরেন্টের গার্ল-ক্রুণার। রেষ্টুরেন্টের নাম শুনে অবাক হলাম আমি।

একে আমি দেখেছি। এতটুকু একটা মাউথপিস্ হাতে মৎসকুমারীর সাজে গান গাইছিলেন। ইংরিজি গান। পেছনে তিনজন কালো স্যুট পরা লোক বাজনা বাজাচ্ছিল। ঘরের বাইরে ওপ্‌ন্‌-এয়ারে বসে কফি খাচ্ছিলাম আমরা। যারা ড্রিংক আর ডিনারের মোটা বিল দিতে সমর্থ তারাই ভেতরে বসেছিল। তাদেরই চিত্ত বিনোদনের এই আয়োজন। পর্দার আড়ালে সামান্য একটু দেখা যাচ্ছিল একে। মুখ দেখতে পাইনি। তবু এখন চিনতে পারলাম।

পাঁচ বছর আগে মালাবার হিলস্-এর ওপর পরিচয় হয়েছিল একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে। আরব সাগরে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। মালাবার হিল্‌স্ থেকে সে দৃশ্য আমিও দেখেছি। মনে রাখার মত দৃশ্য। অস্তরাগের সে রঙ্ গার্ল-ক্রুণারের অন্তরে আজও সমুজ্জ্বল রয়েছে।

ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সবে এসেছে বম্বেতে চাকরি নিয়ে। বম্বের সবই তখন অচেনা। অচেনাকে চেনাবার ভার নিল আজকের এই গার্ল-ক্রুণার। মালাবার হিল্‌স্ থেকে মেরিন ড্রাইভ, জুহু, গেট ওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়া। তারপর ক্রমে এ্যালিফেন্টা, অজন্তা, ইলোরা, আর এই মাথেরণ্। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জন্মেছিল মোহ, মোহ থেকে প্রেম, প্রেম থেকে আস্থা, নিজেকে নিঃস্ব করে, রিক্ত করে অর্পণ করে দেবার অপার আনন্দ।

ছেলেটির জীবনে উচ্চতর বাসনা ছিল। আরও যোগ্য আরও দায়িত্ববান হবার বাসনা। জার্মানীর স্বপ্ন।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছেড়ে ছিল একরাতে। শূন্যের অপরিসীম ব্যোমে জেটপ্লেনের টেল্‌ল্যাম্পের জ্বলা নেভা দৃষ্টির সীমানার বাইরে হারাল একসময়।

শুভকামনা কাস্টমস্-এর অনুশাসন মানে না। মানে না কোন অন্তরাষ্ট্রীয় এয়ার রেগুলেশনের বিধিনিষেধ। তা ছাড়া আর কিছু দেবার ছিল না। শূন্য অন্তর থেকে তাই উজাড় করে ঘরে ফিরল আজকের এই গার্ল-ক্রুণার।

মাত্র একটি বছর। আবার সে ফিরে আসবে।

আশায় দিন কেটে যায়। সপ্তাহ, মাস। ক্রমে একটা ঋতুচক্রের বহুলাংশই। সম্ভাবনার আলোকবৃত্ত সংকীর্ণ হয়ে আসে। শুধু অজন্তা ইলোরা মাথেরণ্ ঘিরে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু মধুস্মৃতির সঞ্চয়। দিনান্তের অবসরে নিত্য তাই নিয়ে মণিহার রচনা। সে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে।

ফিরে সে এল না। আঁধারের কেন্দ্র বিন্দুতে আলোর নক্ষত্র জেগেছিল। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তার দীপ্তি লুপ্ত হল একদিন। এবার কোথায় আলোর সীমানা? আঁধার দিশেহারা হল গার্ল-ক্রুণার।

শরণার্থিণীকে যেন বিকল্পের সন্ধান দিলেন করুণাময় আহুরা মাজদা। গার্ল-ক্রুণার দেখল, ফিরে যে এলনা তারই প্রতিভূর দুই নীলাঞ্জন জুড়ে দুর্জয় বারিধির দুস্তর ব্যবধান যেন ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

তারপর। জুহুর সমুদ্রতটে কত ঢেউ ভেঙ্গেছে গড়েছে। আজ আবার নেরল্ মাথেরণ্ রেলযাত্রায় সেই পুরণ ক্ষতে নতুন আঘাত লাগল। ব্যথায় মূক মন আবার হাহাকার করে উঠল। তাকে ফিরিয়ে এনে দাও। ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও।

আমি ওঁকে কি করে বোঝাই, ফিরে আর সে আসবে না। ইলেক্‌ট্রিকের শকে পোড়া তার বিভৎস নীল দেহটাকে চিতার আগুণে দ্বিতীয় বার পুড়িয়ে এসেছি আমরা। পুড়ে পুড়ে দাদা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর কারুর কাছেই আর কোন দিনই ফিরে আসবে না।

আমার অজানা কিছুই রইলনা। দাদার অবৈধ স্ত্রীপুত্রের সামনে মাথা নত করে বসে রইলাম।

উনি নাম বললেন। ছবি বার করে দেখালেন। দাদার পাঁচ বছর আগে তোলা ছবি। দেখতে ঠিক আমারই মতন লাগে।

আমি ছবি দেখছিলাম। দাদার সন্তানকে দেখছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার মা সেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন আমার দিকেই। দাদাকে উপলব্ধি করছিলেন আমার মধ্যে।

নিজের পরিচয় দি এ সাহস আমার হল না। দাদার ছবি দেখে মাথা নাড়লাম। আমি চিনিনা। আমি জানিনা। ইনি আমার কেউ নন।

দাদা যে নেই কি করে বলব ওঁকে। থাকুন উনি দাদার আশায়। দাদা আবার একদিন ফিরে আসবে এ বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

নতমুখে বসে আছেন উনি। নীল কাপড়ের ওপর টপ্‌টপ্‌ করে অশ্রু ঝরে পড়ছে। অপচয় হচ্ছে। কি করে বোঝাই ওঁকে, আজ আর এ অশ্রুর কোন অর্থ হয় না।

প্রতিবছর এই সময় উনি মাথেরণ্‌ আসেন। উপলক্ষ্যটা ঠিক ছেলের জন্মবার্ষিকী নয়। আমায় অকপটে জানিয়েছিলেন ছেলেকে এই সময়ই তিনি কন্‌সিভ্‌ করেছিলেন। এই হোটেলেই এসে ওঠেন। দুষ্প্রাপ্য ছুটির কটা দিন কাটিয়ে যান এখানেই।

দাদা ওঁকে কিছুই দেয়নি। শুধুই ঠকিয়েছে। এই সন্তানের জন্য উনি মাথেরণের কাছে, এই হোটেলের কাছেই ঋণী। তাই এই মাথেরণ্‌ এই হোটেল ওঁর এত প্রিয়।

ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। এবার যেতে হবে আমাকে। বলবার কিছু ছিল না আমার। বিদায় চাইলাম। উঠে দাঁড়ালাম। উনিও উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে যতগুলো টাকা ছিল বার করে আমার সামনে মেলে ধরলেন। নিষ্পলক দৃষ্টি। ওঁর চোখের তারায় আমার প্রতিবিম্ব। দাদার ছবির মত ভেসে রয়েছে।

একটা দশ টাকা'র নোট তুলে নিলাম। বিদায়ের মুহূর্তগুলো মন্থর হ'য়ে আসছে।

এবার আমি চলে যাব। উনি আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর চুলের গন্ধ পাচ্ছি। ওঁর দৃষ্টিতে ভাষা নেই। আবার আমার হাতদুটো ধরলেন। প্রিয় বিচ্ছেদের উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছেন। পালাবার উপায় নেই আমার। অথচ একি ভুল করছেন উনি। দাদাকে খুঁজছেন আমার মধ্যে। কি করে বাধা দি ওঁকে। ক্রমেই ওঁর বন্ধনের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলাম। ভগবান জানেন, আমার অনুভূতি অসাড় হয়ে গেছে। উনি কাঁদছেন। ওঁর অশ্রুতে আমি সিক্ত হয়ে যাচ্ছি।

কি করব আমি? এ কি পরীক্ষা? কি বলব ওঁকে? ন্যায় অন্যায় কিছু বুঝতে পারছি না। মুখটাকে উনি তুলে দিয়েছেন। মেলে দিয়েছেন। ওঁর দুচোখে অসীম তৃষ্ণা। কাঙাল অধরে বেদনায় কামনায় মিশে সুধার সমুদ্র উপচে উঠেছে।

কি করি আমি? কি করি! কি করি!

বলাইকে ছেড়ে স্টেশনে ফিরে এলাম আমি। শোভনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, ওকি বাবা, বলাইকে কোথায় রেখে এলেন ?

বললাম, তোমার সেই বন্ধুটির কাছে। মানে ঐ যে মেয়েটি আসছিল আমাদের সঙ্গে, তার কাছে। টাকার জন্তেই পাঠালাম, বুঝতেই পারছ। তুমি ভেবনা, এলো বলে।

মুখে কিছু বলল না শোভনা। পরিস্থিতির পাকে পড়লে সংস্কারের কিছু অংশ বর্জনীয়।—কথাটা মেয়েরা বোঝে।

বুলু, রূপ দুজনেই ঘুমচ্ছে। আর সব চুপচাপ বসে আছে। দুপুরের গরম পড়েছে। দুটো বাচ্চাই ঘেমেছে। লালধুলোয় নোংরা চেহারা হয়েছে দুটোর। বুলুকে আবার তুলে নিলাম আমি। প্লাটফর্মের ওপর পায়চারী করতে করতে স্টেশনের শেষ প্রান্তে চলে গেলাম।

স্টেশনের পাশ থেকেই জঙ্গল আরম্ভ হয়ে গেছে। ঢালু রেলপথ নেবে গেছে তার মধ্য দিয়ে। মন খুব প্রসন্ন থাকার কথা নয়। সারা গায়ে ধূলো, ঘাম, গরম, তার ওপর এই অনিশ্চিতের ভরসায় বসে থাকা। বিরক্তি চেপে রাখার এই ভাল উপায়। বুলুর স্থকুমার অঙ্গ প্রসন্নতার সন্ধান দিল আমায়। বুলু নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। তাকে কোলে নিয়ে প্লাটফর্মের শেষে জঙ্গলের মধ্যে নেবে পড়লাম। একটু ছায়া দেখে বসলাম। মাথায় এক চিন্তা ঘুরছে, শ্রীমান বলাই আবার শুধু হাতে না ফেরে।

ফিরে যাবার ট্রেন তৈরী হচ্ছে। চারটে রেলকর্মচারী সাইডিং থেকে ছোট বগিগুলো ঠেলে ঠেলে এনে জুড়ে লম্বা করছে। দূরে এক জায়গায় ছোট্ট ইঞ্জিনটা প্রসাধন সেরে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রার প্রস্তুতি চলেছে। এই নায়ে আমাদের ঠাঁই হবে কিনা সেই হয়েছে সমস্যা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমি। রঞ্জিত এবার ঘুরতে ঘুবতে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়াল আমাদের দেখতে পায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেল। দ্বিতীয়বার স্টেশন মাষ্টারের কাছে গেছিল কিনা জানতে পারলে হত। ফিরে গেল রঞ্জিত। শ্রীমান বলাই কি পাকে পড়ল কে জানে। আমার ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে ছিল না। বসেই রইলাম। সময় কেটে যেতে লাগল।

লক্ষ্য করলাম বুলুর বুশসার্টের নিচে একটা গেঞ্জি রয়েছে। গরমে কষ্ট পাচ্ছে। দুটোর কি দরকার। বুশসার্টটা থাকলেই ভাল হ'ত। অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে

ওটা আমারই কিনে দেওয়া। আপাতত: ওটাই খুলে ফেলা যাক। স্বস্তি পাবে বুলু। খুব সন্তর্পণে বুশসার্টটা খুলে ফেললাম আমি। জামাটার দুদিকে দুটো পকেট। বুকের কাছে নয় পেটের কাছে। তারই একখানার মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমি, তুচ্ছ একখানা কাগজ। একখানা একশ টাকার নোট।

দোষ শোভনার নয়। পকেটেই রেখে দিয়েছিল। তবে বাপের পকেটে না রেখে রেখেছে ছেলের পকেটে। অত অবিলির মধ্যে অমন একটু উনিশ বিশ হয়েই থাকে।

আমি উচ্ছ্বাসিত হইনি। ধীরে সুস্থে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। টাকাটা দিলাম শোভনার হাতে। কোথা থেকে কি ভাবে উদ্ধার করেছি জানালাম।

মাথেরণ্ স্টেশনের একটা কোণ মুখরিত হ'য়ে উঠল। ওই একশ টাকার মূল্য কুবেরের ধনভাণ্ডারের চাইতে কিছু কম ছিল না। বেচারী শোভনা। শান্তি আর রঞ্জিত ওকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। তবে যার উপস্থিতিতে আমোদটা আরও জমত সে বেচারী হয়ত তখন ওদিকে সামান্য দশটা টাকার জন্যে ভিক্ষের ঝুলি পেতে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা সবাই সেই অবস্থায় উপলব্ধি করলাম।

ভাবনা রইল বলাই-এর জন্য। ওর এতক্ষণ ফিরে আসার কথা। ক্রমে যাত্রিদের ভীড় উঠছে স্টেশনে। টাকা হাতে পেতেই শোভনারও মেজাজ ফিরে গেছে। আমায় বললে, যান বাবা, আপনি ওকে ডেকে আনুন। কি করছে জানিনা। তিনটে বাজতে চলল। ভাল লাগে না।

অগত্যা আমায় আবার বেরোতে হল। ট্রেনের সময় সত্যিই হ'য়ে এসেছে। ওর উচিত ছিল এতক্ষণ ফিরে আসা।

লাল ধূলোর পথ মাড়িয়ে আবার আমি হোটেলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বলাই সম্ভবত এখনও ভেতরেই আছে। একটু ইতস্তত: করছিলাম আমি। কিন্তু হাতে সময় নেই, গেটের ভেতর ঢুকে গেলাম সোজা। মেয়েটির ঘরের সামনে গিয়ে পড়লাম। আশেপাশে লোকজন কেউ কোথাও নেই। ঘরের দরজার পর্দা অর্দ্ধেক টানা। দুপা আরো এগিয়ে ডাকতে গেলাম বলাইকে। থেমে গেলাম।

ডাকা আর হলনা। কি ভাবে যেন, গলার স্বর আমার আপনা আপনিই আটকে গেল।

ছি ছি। একি দৃশ্য। এত বাড়াবাড়ি ত' আশা করিনি। থমকে দাঁড়িয়ে

পড়েছিলাম। পর্দার ওপিঠে সবই চোখে পড়েছিল। বিছানার ওপর বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে। তার মা বলাই-এর দুবাহুর বন্ধনে। দুজোড়া ওষ্ঠ একত্র হয়ে রয়েছে।

প্রায় নিঃশব্দেই বেরিয়ে আসছিলাম আমি। বলাই নিজে কিন্তু আমার চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। আমাকে সামনে দেখেই ভূত দেখার মত থমকে দাঁড়াল। চোখ মুখ ফ্যাকাশে, ধরা পড়া অপরাধীর মত।

বলাই ডুকরে উঠল হঠাৎ, আপনি দেখেছেন?

—কি দেখেছি?

—বলুন না! পায়ে পড়ি আপনার। বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানিনা। শুধু ওঁর জন্যে।—আমাকে নয়, উনি অন্য আর একজনকে—,আমি জানিনা, আমি চিনিনা। আমায় গল্প বলছিলেন, কি ভীষণ ট্র্যাজেডি হয়েছে ওঁর। তাই দেরী হয়ে গেল। আমার দোষ নেই, বিশ্বাস করুন। আমি শুধু ওঁর জন্যেই।

—বেশতো, আমি বলেছি কিছু। থাক ও কথা। শোন। টাকা পাওয়া গেছে। হারায়নি। ওদিকে ট্রেন যে ছাড়ল বলে। সে খেয়াল আছে।

—টাকা পাওয়া গেছে? তবে—তবে ত,—এইটা নিলাম যে আমি। কি করব, ফিরিয়ে দি? ঠিকানাও যে নিইনি।

—যাকগে, বাদ দাও। সময় নেই। চল তুমি।

বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পর্দার আড়ালে মেয়েটি তখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে ছেলের ওপর। পিঠটা কাঁপছে থরথর করে। কাঁদছে।

বলাই-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। রঞ্জিত গেটের মুখে অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ভেতরে ঢুকতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

সহজেই উঠতে পারলাম অবশ্য আমরা। প্রথমে আমি। তারপর রঞ্জিত, সবশেষে বলাই।

বলাই-এর হাতে তখনও নোটটা ধরাই ছিল। যেই সে ট্রেনের হাতল ধরে উঠতে গেছে নোটটা ছেড়ে গেল তার হাত থেকে। উড়ে চলে গেল গাড়ীর তলায়। বলাই অমনি টপ করে নেবে পড়ল। আমাদের পেছনে মোট আর একটি বগি। তারপরই গার্ডের কেবিন। ট্রেন ঢিক ঢিক করে এগোচ্ছে।

বলাই লাইনের ওপর একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। লাইন প্লাটফর্ম থেকে মোট একবিঘৎ নীচে। বলাই নোটটাকে দেখছে।

গাড়ী বেরিয়ে গেলে লাইনের ওপর থেকে নোটটা কুড়ল বলাই। ওপর

দিয়ে পরপর গোটা কতক চাকা গড়িয়ে গেছে। যে অবস্থাই হোয়ে থাকুক তার, বলাই সেটাকে সংগ্রহ করল। খানিকটা ছুটে গাড়ীতে উঠে পড়ল আবার। ভেতরে ঢুকল না। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ বাইরের জঙ্গলের দিকে। নোটটা হাতে ধরে রয়েছে।

স্টেশন পেছনে ফেলে অনেকটা নেবে এসেছি আমরা। বলাই এখনও ভেতরে ঢুকল না। নোটটা হাতে ধরে রয়েছে তখনও। সেটার অবস্থা শ্রীরাধিকার শতছিদ্র কলসের মত। চোখের সামনে তুলে ধরলে শতখণ্ড আকাশ দেখা যাবে। এখনও তাতে লেখা আছে, "আই প্রমিস টু পে দি বেয়ারার—", গভর্ণর সাহেব বলাইকে ওই রেলের চক্রে পিষ্ট কাগজটার জন্য দশটা টাকা দেবেন কিনা জানিনা, ফিরিয়ে দিতে গেলে হোটেলের সেই আধুনিকা আর একটি চুম্বন হয়ত দিতে পারে।

শ্রীমান বলাই বোধ করি সেই আশাতেই নোটটাকে একসময় তার শূন্যগর্ভ মানিব্যাগটার মধ্যে পুরে রাখল।

*      *      *      *

মাস্টারমশাই আমায় কি ভাবছেন জানিনা। আমার সম্বন্ধে ওঁর মনোভাব দুষিত হোক এ দুঃখ আমার নেই। দুঃখ এই, সত্যই তা হবে না। ওঁর ঘৃণা বিতৃষ্ণার একশ ভাগ গাল্‌-ক্রুণারেরই ভাগ্যে জুটবে।

দাদার মত আমিও পালিয়ে চললাম। উনি খুঁজুন দাদাকে। সে নিষ্ঠা যেন বিচলিত না হয়। ঈশ্বর জানেন, আমার স্পর্শে সে সততা কলুষিত হয়নি। মাথেরণের এই মুক পাহাড় স্বাক্ষ্য থাকবে, ওঁর অধরে আমার চুম্বন নয়, প্রণতি আঁকা রইল।

---

## ॥ নিলামী টেগোর ॥

এলাহাবাদ সহর। জুনমাসের বেলা সাড়ে এগারোটা। বাইরের তাপমান একশো ষোল ডিগ্রী ফারেণহাইট। আর্দ্রতা শতকরা সত্তর ভাগ।

রঘুপতি রায় তার জরাজীর্ণ সাইকেলের কুঁজে চেপে বাড়ী ফিরছে। নিয়মিত বিরতিতে বেয়াড়া আর্তনাদ করছে সাইকেলটা। পথচারীরা কেউ বিরক্ত হচ্ছে। কেউ মনে মনে সহানুভূতি জানাচ্ছে রঘুপতিকে।

খেয়াল ছিল না, দাড়ী কামায়নি কয়েকদিন। তাই কপাল বেয়ে থুতনি পর্যন্ত নাবতে ঘামের ফোঁটাগুলো সময় নিচ্ছে। দু-একটা চলে যাচ্ছে চোখের মধ্যে। চোখ জ্বালা করছে।

রঘুপতির পরনে একটা খাকি ফুলপ্যাণ্ট। ময়লা হয়েছে। পায়ের কাছে সুতোর ঝালর বেরিয়েছে। চেনের কালিতে চর্চিত। বারবার উল্টোদিকে প্যাডল করে ডান পাটাকে চেনমুক্ত করছে রঘুপতি। বাঁ দিকের প্যাডেলটা খোয়া গেছে। থেকে গেছে লোহার রডটা। সস্তা চটির ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ে তার খোলা অন্তটা মারাত্মক রকমের ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। ঢিলে চটিটাকে স্বস্থানে রাখার জন্যে ক্রমাগত খানিকটা বাড়তি মেহনত করে যাচ্ছে রঘুপতি। আর এক আপদ। চেনটা থেকে থেকে নেবে যায়। তখন থামতে হয়। চেন পরিয়ে আবার খানিকদূর যাওয়া চলে।

পথের ধূলো আর জুনের রোদ উপেক্ষা করে অসুন্দর মুখটাকে কুঁচকে বিকৃত করে বাড়ী ফিরছে রঘুপতি রায়।

যেতে যেতে হিসেব করে দেখল, যদি আর এগারোটা মাস এই সাইকেলটা এইভাবে চালাতে পারে তাহলে এম. টেক্ এর ডিগ্রীটা পেয়ে যাবে। তারপর, ঈশ্বর সহায়, একে না চালালেও চলবে। নিজেই চলবে রঘুপতি। চলতি ভাষায়, চালু হয়ে যাবে। দায়মুক্ত হবে সাইকেলটা।

ফিরছে ছাত্রীর বাড়ী থেকে। একেবারে অশোকনগরের পশ্ অঞ্চল থেকে মুষ্টিগঞ্জের এক জটিল গলিতে। তার বি. এস-সির অপটিক্সের নোটটা উদ্ধার করতে পেরেছিল বহু যত্নে। সেটাই দিয়ে আসতে গিয়েছিল অসময়ে। রঘুপতি

রায়ের বি.এস-সির ফলাফল দেখে এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর গুটি ছয়েক মেডেল উপহার দেন। তাই নোটগুলো আয়ত্তে আনায় বেবীগুপ্তার এত আগ্রহ। বেবীগুপ্তা সাইকেল চেপে মেয়র কলেজ যায় না। গাড়ী আছে তার বাবার। রঘুপতির দাদা আর বেবিগুপ্তার বাবা একই অফিসে কাজ করেন। 'আড়াইশো আর আঠারোশ', বেতনের স্কেলটা শুধু এক নয়।

এক নয় বলেই 'শেষের কবিতা' মার খেয়ে গেল। অন্যায় রঘুপতিরই। গোলচাঁদের মধ্যে একজোড়া ন্যাজঝোলা পাখী, দু টাকা চার আনার বইয়ের প্রথম পাতায় এ শিল্প নিদর্শন 'মারকেটিং ম্যানেজারের' মেয়ে বরদাস্ত করতে পারে না।

বেবীগুপ্তার জন্মবার্ষিকীর পার্টি ছিল কাল রাত্রে। দৃশ্যটা মনে পড়ছে রঘুপতির। একুশ বছরের তরুণী কন্যা লীলায়িত ভঙ্গীতে একে একে নেভাল সতোরোটি মোমবাতি। মিহি আর মোটা গলায় ওরা গাইল 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ'।

একটা টেবিলের জোগাড় রাখা হয়েছিল। প্রীতি উপহারগুলো তার ওপর স্তূপীকৃত হল। সঙ্কোচে সবচেয়ে শেষে দিয়ে থাকবে। তাই শীর্ষস্থান পেল, তার 'শেষের কবিতা'।

ঘ্যাঁচ করে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে নিল রঘুপতি। এ্যাডভোকেট ধর্মানন্দ গোইন্দীর বিরাট বাড়ীর 'আউট' দিয়ে ঢুকে, গাড়ীবারান্দার মধ্যে দিয়ে চালিয়ে, 'ইন' দিয়ে বেরিয়ে এল। ভগবান বাঁচিয়েছেন। আর একটু হলেই হয়রাণির একশেষ হত। ওই 'আউট' আর 'ইনের' মধ্যে নগর মহাপালিকার লোক খাকী কোর্তা, কোমরে লাল বেল্ট, সাইকেলের লাইসেন্স ধরছে।

বেবীগুপ্তা বলেছিল, শোভনলালের রোলটা খুব ইন্টারেষ্টিং, না! আচ্ছা ওই 'শেষের কবিতা' বইটাই কেন প্রেজেন্ট করলেন বলুন তো। মানে—, ইয়ে বই তো আরও ছিল অনেক। আর ওই ছবিটা—। গস্‌স্‌! হঠাৎ অনেকটা হাসি ছলকে উঠেছিল বেবীগুপ্তার গলা থেকে, ওঃ, কি চয়েস্ আপনার। ওরা কি ফান করলে ওই নিয়ে।

হাসির দমকে পরিচালিত যে আঁচল স্খলিত হয়ে অবারিত করেছিল ব্রা-তাড়িত-উত্তুঙ্গতা, আর নাভির উভয় প্রান্তে প্রায় সমবিস্তীর্ণ আড়াইশো মিলিমিটার মিডরিফ্, বেবীগুপ্তা এতক্ষণে তার বেয়াদপী হেলায় শাসন করল।

এবার তার লক্ষ্য রঘুপতির সাইকেলের সিটের উপর। সিট্‌টার ওপর চামড়ার আবরণ জীর্ণ হয়েছে। এক-টুকরো কাপড় জড়িয়ে কাজ চালায় রঘুপতি। কাপড়টা খুলে গেছিল। বেরিয়ে আসার আগে সেটাই বেঁধে নিচ্ছিল রঘুপতি। ছাত্রী সৌজন্যের দায়ে আর নয় গত রাত্রির সঞ্চিত বিতৃষ্ণার বাকীটুকু উদ্গার করতে তখনও গেটের মুখে দাঁড়িয়ে. বেবীগুপ্তা বলল, একটা কভার কিনলে পারতেন বইটার বদলে। এমন ন্যাকড়া জড়িয়ে আর কদিন চলবে?

সোচ্চার বিদ্রূপের বিনিময়ে নির্লিপ্ত উপেক্ষা ফিরিয়ে দেয়াই স্বভাবধর্ম রঘুপতির। আজ ফস্ করে বলে ফেলল, দেখুন, সেই যে ইভ্‌জননী নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেললেন, তারপর থেকে এই বিধিই মেনে আসছি আমরা। চামড়াকে ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা দি। তবে জানি রুচির রিফাইনমেণ্ট হচ্ছে। আপনাদের প্রগতি দেখে ভরসা হয়, এ বিড়ম্বনাটুকু শীঘ্রই বর্জন করা যাবে। চলি।

চলেছে রঘুপতি। চলেছে মাষ্টার অফ্‌ টেক্‌নলজি তার প্রিমিটিভ বাহনে। এম্. টেক্-এর সবকটা মেডেল তার চাই। একশো ষোলো ডিগ্রী ফারেণহাইটে কিছু আসে যায় না।

বড় একটা ঘামের ফোঁটা চোখে গেল। উল্টোদিকে প্যাডেল করে ডান পাটাকে চেনমুক্ত করল রঘুপতি। সাইকেলের গতি বাড়াল।

ডুগ—ডুগ—ডুগ—ডুগ—ডুগ।

মোড় ঘুরতেই শব্দটা কানে গেল রঘুপতির। দেখল বড় একটা বাড়ীর গেটের সামনে একটা থুড়থুড়ে বুড়ো দুটো কাঠি দিয়ে ডুগীর মত একটা বাজনা বাজাচ্ছে। পাশে খানিকটা আগুন জ্বলছে। রঘুপতি জানে ডুগীটা মাঝেমাঝে তাতিয়ে নিতে হয়। গেটের পাশে একটা ব্লাকবোর্ডের গায়ে লেখা, 'গ্রাণ্ড অক্‌শন্—শানদার নীলাম'। গেটের পাশে একটা পানবিড়ির দোকান। তার পাশে একটা পিয়াউ-জলসত্র। চাটাইয়ের বাক্স ভেদ করে হাত তিনেক লম্বা একটা আসামী বাঁশের অর্দ্ধাঙ্গ। ভেতরে নিমগাছের ছায়ায় গোটা পঞ্চাশেক লোক। মাঝখানে অকশনিয়র পাঞ্জাবীর বিরাট পাগড়ী। চেয়ার, টেবিল, আলনা, আলমারি চারপাশে ছত্রাকার।

নাবতে নাবতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাল। অর্ধবৃত্তাকারে সাঁ করে গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেল রঘুপতি।

গত ছ'বছর টিউশনি করছে। ছ'বছরে গড়ে দশ টাকা হিসেবে ষাট টাকা

সঞ্চয় করে। অবশ্য কথাটা খুবই গোপনীয়। নিলামে ষাট টাকায় সাইকেল পাওয়া যায়। খোঁজ নিয়ে দেখতে দোষ কি ?

গেটের গায়ে সাইকেলটাকে লক্ করে ভেতরে গেল রঘুপতি। পুছতাছ করে জানল, সাইকেল বেরিয়ে গেছে তিনখানা। দুখানা লজঝড়, একটা ভাল ফিলিপস্। ষাট উঠেছিল। মিনিমাম প্রাইস পয়ষট্টিতে নিয়ে গেছে।

ষাট আর পাঁচে পয়ষট্টি। আরও ছ'মাসের টিউশনি। ভালই হয়েছে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ রঘুপতির মনে নিজের পুরাতন বাহনটার প্রতি একটা বাৎসল্য ভাব জাগল। গোটা ত্রিশেক ওর পেছনে লাগাতে পারলে এখনও ও পক্ষীরাজ।

ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ জানতে পারল এবার নিলামে উঠছে তস্‌বীর—ছবি।

ছবি! ভিড়ের মধ্যে ক্ষীণ দেহটাকে বিদ্ধ করল রঘুপতি। সেঁদিয়ে গেল ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে, একেবারে অকৃশনিয়র পাঞ্জাবীর শ্রীপাদসমীপে।

এম. টেক্-এব মেধাবী ছাত্রের এই এক বদ্‌রোগ। ছবির ব্যাপারে তার দুর্বলতা কৌতুক জোগায় সসখী বেবীগুপ্তাকে। তবু রঘুপতি নির্বিকার। ছবি দেখার জন্যে ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে।

অকৃশনিয়র পাঞ্জাবীর হাতে লম্বা একটা ছড়ির ডগায় একটা খুঁদে হাতুড়ী। অন্য হাতে একটা অয়েল পেন্টিং। তলায় নাম লেখা। চোখে ঘাম ছিলনা। সহজেই পড়ে ফেলল রঘুপতি। রিক্লাইনিং নিউড্। ঝটিতি মনে পড়ল, বুচারের আঁকা এই নামেরই একটা বিখ্যাত ছবি আছে। এটা কিছুটা অন্য ধরনের। নগ্ন নারী মূর্তি। ক্যানভাসের বুকে হিউম্যান অ্যানাটমির পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন শিল্পী। রঘুপতির পদার্থ বিজ্ঞানের মেধা কিন্তু ক্ষিপ্ত হল হঠাৎ। কি আপদ! মাধ্যাকর্ষণ মেয়েটির অঙ্গবিশেষের ওপর পক্ষপাতিত্ব করে—হঠাৎ অমন বিপরীত ধর্মী হয়ে উঠেছে কেন ?

মাধ্যাকর্ষণের ভুলচুকের কে ধার ধারে। 'রিক্লাইনিং নিউডের' দাম উঠল সাড়ে সাতটাকা। চলে গেল কোন এক 'কন্‌হইয়া কেশকর্তনালয়ের' শোভা বাড়াতে।

তারপর বরফের দেশে এক উইণ্ড মিলের দৃশ্য। দাম যা উঠল তাতে বাঁধাবার খরচ উঠত না।

আর একবার ঝুঁকে পড়ল পাঞ্জাবী। আর একটা ছবি উঠল নিলামে।

এমনি সময়, জুলফির এলাকায় কোন ঘামের ফোঁটা রঘুপতির চোখের সীমান্তে এসে প্রসারিত হল। প্রাণপণে ছটো চোখই খুলে রাখল রঘুপতি। স্বেদাহত বলা চলে, সেই দৃষ্টিতে দেখল ছবিটা। সেই অবস্থায়, সাধ্যমত, দর্শনের পূর্ণ মর্যাদা দিল।

টেগোর। টেগোরের তিনশ বাই সাড়ে চারশো মিলিমিটার বাষ্ট। আরও বড় করে বাঁধান। গোটা নয়। শতধাবিদীর্ণ কাঁচ। ধূলোর ঝুলের এলোমেলো প্রলেপ পড়েছে ওপরে। সেই সব বাদ দিয়ে বিচার করল রঘুপতি। মোটামুটি একটা সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে নেবার স্পর্ধা হলনা তার।

তিনশ বাই সাড়ে চারশো মিলিমিটার বাষ্ট। আগাগোড়া চাইনীজ ইঙ্কের ডট্‌শেডে আঁকা। সেই ডট্‌-ফুট্‌কির ঘনত্ব ভেদে চুল-দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাস্য নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ-কোটি ফুট্‌কি। প্রতিটির স্বতন্ত্রভাবে স্থান নির্ধারিত হয়েছে। অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে অবিচল ধৈর্য মিলে সার্থক এই দুর্লভ শিল্পসৃষ্টি। ছাপা নয়, আঁকা ছবি।

—এক রূপেয়া

—এক রূপেয়া, বোলিয়ে, এক রূপেয়া—, বোলিয়ে—

—দেড় রূপেয়া, রঘুপতি শুনল, পঞ্চাশ পয়সার ধাপে টেগোরের দাম বাড়ছে। পাঞ্জাবী হাঁকছে—

—দেড় রূপেয়া। গোয়িং চিপ্। দেড় রূপেয়া। রূপেয়া আট আনা। টাইগোর পিচ্চর। দেড়—দেড়

—রূপেয়া বার আনা।

—ভেরী গুড্। রূপেয়া বার আনা। ষ্টিল গোয়িং চিপ্। এক রূপেয়া বাব আনা। বোলিয়ে ভাইয়োঁ। নিলামী বোলি—টাইগোর—

—দো রূপেয়া।

—দো রূপেয়া, সাবাস্। দো—দো—দো—

আট আনা থেকে চার আনার ধাপে নেবে গেলেন টেগোর। রঘুপতির মনে হল সেও নেবে যাচ্ছে। পায়ের তলায় মা বসুন্ধরে তাঁর সর্বংসহা শক্তি হারাচ্ছেন। তাঁর ওপর আর আস্থা রাখল না রঘুপতি। ভিড়ের মধ্যে তার ছাপান্ন কিলো ভারের বহুলাংশ বিতরণ করল।

পাঞ্জাবীর বাঁ হাতে ছবিটা দুলছে। রোদ ঠিকরে পড়ছে ফাটা কাচের ওপর

থেকে। সক্রিয় হয়ে উঠছে চাইনীজ ইঙ্কের ফুট্‌কি। বদলে যাচ্ছে টেগোরের মুখটা। স্বকীয়তা বিলাসী ফুটকির দল গৃহকলহের মাদকতায় পরস্পরের ধ্বংসের আয়োজন করছে। ফাটা কাঁচের আল্‌গা বাঁধনের আড়ালে একটা নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হতে দেখল রঘুপতি। নক্‌শালবাদ নতুন সংবিধান গড়ছে। ভয় পেল রঘুপতি। সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেনা ওরা, এমন সুন্দর একটা সৃষ্টি এখনি কুৎসিত আর একটা কিছুতে রূপান্তরিত হবে। খুন করবে ওরা টেগোরকে।

—দো রূপেয়া, দো রূপেয়া, দো—

আর থাকতে পারল না রঘুপতি। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, দো রূপেয়া চার আনা। উচ্চকণ্ঠের এই বলিষ্ঠ ঘোষণায় সচকিত করল জনতাকে। বিস্ময়ে হাঁ করে থাকবে পাঞ্জাবী, গোঁফ দাড়ির আড়ালে বোঝা গেল না। সেই দশা টেগোরের।

—দো চার, দো চার, টু ফোর অন্‌লি। বোলিয়ে আউর কোই। দো চার। দো রূপেয়া চার আনা, দো চার—

অনেকক্ষণ একঘেয়ে হেঁকে চলল পাঞ্জাবী। সমবেত জনতার ওপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। কেউ সাড়া দিল না।

এইবার, এইবার হাতুড়ী তুলবে পাঞ্জাবী। মুখে বলবে, এক—, দো—, ফাটা কাঁচের ওপর হাতুড়ী ঠোকার শঙ্কাজনক শব্দ উঠবে, তিন। তারপর, ও তারপর। ভাবতেই রঘুপতির সারা গা শিরশির করে উঠল। তারপরের সম্ভাবনাকে অনিবার্যতার দাবীতে স্থির নিশ্চিত করে তুলল।

ঢোক গিলল রঘুপতি। শুকনো গলার মধ্যে উদ্ধত কণ্ঠটা কষ্টে উঠানামা করল।

হাতুড়ী কিন্তু তুলল না পাঞ্জাবী। অনেকক্ষণ ডাকার পর ছবিটা একসময় নাবিয়ে রাখল। ঘোষণা করল, উপযুক্ত দাম না উঠায় এ ছবি বিক্রী হল না।

—কিঁউ, কিঁউ নহী? আরে বাহ্‌। ককিয়ে উঠল রঘুপতি।

রুষ্ট প্রতিধ্বনি তুলল পাঞ্জাবী। দেখাল, বিস্তর মাল পড়ে রয়েছে। হয়নি বিক্রী। বলল, বেকার বহস্‌ করতে হো জী। অরে, কমসেকম মিনিমম প্রাইস তক্‌ ত' আ জানা চাহিয়ে। কোই মেরা ঘরকা সামান হ্যায়?

পাঞ্জাবীর ধমক খেয়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রঘুপতি। মিনিমাম

প্রাইস কত নির্ধারিত হয়েছে খোঁজ নিলনা। কি বোঝাবে পাঞ্জাবীকে। কাল বেবীগুপ্তার বার্থ ডে পার্টিতে নিলাম করে এসেছে টেগোরকে। ঠিক দুটাকা চার আনায়। তবে। এই একদিনে হঠাৎ ধাঁ করে টেগোরের বাজার দর চড়ে যাবে কেন?

সাইকেলের তালা খুলে বাইরে এল রঘুপতি। জলসত্রটা দেখে খেয়াল হল তেষ্টা পেয়েছে তার। মুখের মধ্যে তরল পদার্থ বলতে অবশিষ্ট আর কিছু থেকে যায়নি। সাইকেলটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে দাঁড় করাল। পকেট হাঁতড়ে একটা পাঁচ নয়া পেল। প্রথমে গেল পানবিড়ির দোকানে। পাঁচ নয়ার বামদানা কিনল। পাঁচ নয়ার বিলাসিতায় নিলাম হারার শোধ তুলবে। সবটা একসঙ্গে পুরে দিল মুখে। কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। জলসত্রের বাঁশের তলায় হাত পাতল। ঠাণ্ডা কনকনে জল, তাতে আবার কেওড়ার গন্ধ। বাঁশের অর্ধাঙ্গ বয়ে দ্বিতীয় ঘটির জলও নেমে এল। রঘুপতি নিঃশেষে পান করল সবটুকু। তৃপ্ত হল। স্থির করল, এখান থেকে ফেরার পথে রোজ খানিকটা জল খেয়ে নেবে।

ভিজে হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ডগা পকেটে পুরল সন্তর্পণে। এককোণ ধরে টেনে বার করল রুমালটা।

ডানহাতে সাইকেল, বাঁ হাতে মুখের ওপর রুমাল চেপে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঘুপতি। মুখ পোঁছা হলনা। শরীর শিথিল হয়ে এল। আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠতে লাগল ঘাড়ের লোমগুলো। পেটের মধ্যে কলকলিয়ে উঠল ঠাণ্ডা কেওড়ার জল। ধুকর কাছে ফুটতে লাগল বামদানার কুচি। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঘুপতি।

জলসত্রের জলজমার জায়গায় নোংরা পাঁক হয়েছে। বামদানার কাগজটা তার মধ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছিল রঘুপতি। জলে ভিজে খুলে গেছে সেটা।

কাগজটাকেই লক্ষ্য করছিল রঘুপতি। ঋষিকল্প একটা মুখ, স্নিগ্ধ ভর্ৎসনা, ক্ষমা-সুন্দর হাসি নিয়ে যেন চেয়ে আছে তারই দিকে।

পঁচাশী স্ক্রিন হাফটোন প্রিন্টের সূক্ষ্ম ফুটকিগুলো এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল রঘুপতি। টেগোর। টেগোরের তিরিশ বাই পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার বাষ্ট। নিলামে হারার ছবিটারই যেন ক্ষুদ্রপ্রকরণ। পঁচিশে বৈশাখের পরদিন ছাপা হয়েছিল কাগজে। পানওয়ালা ঠিক সেই অংশটুকুরই সদব্যবহার করেছে তার পাঁচনয়ার বামদানায়।

একটা খেঁকী কুকুর এসে পড়েছিল জলসত্রটার কাছে। জলওয়ালার জল ছোঁড়ার রসিকতার আওতায়। ঠাণ্ডা জল গায়ে পড়তেই লাফ মারল কুকুরটা।

চোয়ালদুটো পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল রঘুপতির। চোখের সামনে কুকুরটার পায়ের তলায় পাঁকের মধ্যে তলিয়ে গেল কাগজটা।

কুকুরটা উঠে আসছিল। নিদারুণ ক্ষোভে রঘুপতি লক্ষ্য করল, জানোয়ারটার মুখভাবে পূর্বমুহূর্তেকৃত এমন একটা জঘন্য অপকর্মের প্রতিক্রিয়া জনিত বিন্দুমাত্র বিকার নেই। মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হল রঘুপতি। বাঁ পায়ের প্যাডেলটা সবচেয়ে উঁচুতে তুলে নিয়ে শরীরের সম্পূর্ণভার চাপিয়ে দিল তার ওপর। ডান পায়ে মাটির ওপর সজোরে ঠেলা মারল। ছিটকে গিয়ে সাইকেলটা মোক্ষম এক ঘা দিল কুকুরটাকে। সাইকেলটা পড়ল। রঘুপতিও পড়ল মুখ থুবড়ে। আর্তচিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল কুকুরটা।

চারপাশের লোক হাঁ করে তাকিয়ে ছিল রঘুপতির দিকে। জলওয়ালা শাস্তি মন্তব্য করল, বৌরায়গা বাঙালী।

রঘুপতি একটা পাথর খুঁজছিল। পেলনা। কুকুরটা পালিয়েছে ততক্ষণে।

নিজের ধূলিমলিন দেহটাকে মার্জন করলনা রঘুপতি। পার্শ্বিকের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রচ্ছন্ন রেখেছে মুখভাবে। পাঁকের মধ্যে থেকে সযত্নে উদ্ধার করল কাগজটা।

আর সেই মুহূর্তে, অকস্মাৎলব্ধ এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল রঘুপতির এতাবৎ নতশির ব্যক্তিত্ব। কণ্ঠে জাগল শাহানশাসুলভ পরাক্রম। কাগজটা মেলে ধরল বাঁশের তলায়। আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র স্বরে হুকুম করল, ‘পানী লাও’।

## ॥ উত্তম পুরুষ ॥

দত্তগিন্নীর দ্বাদশ সন্তানটি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মাটির ঘরের বারান্দায় বসে হিসাব কষতে কষতে রামসুমেরের ন্যাড়া মাথাটা ঘুরতে লাগল।

অনুমান করল রামসুমের, এই বারোটি মানুষ, গড়ে বারোটি করে সন্তান সৃষ্টি করবে। বারো বারোং একশ চুয়াল্লিশ। তারা বারোটি করে। এক হাজার সাতশ আটাশ। তারা বারোটি করে, কুড়িহাজার সাতশো ছত্রিশ। তারা বারোটি করে, ড়ুলক্ষ ষাট হাজার—। এতদূর ভাবতেই রামসুমেরের ছানি পড়া বাঁ চোখটা মধ্য ললাটে উঠে এল। দিব্যচক্ষে দেখতে পেল, অদূর ভবিষ্যতে দত্তগিন্নীর প্রসূত নরকীট জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে থিক থিক্ করছে।

আমার কাছে ছুটে এল রামসুমেব। ন্যাড়া মাথার নীচে ছানিপড়া বাঁ চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, কি হবে মাস্টারমশাই! হিসাবটা কি ভুল হচ্ছে?

হিসেব কিছুমাত্র ভুল হচ্ছেনা রামসুমেরের। আজ ন' বছর সাত মাস এগারদিন ধরে ছাগলের দুধ জোগাচ্ছে দত্তবাড়ীতে। তার হিসেব একচুল এদিক ওদিক হয়নি। এ হিসেব ত' তার কাছে জলবৎ। অবশ্য এতটা উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল না তার। কেননা সেই ঠাসাঠাসির দিনে আমি বা রামসুমের কেউই জীবদ্দশায় এই দুনিয়াতে থাকব না। তার চেয়ে বড় সান্ত্বনা, আমি বা রামসুমের দুজনের কেউই এমন কাউকে রেখে যাবনা যাকে এ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে। এই কথাটাই বোঝালাম তাকে। বললাম, বাপু হে, চিন্তা ছাড়। অহেতুক জটিল চিন্তায় স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। তোমার ছাগলদুধের খানিকটা দই ন্যাড়া মাথায় লাগাও, খানিকটা জলের সঙ্গে তরল করে পান কর। আরাম পাবে। যা হবার হবে। তুমি কেন মিছে ভেবে মর!

রামসুমের তখনকার মত বিদায় নিল।

দত্তগিন্নীর এই শেষ উৎপাদন। তাঁর দ্বাদশ সন্তানটি জন্ম নিয়েছে জন্মদাতার মৃত্যুর সাতমাস পর। দত্তসাহেব আজ সাতমাস হল দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর জেষ্ঠটির বয়স একুশ বছর, কনিষ্ঠটির জন্ম হয়েছে আজ তিনদিন হ'ল। আমার অধ্যাপনা আর রামসুমেরের ছাগলের দুধ এ দু'য়ের ওপর জন্মগত অধিকার এদের।

আমি দত্ত পরিবারের চিরস্থায়ী গৃহশিক্ষক—মাস্টারমশাই। রামসুমের দত্তমালঞ্চের চিরস্থায়ী মালাকার—বাগানের মালি। কাদম্বিনী লজ, অর্থাৎ এই দত্তবাড়ীর বাগানের এককোণে পাশাপাশি দুটো ঘরে আমাদের আশ্রয়।

এ সহরে, এলাহাবাদ-এ আমি যখন চাকরীর সন্ধানে এসে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, রামসুমেরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে আজ সাতবছর আগেকার কথা। আমার দুরাবস্থা দেখে রামসুমেরের ছানিপড়া বাঁ চোখটা ছলছল করে উঠেছিল। আমাকে ধরে আনল দত্তসাহেবের কাছে।

দত্তসাহেবের তখন মাত্র সাতটি সন্তান। দয়া দাক্ষিণ্যে ভাঁটা পড়েনি। রামসুমের আমার সঙ্গে তার এইভাবে পরিচয় করালে, ইনি হলেন আমাদের নতুন মাস্টার মশাই। কাল থেকে খোকাদের পড়াবেন।

—ও বেশত। আপনার শুভনাম। আমার ইন্টারভিউ আরম্ভ হল।

—শ্রীব্রজকিশোর উপাধ্যায়।

দত্তসাহেবের নাসাগ্রে কুঞ্চন দেখা দিল। বললেন, হবেনা, আমার বাঙালী মাস্টারের দরকার। খোকাদের কি শেষে—?

—হবে না মানে? আচ্ছা জেদ আপনার। দত্তসাহেবকে ধমকে উঠল রামসুমের। বললে আরে উনি কি আর হিন্দী পড়াবেন? মস্ত পণ্ডিত লোক। এই জেনে রাখুন। কত ভাল বাঙলা জানেন দেখছেন না? খুঁজে ত' আপনি আনবেন না, তার বেলায় এই গয়না। শুনছে কে আপনার আপত্তি? উনিই থাকবেন।

আমিই থেকে গেছি। হিন্দীবিদ্বেষী দত্তসাহেবের সন্তানটির চিরস্থায়ী গৃহশিক্ষক শ্রীব্রজকিশোর উপাধ্যায়।

জ্যেষ্ঠ অজু থেকে কনিষ্ঠ সদ্যজাতটি কেউ যাতে এই প্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাবে না পড়ে সাতমাস আগে পর্যন্ত দত্তসাহেব সেই চেষ্টা করে গেছেন। এখানে পড়তে হলেই হিন্দীতে পড়তে হবে, হিন্দী পড়তে হবে, এই তার আপত্তি। হিন্দীর ধুয়ো উঠার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের যে কটি স্কুলে ছিল টপাটপ ছড়িয়ে নিলেন। তারপর আর কাউকে ভর্তি করেননি। আমিই সবাইকে বাড়ীতে অঙ্ক, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান অল্প অল্প পড়িয়েছি। আর আজ সাতবছর ধরে দত্তসাহেবকে অভিসম্পাত দিয়ে এসেছি।

একি অপরিণামদর্শী জেদ! আমি হিন্দুস্থানী, হিন্দী পড়েছি, বাংলা বলতে

পারি স্বচ্ছন্দে, লিখতে পারি, কেতাবি বিদ্যেও আছে কিছুটা। চোখকান বুজে বলতে পারি, বাঙলার উৎকৃষ্টতা অনস্বীকার্য। সে না হয় হল। তা বলে ছেলেগুলোকে মূর্খ করে রাখার স্বপক্ষে কি সুযুক্তি আছে? তাদের ভবিষ্যত? গোটা জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কি করে গেলেন দত্তসাহেব?

কিছুই করেননি দত্তসাহেব। আমি আমার যথাসাধ্য করছি। এ বাড়ীতে দুর্দিনে আশ্রয় জুটেছিল। কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে। দত্তসাহেবের আদর্শ যাতে আহত না হয় আবার ছেলেগুলো বড় হয়ে রামসুমেরের মত ছাগলের দুধ না বিক্রী করে, এই দুদিক আমায় সামলাতে হয়েছে। সামলেছি সামান্যই। দত্তসাহেব নিজের জীবনে যে অনিবার্যকে অস্বীকার করেছিলেন ছেলেগুলো তার ফল ভোগ করছে।

বড় ছেলে অজু আর বড় মেয়ে অচুন কলকাতা থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়েছিল। আমিই পড়িয়েছিলাম। পরীক্ষা দিতে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে গেছিলাম। ম্যাট্রিকে অজু টায়েটুয়ে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করে। অচুন ফেল করে। পরের দুই ছেলের বেলায় এ আদর্শকে রক্ষা করতে পারিনি, আমি। ওরা দুজনেই এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তবে ইংরাজী মিডিয়ামে। কিচলু পাশ করেছিল বাপের অগোচরে। জিতু বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে পাশ করে। এ বাড়ীতে থাকেনা জিতু। সহরে কাকার কাছে থাকে। সেখান থেকে আই, এস সি পড়ছে। অজুকে ঢুকিয়েছি আই টি আই. ট্রেনিং-এ। মেশিনিষ্ট হবে। কিচলু টাইপিং শিখছে। অচুন মহিলা শিল্পভবনে কিছুদিন পড়ে ছেড়ে দেয়। আর কটি আদর্শবাদী বাপের নির্লিপ্ততার জলজ্যান্ত প্রতিচ্ছবির মত দত্তমালঞ্চের এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে।

পাশাপাশি দুটো ঘরে আমার আর রামসুমেরের বাস। পুরনো বাগানের বড় বড় নিষ্ফল গাছ মাথার ওপর ছত্র ধরে আছে। এ দুটো ঘর আগাগোড়া রামসুমেরের হাতে তৈরী। কাদম্বিনী লজে পুরোনো ইটের অভাব ছিল না। কাঁচা মাটি দিয়ে সেই ইট গেথে গেথে, ওপরে বাঁশের মাচার ওপর পুরোনো টালির ছাত করে এই ইমারত খাড়া করেছে রামসুমের।

রামসুমেরের ঘরের মধ্যে রামসুমের থাকে। ছাগল থাকে গুটি সাতেক, পাঁচটা হাঁস, আর একপাল পায়রা। যখন নতুন ছিল ঘরদুটো আমি আর রামসুমের সমতলে থাকতাম। এখন রামসুমের উচ্চস্তরে থাকে। আমার চেয়ে ফুটখানেক

ওপরে। সঠিক মাপ করা নেই আমার। অনুমান করছি, প্রায় ফুটখানেকই হবে। আমার ঘরের দেয়ালে যে ফুটোটা রেখেছি রামসুমেরের ঘরের মেঝে থেকে তার উচ্চতা ফুট তিনেক। দত্ত পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার ঘরের আশ্রিতের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে তার ঘরের মেঝের এই উর্দ্ধগতি ক্রমেই দ্রুততর হবে। তবু আন্দাজ করছি, এখনো তিন সাততে একুশবছর এই ছিদ্রপথে রামসুমেরের পশুসঙ্গ দেখতে পাব।

আমি রামসুমেরের ঘরে ঢুকিনা। ছাগলগুলোকে ঘেন্না লাগে আমার। হাঁসগুলো সারাঘর নোংরা করে রাখে। পায়রাগুলো পাখার হাওয়ায় দুর্গন্ধ ঘুলিয়ে তোলে। আমার ঘরটা ওর মধ্যেই কিছুটা ছিমছাম। সাধ্যমত পরিষ্কার রাখে রামসুমের। এমন একটা পশুশালার পাশে সাতসাতটা বছর কাটিয়েও বাতিক যায়নি আমার। পায়রার ভয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে প্রাতঃকৃত্যে যাই।

আমাদের ঘরদুটোর সামনে একফালি করে বারান্দা বানিয়েছে রামসুমের। সেখানে বসে কাদম্বিনী লজের সারভে করে অবসর সময়ে। বাগানের নিষ্ফলা গাছগুলোকে অভিসম্পাত দেয়। আর বসে বসে হিসেব করে, বারো বারোং একশ চুয়াল্লিশ। তাবা বারোটা করে—।

দত্তসাহেবের ছেলেদের পড়াই আমি। ছাতের ওপর একটা পড়ার ঘর আছে। সেখানে গুটিকতক আগামী কালের মানুষ সেদিনের জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতিতে আমার কাছে সামরিক শিক্ষা পায়। এরা চাঁদ ধরতে যাবে না। রুটি ধরবে। চাঁদে আর রুটিতে আকারগত বৈষম্য এদের চোখে ধরা পড়েনা। সার কথা এই বুঝেছে, লক্ষ চাঁদে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত থাকুক, পেটে তিনখানা রুটি না পড়লে চোখের আঁধার ঘুচবে না।

পূর্বপুরুষ দত্ত সাহেবের জন্য যা রেখে গেছিলেন তার মধ্যে অস্থাবর কিছু ছিল। দত্তসাহেব পরপুরুষদের জন্য যা রেখে গেলেন, তা শুধুই স্থাবর। এই বিরাট কাদম্বিনী লজ, আর এই আম কাঁটাল পেয়ারা পরিকীর্ণ দত্তমালঞ্চ। আজ ন' বছর সাত মাস এগার দিন বরাদ্দ ছাগল দুধের বৃথাই হিসেব করে চলেছে রামসুমের। মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলে ছোটলোকের ছেলে পড়িয়ে যা পাচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছি আমি। দত্তসাহেবের ছেলেরা বড় হয়ে আমাদের দেখবে, এমন আশা হয়ত আমরা পোষণ করি। একথা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি আর রামসুমের

দুজনেই দত্তপরিবারের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছি। বাধা এতটুকু, আমরা দুজনেই স্বপাক খাই। এ সংস্কার এখনও ছাড়তে পারিনি।

ওরা মানুষ হবে। হয়ত হবে। আমরা ঘরের ফুটো দিয়ে উনিশ বছরের ফ্রকপরা সর্বাঙ্গ কুৎসিত অচুনের ধনুকের মত বাঁকা পা দুটো দেখতে পাচ্ছি। দুধ নিতে এসেছে অচুন। রামস্বমের ছাগল দুইছে। ত্রিশ বছরের ব্রহ্মচারী মানুষটার শরীরের পেশীতে পেশীতে লালসার লেহ্য পেয় সম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে। অচুনের লালসায় পঙ্কিল চোখদুটো দেখতে পাচ্ছি। রামস্বমের ঘুণাক্ষরেও জানেনা, উনিশ বছরের কুরূপা অচুন তার হাতে ওই দুগ্ধবতী ছাগলিটার নিপীড়ন যন্ত্রণা উপভোগ করছে। জানতে পারলে লজ্জায় মরে যাবে রামস্বমের। ছানিপড়া চোখে কি যে ভাব ফুটে উঠবে তার ধারণা করতে পারি না আমি।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে রামস্বমের, আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনার মত পঞ্চাশবছর বয়স কবে হবে আমার বলুনতো ? নিশ্চিন্দ হই তাহলে। নিজের সম্বন্ধে আপনার কি ভাবনা বলুন ? সে বয়স ত' আপনি ছাড়িয়ে এসেছেন।

রামস্বমেরের বাড়ী গাজিয়াবাদের কাছে কোন গাঁয়ে। শুনি তার বাবাও নাকি দত্তসাহেবের মত মানুষ উৎপাদন করার কারখানা খুলে বসেছিল। জ্যেষ্ঠ রামস্বমেরের অল্প বয়সেই বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বিয়ের কথা শুনেই বাড়ী ছেড়ে উধাও হল' রামস্বমের।

আমায় বলল রামস্বমের, আপনিই বলুন মাস্টারমশাই। এই যে চোখটা আমার, কানা, এই নিয়ে বিয়ে করা চলে ? মেয়েটার কথা ভাবুন দেখি। সারাজীবন এই কানা চোখের অভিযোগ গোপন করে কাটিয়ে যেতে হবে বেচারাকে ! তাই হওয়া উচিত ?

রামস্বমের নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে কি বুঝেছে বলা দুষ্কর। ছানিপড়া চোখ ওদের সমাজে বিয়ের অন্তরায় হল এ কোন কথা নয়। আসলে ওর ওই সন্তানত্রাস। নিজের বাপকে দেখেছে, দত্তসাহেবকে দেখেছে, জানতে চাইলে নিমেষে আরোও গোটা কুড়ি উদাহরণ বাতলে দেবে। মাটির ঘরের বারান্দায় বসে ন্যাড়া মাথাটা অল্প অল্প নাড়ে। বাঁ হাতের চেটোটা মাথার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চালায়। ভুরু কুঁচকে মুখ বিকৃতি করে বলে, রাম রাম, রাম রাম, এমন যেন না হয়। গাছে একটা ফল ফলেনা, শুধুই মানুষ ফলছে। এ বাড়ীতে রামজীর কৃপা নেই, দুয়া নেই।

'ইউরেকা' কথাটা জানেনা রামসুমের। জানলে নিশ্চয় 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে ছুটে আসত। বিশ্বের জটিলতম সমস্যাটার অব্যর্থ সমাধান করে ফেলেছে এই উল্লাস নিয়ে লাফাতে লাফাতে আমার কাছে একদিন হাজির হল রামসুমের। আমায় বোঝাল তার ধারনা, পৃথিবীতে জনসংখ্যা আজও এমন কিছু ভয়ানক হ'য়ে দাঁড়ায়নি। এই নিয়েও চলতে পারে। যত আছে ততই থাক। তবে দেখতে হবে আর যেন না বাড়ে।

যাতে না বাড়ে তার উপায় কি?

উপায় এই ঠিক করেছে রামসুমের। একজোড়া নারী আর পুরুষ মাত্র দুটি সন্তান সৃষ্টি করতে পারবে। দুটি মানুষ দুটি মানুষকে রেখে গেল। ব্যাস! অর্থাৎ এরা দুজন অপর আর এক জোড়া নারী আর পুরুষের সৃষ্ট আর এক জোড়া মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সাকুল্যে আরও দুজোড়া মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে। দুয়ের বদলে দুই, চারের বদলে চার।

জনসংখ্যা রোধের সহজতম পন্থা রামসুমের উদ্ভাবিত এই সাবস্টিটিউশন থিওরিই পরে ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনা প্রচেষ্টার মূল ফরমূলা হয়ে দাঁড়ায়। গভীর খেদের বিষয়, বেচারা রামসুমেরকে এজন্য 'পদ্মভূষণ' ইত্যাদি কিছুই দেওয়া হয়নি। এইখানে সর্বজনের বিবেচনা হেতু, আমার প্রতিবাদ লিখিত রইল।

রামসুমেরের কোন ক্ষেদ নেই। সে শুধু বুঝেছে, এই দুই-এর বদলে দুই-এর সিস্টেমের সঙ্গে ভগবতকৃপায় মাঝে মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ, মড়ক, মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি আসতে থাকলে আর চিন্তার কারণ নেই। বিশ হাজার বছর পরেও নব কলেবর পেয়ে আমি আর রামসুমের দুজনেই দুটি দুটি করে মানুষ সৃষ্টি করে যাবার অধিকার পাব। দত্তসাহেবের—ভুলের ক্ষতিপূরণ করতে হবেনা। ভুট্টার দানার কিছু হয়ত উদ্বৃত্তই থেকে যাবে সেদিন।

ভোর চারটে নাগাদ উঠে পড়ে রামসুমের। জপতপ পুজো-আর্চ্চা নিয়ে থাকে ঘণ্টাখানেক। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে খসরুবাগের আখড়ায় চলে যায় কুস্তি লড়তে। সাইকেল আছে রামসুমেরের। সাইকেল নিয়ে যায়। আখড়া থেকে আপাদমস্তক মাটি মেখে দৌপদী ঘাট চলে যায়। গঙ্গা স্নান সেরে ফোঁটা তিলক কেটে মহাবীরজীকে ফুল চড়িয়ে বাড়ী ফেরে সাড়ে ছটা নাগাদ। তারপর আরম্ভ হয় তার পশুসেবা। এ পাড়ার পাঁচটা বাড়ীতে মালির কাজ করে সারাদিন। দত্ত-

মালঞ্চের পরিচর্যাটা ফালতু। অবৈতনিক। সন্ধ্যার পর আমি যখন পড়াতে থাকি, সে তুলসীদাসের রামচরিতমানস পড়ে পঞ্চসঙ্গের মধ্যে। আমি ফিরে এসে রান্না করতে বসি। রামসুমের রাত্রে রান্না করেনা। ছাতু কিংবা বজরা ভাজা খেয়ে থাকে। আলু পোড়া টম্যাটো পোড়া এইসবও খায় মাঝে মাঝে। ভালমন্দ, কিছু রাঁধলে আমিও ভাগ দি। বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও প্রত্যাখ্যান করেনা রামসুমের। আহার পর্ব চুকে যাবার পর রাত নটা থেকে সাড়ে নটা অব্দি তার সাহচর্য পাই।

এই সময় প্রায় নিয়মিত ভাবে রামসুমের আমার কাছে বসে বর্তমান বিশ্বের সেরা সমস্যাটা সমাধান করে ফেলায় তৎপর হয়ে ওঠে। সমস্যা তার বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা। শুধু তাই নয়, সেই জনসংখ্যা নিরোধ করার সঙ্গে জড়িত আরও জটিলতর সমস্যা নিয়েও গয়লা তার মাথা ঘামায়।

রামসুমেরের ঘোর প্রতিবাদ পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান রূপরেখার বিরুদ্ধে। আমাকে যা বোঝায় তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায়, জনসংখ্যা নিরোধের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া উচিত তার মত মহামূর্খদের আজীবন ব্রহ্মচর্য বা তারই বিকল্প প্রকৃতি-বিরুদ্ধ একটা কোন পন্থা বাধ্যতামূলক করা, ততখানিই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া আমা হেন পণ্ডিতপ্রবর দ্বারা বহু সন্তান প্রজজন। তার ধারণা, জাতির ওপর জন্মনিয়ন্ত্রণ বিপ্লবের আশুফল বিপর্যয়কারী। কেননা এই চেতনা অতিদ্রুত কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার পেয়ে অনিবার্যভাবে দেশের মানুষের গড় মান নিকৃষ্ট করে তুলবে।

রামসুমেরের এই সব তত্ত্বকথা শুনে আমি বিপুল উৎসাহে তাকে বাহবা দি। কোনো এক বড়সাহেবের বাড়ীর ড্রাইভারের কাছে ধার করে দৈনিক হিন্দী সমাচার পত্রখানি আদ্যপান্ত পাঠ করে রামসুমের। আর মাতৃভূমির অন্ধকার ভবিষ্যত চিন্তা করে সদাই উদ্বিগ্ন থাকে।

আমাকে বলে, আপনিই ভাবুন মাস্টারমশাই, আমার যে কটা ছাগল আছে, হাঁস, পায়রা, দত্তবাড়ীর ছেলেদের তা কদিনের খাদ্য? সংখ্যাটা যদি উল্টো হত। ছাগল বেশী আর মানুষ কম। পাঁঠা তো আর মানুষ খায়না। সমস্যাটা তাদের নয়। খাদ্য তো আমাদেরই বেশী চাই। নয়কি?

কে বোঝায় রামসুমেরকে! বলি, পাঁঠা ত' বাপু সংখ্যায় কিছু কম নেই। তবে কিনা, সব শ্রেণী এখনও খাদ্যের তালিকাভুক্ত হয়নি। লোকে তাই খায়না।

খাবে, একদিন খাবে। সেদিনের দুঃস্বপ্ন দুপুর রোদে তুমিতো বাপু হামেশাই দেখছ।

ঘরের ফুটো দিয়ে দেখতে পাই আমার নাবালক ছাত্র কটিকে নিয়ে গল্প জুড়েছে রামসুমের। বাচ্চাকটা ঘিরে বসেছে তাকে। ওরই মধ্যে নানান ধরনের খেলা হচ্ছে। হয়ত বা একটা গামছার পুঁটুলী খুলল রামসুমের। বাচ্চা কটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তাদের ছোট ছোট মুঠিতে রামসুমের ভুট্টার দানা ভাজা ভরে দিল। বাচ্চা অনেক কটি। হয়ত ঠিক আন্দাজ মত ভাগ হয়নি। শেষেরটির হাতে পড়ল মাত্র দু-চার দানা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে বলল রামসুমের, কি করি বল? লাওয়া ত' কম ছিলনা, তোরা যে বেশী। যদি একলা আসতিস্, সবটুকু পেতিস্। চোখে জল এসে গেছে ততক্ষণে, আবেগে বেসামাল, বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমাকে বলে, জানেন মাস্টারমশাই, ইচ্ছে হয় এই দুনিয়ার তামাম বাচ্চাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাই আমি। এমন কোথাও রেখে আসি যেখানে তাদের মাথাপিছু একটা করে কামধেনু বরাদ্দ আছে। কেন ওরা যা চাইবে তা পাবেনা। বলুন! কি চায় ওরা? চাঁদ চায়? না, চাঁদ চায় না, রুটি চায়। আর আমরা ভাবুন, এতই অক্ষম রুটিও যোগাতে পারিনা। নিত্য নতুন সংযোজন হয়েই যাচ্ছে। মুঠো মুঠো ফুল পাপড়ি ফোটার আগেই শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কবে আমাদের আক্কেল হবে বলুনতো? আমি ত' মুখ্যু, আপনিই বলুন? বিয়ে করিনি দুজনে, লোকে সাত রকম কথা বলে। বলে ব্যাভিচারী। পাপী। আর এই যে পুণ্যাত্মার দল, কচি কচি বাচ্চাগুলোকে শুকিয়ে মারছে, বৈকুণ্ঠধামে আঁটবে সবাই।

দত্তসাহেবের শেষ সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হল যেদিন, তার চারদিন আগে রামসুমেরের ঘরে চারটে ছাগলছানা জন্মেছে। বাচ্চাটা যেদিন জন্মাল, ঘরের ফুটো দিয়ে রামসুমেরের পাগলাম দেখেছিলাম। চারটে ছাগল শিশুকে বুকে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে তাতাথৈ নাচ জুড়েছে। প্রলাপ বকছে, এমনি যেন হয়রে, এমনি যেন হয়। ওদের একটার বদলে তোরা চারটে। ওরা যে অনেকরে, না হলে কুলুবে কি করে? খাবে কি ওরা?

রামসুমেরের ন্যাড়া মাথায় সবসময় এক চিন্তা ঘুরছে। মানুষ কমিয়ে কিভাবে ছাগল বাড়ান যায়। পরিমিত মানুষ, আর তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির অপরিমিত সংস্থান। এই রকম একটা রাম রাজত্বের স্বপ্ন দেখে সে।

আমি স্বপ্ন দেখিনা। বাড়ীতে আর মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলে ছাত্র পড়িয়ে ধৈর্যের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে বই নিয়ে কাটাই। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য আমি। সেখানে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথির মধ্যে বিশ্বের তাবৎ সমস্যা ভুলে থাকার চমৎকার সংস্থান আছে। বলা বাহুল্য, আমার এই পলায়নী বৃত্তি রামসুমেরের মোটেই সমর্থন করে না।

আমার আর রামসুমেরের মধ্যে মিল এই, আমরা দুজনেই অকৃতদার, নিঃসন্তান। আর দশটা মানুষের মত আহার নিদ্রা মৈথুনের স্বাভাবিক জীবন কেন ত্যাগ করেছি, একথা রামসুমেরকে কোনদিন জানান হয়নি। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। দত্তমালঞ্চের এককোণে আমার এই আত্মকেন্দ্রিক জীবন সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে। মৃত্যুর স্থিরতা নেই। যে কথা কাউকে বলতে পারিনি এইখানে লিখে যাব।

কৈশোর ছেড়ে তারুণ্যে পা দিয়েছি তখন। জীবনের সেই বেপরোয়া দিনগুলোয় একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একটি বাঙালী মেয়ে। তারপর একদিন সে মারা যায়। আত্মহত্যা করে। গায়ে মাথায় কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে নেয়।

সে আগুন আজও জ্বলছে। আর কারুর গায়ে তার আঁচ না লাগুক, আজ দীর্ঘ ত্রিশ বছর সেই চেষ্টাই করে এসেছি। হুতাশনের সম্পূর্ণ তাপটুকু একা উপভোগ করতে চাই।

দত্তসাহেবের শেষ সন্তানটি মারা গেল। মাত্র দুটি মাস এই পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করতে পেরেছিল সে।

বাচ্চাটার ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল। শেষ কটা দিন রামসুমেরের কি উদ্বেগে কেটেছে আমি তা দেখেছি। আহার নিদ্রা ভুলে গেছিল রামসুমের। বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব করেছিল। ডাক্তার-বদ্যি ওষুধপত্তর সব দায়ই যেন তার একার। বিশ জায়গায় মানত করেছে। রামচরিতমানস পড়েছে রাত জেগে। কুস্তি লড়েনি, পশুসেবা বন্ধ রেখেছে, চাকরীতেও যায়নি।

তবু বাঁচলনা বাচ্চাটা। একতিল বায়ু টেনে দুমাসের শিশুর শ্বাস নেবার সেই আপ্রাণ চেষ্টা শয়তানেও দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না। আমি দেখেছিলাম। রামসুমের নিজের ঘরে ঢুকে বসেছিল শেষ দিকটায়।

দেয়ালের ফুটো দিয়ে রামস্থমেরের পাগলাম দেখছিলাম সেদিন আমি। চেনাজানা মানুষটাকে মূর্তিমান বিস্ময় বলে মনে হল।

ছাগলের বাচ্চাকটাকে বুকে চেপে পাগলের মত হাসি জুড়ে দিয়েছে রামস্থমের। অদ্ভুত হাসি। কোন শব্দ নেই। মনে হচ্ছিল প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়া খুনী যেন পৃথিবীর নজর বাঁচিয়ে উল্লাস করছে। দেয়ালের ফুটোয় চোখ রেখে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলাম। রামস্থমের সম্বন্ধে আমার সব ধারণা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছিল।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। বর্ষার প্রারম্ভ। বছরের প্রথম কয়েকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশভরা মেঘ ছিল। দুরন্ত হাওয়া বইছিল।

আমাদের শবযাত্রা বেরোল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দলের মধ্যে ছিলাম আমি, রামস্থমের। দত্তসাহেবের তিন বড়ছেলে। অজু, কিচলু আর জিতু। ওদের একটি বন্ধু, আর প্রতিবেশীদের জনাচারেক।

দুমাসের বাচ্চাটাকে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মুড়ে দুহাতের ওপর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে রামস্থমের। দলের সবচেয়ে আগে ছিল সে। আমাদের যেতে হবে অনেকদূর। দ্বারাগঞ্জের ঘাটে।

রামস্থমেরের চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছিল।

দলের শেষে হাঁটতে হাঁটতে রামস্থমেরকে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম আমি। এ অশ্রু কিসের? কিছুক্ষণ আগে ঘরের মধ্যে ওর যে রূপটা প্রত্যক্ষ করেছি তার পাশাপাশি এ অশ্রুর অর্থবোধ হচ্ছিল না। রামস্থমের কি সত্যিই কাঁদছে?

বহুদূর এসে একসময় হঠাৎ আমার মনে হল, রামস্থমের হয়ত আনন্দে কাঁদছে। আজকের এই শিশুমৃত্যু বিচিত্র এক আনন্দের সন্ধান দিয়েছে তাকে। চুপ করে হাঁটতে হাঁটতে এই নতুন চিন্তা আমার মনে আনন্দে বেদনায় সমতুল্য এক মিশ্রভাব সৃষ্টি করল। রামস্থমেরের মনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করলাম আমি।

একটি অমৃতের সন্তান এই দুনিয়ার অসার্থক তিতিক্ষার ঊর্দ্ধে সেই অমৃতের দেশে মহাপ্রয়াণ করেছে! সেখানে তার যোগ্য স্থান নির্ধারিত আছে। একটি কামধেনু বরাদ্দ আছে। প্রেমসিন্ধুর এককণা পরিমাণে সেখানে সে সিক্ত হবে। সঞ্জীবিত হবে। আমাদের এই যুগযন্ত্রণার সব অশুচিস্পর্শের বাইরে বিক্ষোভ বিহীন এক নতুন জীবনের সন্ধান পাবে। ধন্য হবে। সার্থক হবে।

তাই এত আনন্দ। রামস্থমেরের পোড়া চোখে তাই এই জোয়ারের উচ্ছ্বাস। আমরা যখন ঘাটে পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। শুক্লপক্ষের রাত। মেঘে মেঘে অন্ধকার আকাশ। দুরন্ত হাওয়া বইছে। গঙ্গার ধারা এ বছর পিছিয়ে প্রায় ঝুঁসির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আমাদের সামনে প্রায় মাইলখানেকের চড়া পড়ে রয়েছে। বালির ওপর গত বছরের পলিমাটির আবরণ। তার ওপর এ বছরের নতুন বৃষ্টি। বড় খারাপ পথ। আমাদের সঙ্গে পেট্রোম্যাক্স ছিল না। বড় একটা টর্চ ছিল একজনের হাতে। একটা লণ্ঠন ছিল। ব্রিজের পাশ দিয়ে কাঁচা পথ চলে গেছে দাহস্থান পর্যন্ত। টর্চটার জোরাল আলোয় সুবিধে হচ্ছিল। আমরা কজন একত্র হয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছিলাম।

শ্মশানে পৌঁছে দেখলাম অন্য একটা মড়া সদ্য এনে নাবান হয়েছে। মৃতের বয়স হয়ে থাকবে। শবযাত্রার মধ্যে আড়ম্বর ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল স্থানীয় কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেটের দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মৃত বাপের শব। বাঙালী। বাঙালী হিন্দুস্থানী মিলিয়ে শবযাত্রী এসেছে একপাল। ছেলে ছোকরার দলই বেশী। ওব মধ্যেই হৈ হট্টোগোল বাধিয়ে তুলেছে। সবাইকে বেশ উৎফুল্ল মনে হ'ল। দুটো পেট্রোম্যাক্স ছিল ওদের সঙ্গে। প্রবীণদের জনা কয় মড়াটাকে চিতায় তোলার ব্যবস্থা করছেন।

আমাদের কাজ সামান্যই। দুহাত বালি খুঁড়ে বাচ্চাটাকে পুঁতে দেয়া। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুর্ভাবনা ছিলনা কিছু। দলেব সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জলের ধারে পৌঁছে সবাই এলিয়ে পড়ল। বামস্থমের আমায় বলল, মিথ্যে দেরী করে কি লাভ? দেখুন না, সবাই কেমন ঢিলে হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেই তো ভাল হত।

আমরা কয়েকজন আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম। রামস্থমের বাচ্চাটাকে ভিজে বালির ওপর শুইয়ে দিল। কয়েকঘণ্টা আগে ওকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা হয়েছে। এখন যেন আর তা মনে নেই রামস্থমেরের। আমরা যারা দাঁড়িয়ে দেখলাম তারাও কোন আপত্তি করলাম না। রামস্থমের বালি খুঁড়তে আরম্ভ কবল। লণ্ঠনটা ছিল আমাদের কাছে। টর্চটা যাঁর, চেনা লোকের সন্ধান পেয়ে তিনি তখন অন্য দলটায় ভিড়েছেন। তেল ফুরিয়ে এসেছিল বলে ভালো আলো হচ্ছিলনা লণ্ঠনটায়। আমাদের কাছ পর্যন্ত পেট্রোমাক্সের আলো নামমাত্রই এসে পৌঁছেছিল।

প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে বালি খুঁড়ছিল রামস্নুমের। হাতখানেক গভীর খোঁড়া হয়ে গেছে। ভিজে বালির ছোটখাট স্তূপ জমা হয়েছে গর্তটার চারপাশে।

এমনি সময়, হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে 'হায় রাম' বলে লাফিয়ে উঠল রামস্নুমের। ছিটকে দুপা পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল ভিজে বালির ওপর। আবছা আলোয় যতটুকু বোঝা গেল চোখমুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে তার।

বালির মধ্যে কি এমন বিভীষিকা থাকতে পারে দেখবার জন্য আমরাও সবাই ঝুঁকে পড়লাম। কৌতূহলের চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল। লণ্ঠনটা নাবান হল গর্তের ভেতর। যা দেখা গেল তাতে যুগপৎ ভয় আর বিস্ময়-এ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম সবাই।

এই দুনিয়ার বাচ্চাগুলোও খনিজ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুহাত মাটি খুঁড়লেই বাচ্চা পাওয়া যায়। সেই বাচ্চাই পেয়েছে রামস্নুমের। গর্তের মধ্যে থেকে খুড়ে বার করেছে আর একটা কচিমাথা। সম্পূর্ণ অবিকৃত। বুঝি সেই দিনই পুঁতে রেখে গেছে কেউ।

গর্তের মধ্যে লণ্ঠনটা নাবিয়ে রাখা হয়েছিল। তেল না থাকায় আলো হচ্ছে সামান্য। সেই আলো পড়েছে বাচ্চাটার বালিমাখা মাথায়। গর্তের চারপাশে আমরা কজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নীচের থেকে আলো পড়ছে আমাদের মুখে। দৃশ্যটা অস্বাভাবিক। সেই ম্লান আলোয় আমাদের সবাইকার মুখেই অপরাধীর ভাব ফুটে উঠেছে। অথচ জ্ঞানতঃ আমরা কেউই কোন অপরাধ করিনি। বাচ্চাটার মহানিদ্রায় এই যে ব্যাঘাত ঘটল, কিংবা বলা চলে, কাঁচা ঘুমে এই যে বিঘ্ন ঘটালাম তার, এ যথার্থই যোগাযোগ। আমরা দায়ী নই। এ যুক্তি হল ঠিকই, তবু সান্ত্বনা হলনা। সান্ত্বনা ছিল না বলেই আমরা ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম নির্বাক হয়ে।

রামস্নুমের নিজেই একসময় উঠে বসল। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আর একবার 'হায় রাম' বলল। তারপর বালি চাপা দিতে আরম্ভ করল।

পাশে আবার নতুন করে বালি খোঁড়া হল। দত্তসাহেবের শেষ সন্তানকে কবরস্থ করলাম আমরা।

আমাদের দায় সারা হ'ল। ভিজে বালির ওপর কয়েক হাতের ব্যবধানে

দুটি শিশুর সমাধি রচিত হল। শেয়াল কুকুরের নাগালের বাইরে ধরিত্রীর আশ্রয় পেল তারা।

এবার ফেরার পালা। উৎসাহ নেই কারুর মধ্যে। আমরা দেহে মনে পরিশ্রান্ত। গুটিগুটি পেট্রোম্যাক্সের আলোর এলাকায় ফিরে এলাম। ভিজে বালির ওপর একে একে বসে পড়লাম সবাই। অন্য দলেরও অনেকে বসে রয়েছেন চারপাশে। চিতাটা ততক্ষণে পূর্ণতেজে জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

সবাই চুপচাপ। অবসন্ন গোছের। কিছুটা বা শ্মশান বৈরাগ্যের প্রভাব আছে। ভেবে দেখলাম, আজ যে দুটি প্রাণ লোকান্তরিত হ'ল, তার একটি শিশু, অন্যটি বৃদ্ধ। একটিকে পোঁতা হয়েছে, অন্যটি পুড়ছে। রামসুমেরের বাসনা ওই চিতার আগুনে ঘৃতে, সমিধে, সমৃদ্ধ হ'য়ে টগ্‌বগিয়ে ফুটছে। আমরা সুস্থ সবল যারা চারধার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছি, এই অক্ষম দুটিকে বয়ে এনেছি। অভিনব কিছু নয়, বিবর্জনের এ বিধি অনাদি ইতিহাসের পরম্পরাগত ধারা মেনে এসেছে। রামসুমের চায়, বয়ে আনার ক্ষমতা যারা রাখে তারাই থাক, ক্ষমতা যারা অর্জন করে নেবে তারাও স্বাগত, তবে সম্ভাবনা যাদের ফুরিয়ে গেছে অবসর নিক তারা।

ভিজে বালির ওপর বসে রয়েছে রামসুমের। কনুই দুটো হাঁটুর ওপর। দুহাতের চেটোয় মাথাটা ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে চিতাটার দিকে। চিতার আলোয় তাকে দেখছিলাম। ক্লান্ত মুখের মধ্যে রামসুমেরের চোখদুটো জ্বলছিল। সে চোখে চাপা উল্লাস প্রচ্ছন্ন ছিল। ওই যে ওখানে এই বিশ্বসংসার থেকে বাতিল মানুষটার অস্তিত্বটুকু লোপ পেয়ে যাচ্ছে তিল তিল করে, আমাদের মধ্যে আর একটা সক্ষম প্রাণ সংযোজনের সুরাহা করে যাচ্ছে—এই সত্যই রামসুমেরের এই উল্লাসের উপজীব্য। শ্মশানে এই পরিবেশের মধ্যেও রামসুমের তার আদর্শকে লালন করছে।

আমিও বসেছিলাম। রামসুমেরকে বিরক্ত করবনা। ওদের দলের ছেলেছোকরাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। বেশ আছে ওরা। আনন্দে আছে। এই শ্মশানের বাইরে এ যুগের অঙ্গীকৃত জীবনে দুঃখের সঙ্গে নিত্য সহচর্য আমাদের। এখানে মৃত্যুর মন্দিরে এসে দেখছি আনন্দের অভিনব রূপ উদ্ভাবন করেছে ওরা। রামসুমের আমার চেনা মানুষ। তাকে বুঝেছিলাম। ওরা আমায় অবাক করেছিল।

ওদের একদল গামছা হাতে জলে নেবে পড়েছে। সামনে কিছুদূরে মোটে একহাঁটু জল। তার মধ্যে গামছায় ছেঁকে মাছ ধরছে ওরা। প্রতিবারই একটি দুটি মাছ উঠছে। মাছের মাপ যত ছোট হওয়া সম্ভব তত ছোট। গামছার মধ্যে তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাচ্ছে। পাল্লা দিয়ে ছেলের দল লাফাচ্ছে হাঁটু জলে। গামছার মধ্যে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে কুচো মাছ। সেগুলো ধরে ধরে পেট্রোম্যাক্সের ওপর এনে পোড়ান হচ্ছে। দুচারজন দুঃসাহসী চোখমুখ বিকৃত করে চর্বন করছে সেগুলোকে। হৈহুল্লোড়ের মাত্রাটা এই থেকে অনুমান করা চলে।

জনাসাতেকের আর একটা দল অন্য পেট্রোম্যাক্সটা নিয়ে খানিকটা দূরে চলে গেছে। ওরা একটু নিরিবিলি চায়। আসার সময় দেখে এসেছি, তাসের জুয়া চলছে ওখানে। ওদের হুল্লোড় তাই চাপা গোছের। বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে সবাই। যতটা সম্ভব গোপন করে একটা বোতল এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যাচ্ছে।

দলের প্রবীণরা আমাদের চারপাশে বসে আছেন। ছেলেছোকরাদের কারবারে ভ্রূক্ষেপ নেই ওঁদের। নীচু স্বরে বিশ রকম আলোচনা চলছে। শ্মশান যাত্রার প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের কজন কে কোন দিকে আছে খোঁজ নেই। বোঝা যাচ্ছে দুটো দলই একসঙ্গে বাঁধ পর্যন্ত ফিরবে। রাত হবে। দেড়টা দুটো বেজে যাবে।

লম্বা একটা বাঁশ দিয়ে চিতাটা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল পাণ্ডা। চিতাটা আরও উজ্জ্বল হল।

অলস দৃষ্টিতে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছিলাম। গঙ্গার জলে চিতার আলো পড়েছে। ওপারে ঝুঁসির গ্রাম অন্ধকারের গর্ভে। চিতার আলো পড়েছে পাশে রেলওয়ে ব্রীজের গায়ে। ইঁটের থামগুলোর গায়ে। পেট্রোম্যাক্সের আলো মিশে আছে তাতে, তবে চিতার আলোর মত চঞ্চল নয় বলে বোঝা যাচ্ছে না। দূরে দূরে একটা-দুটো আলো দেখা যাচ্ছে। মেঘে ঢাকা শুক্লপক্ষের আকাশ এই বিরাট বালুচরের ওপর আলোর অস্বচ্ছ অবগুণ্ঠন ছড়িয়েছে। আমরা কটি শ্মশানযাত্রী দুটো পেট্রোম্যাক্স আব একটা চিতার আলোর সম্বল নিয়ে এই প্রদোষের পারাবারে ভেসে রয়েছি। রক্তে যাদের জোয়ারের উচ্ছ্বাস এরমধ্যেই আনন্দের স্বাদ খুঁজছে তারা। আমরা পঞ্চাশঊর্দ্ধে জনাকয় শ্মশান বৈরাগ্যের

প্রভাবে পড়েছি। রামস্নুমের সবাইকার মাঝে আত্মস্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখেছে।

দূর থেকে একটা লোক আসছিল। ব্রীজের ওপাশ থেকে এপাশে এল। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। দূর থেকেই ওর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল ওর আসার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই। পরনে গেরুয়া বেশ। একটা মূল আলখাল্লার সঙ্গে প্রচুর ফালতু কাপড় চাপিয়েছে দেহে। জটা রুদ্রাক্ষ বিভূতি ইত্যাদি আনুসঙ্গিক যা কিছু ছিল আর কিছুটা এগিয়ে আসতে বোঝা গেল। একসময় এসে পড়ল আমাদের মাঝখানে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে আলোকের মাঝে আবির্ভাব হল তাঁর।

দেখলাম খর্বকায় ক্ষীণজীবি গোছের একটা বাউল। গেরুয়া জটা রুদ্রাক্ষে একটি পরিপূর্ণ সাধুজী মহারাজ। সাধুজীর বয়স হয়ে থাকলেও দাড়ি গোঁফ নেই বললেই চলে! চোখমুখের হাবভাব একেবারে নির্লিপ্ত। কারুর দিকে ফিরেও তাকালনা। আমাদের পাশ দিয়ে চিতাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুহাত পেছনে করে খানিকক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। পাণ্ডার সঙ্গে কি দুএকটা কথা বলল বোঝা গেল না। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলে চলল। রামস্নুমের স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

অপর দলের একজন আমায় লোকটার পরিচয় দিলেন। বললেন, ব্যাটা পাগল। জাতে উড়ে। কোথা থেকে এখানে এসেছে বলা যায়না। হিন্দী শিখেছে সামান্য। অনেকের সন্দেহ পুলিশের গোয়েন্দা বলে। এখানে এনে যাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়, তারা ঠিক কায়দা মত মরেছে কিনা, আর নয় মোটে মরেছে কিনা তারই খোঁজ রাখে। গুণের মধ্যে এই, হিন্দী ভাষার গালিগালাজ এ বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই যে বিড়বিড় করছে, কান পেতে শুনুন, ও শুধু অশ্লীল গালিগালাজ। কেন দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে, তা ও জানেনা। স্বভাব একটা। তবে লোকটা সম্পূর্ণ একা, ত্রিভুবনে ওর কেউ কোত্থাও নেই। ঘর ছাড়া বিবাগী মানুষের যা হওয়া স্বাভাবিক সেই দশা ওর।

চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে গালাগাল বকছে লোকটা। তার কোন লক্ষ্য নেই। বিশ্বসংসারের প্রতি অন্তরভরা বিদ্বেষ পোষণ করে রেখেছে। অনর্গল উদ্গার করছে সেই গরল। চিতার সামনে থেকে সরে গেল। লক্ষ্যহীন

ভাবে এদিক ওদিক ঘুরল কিছুক্ষণ। ভয়ানক গম্ভীর ভাবে পেট্রোম্যাক্সে মাছ পোড়ান দেখল। গাল বকল, কুচোমাছের মা-বোনের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক পাতিয়ে আবার এসে দাঁড়াল চিতার সামনে। মুখ বন্ধ ছিল। পাণ্ডা চিতার সঙ্গে পাগলাকেও একটু খোঁচালো কথাটি না বলে পাগলা সরে এল। তারপর এলোমেলো ভাবে হাঁটতে হাঁটতে তাসের আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হল।

জুয়াড়ীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানাল পাগলা সাধুকে। ওরা আমোদ করতে চায়। ভাল উপায় জুটেছে। সাধুজী দলের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসলেন।

এখান থেকে ওদের আলাপ আলোচনা পরিষ্কার বোঝা যাবার কথা নয়। দেখলাম সাধুজীকে তিনটে তাস ছাড়াও একটা বিড়ি দিয়েছে ওরা। মনে হল দেশলাই দিতে চাইছে না। বলছে উঠে গিয়ে চিতা থেকে ধরিয়ে আনতে। সাধুজী তাতে রাজী নয়। পাণ্ডা নাকি তাকে গাল দেবে। হয় তাকে দেশলাই দেওয়া হোক আর নয় পেট্রোম্যাক্সে ধরিয়ে নিতে দেওয়া হোক। ছেলেগুলো বজ্জাতি আরম্ভ করেছে। এতক্ষণ যারা তামাকের ধোঁয়ায় আর একটা চিতার ভ্রম জাগাচ্ছিল, দেশলাই নাকি তাদের নেই। পেট্রোম্যাক্সে ধরাতে দেবেনা, সেটার নাকি কল খারাপ হয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে অস্বাস্থ্যকর একটা কিছু দানা বেঁধে উঠেছে ওখানে। মাছধরা ছেলেগুলোও একটি দুটি করে জুয়ার আড্ডার দিকেই এগোচ্ছিল।

দত্তসাহেবের কথা মনে পড়ল। সাতমাস আগে পর্যন্ত আমাদের হিন্দীভাষার একটা অঙ্গকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস বা কবীরদাসের দোঁহা নয়, হিন্দীর অশ্লীল শব্দের সম্ভার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যও ছিল গভীর। আমার ধারণা হিন্দীর এই একটি অংশ তিনি বিশেষ নিষ্ঠায় অধ্যয়ন করেছিলেন। হিন্দী ভাষাকে হিন্দীতেই গাল দিতেন তিনি। তাঁর বাঙলা শব্দকোষ থেকে হিন্দীকে গাল দেবার যথেষ্ট লাগসই শব্দ খুঁজে পেতেন না।

উড়ে পাগলা প্রমাণ করলে হিন্দী সে জানুক বা না জানুক, হিন্দীর গালাগাল সে দত্তসাহেবের দশগুণ নিষ্ঠায় রপ্ত করেছে।

বিড়ি ধরান নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত। তাই একসময় শাখাপ্রশাখা মেলে মহীরুহের আকার নিল। ছেলেরা দল বেঁধে শ্মশানে এসেছে। আমোদ করা উদ্দেশ্য এদের। পেয়েছে এক পাগলা সাধুকে। জাতে সে আবার উড়ে।

গাল শিখেছে হিন্দীর। শ্মশান ঘাটায় প্রমোদের এর চেয়ে বড় আয়োজন আর কি হতে পারে ?

আরম্ভের দৃশ্যটুকু আমরাও বসে উপভোগ করছিলাম। উড়ে চায় পেট্রোম্যাক্সে বিড়ি ধরাতে। ছেলেদের মধ্যে একজন সেটাকে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। দুজনেই উর্দ্ধবাহু হয়ে এগোচ্ছে পিছুচ্ছে। উড়ে ধরাবেই বিড়ি, ছেলেরা ধরাতে দেবে না। ওদের দুজনকে ঘিরে বাকী সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ জুড়ে দিয়েছে। উড়ের রাগ বাড়ছে। মুখের গরল ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হিন্দীর গালাগাল। উচ্চারণ উৎকলের। এর চেয়ে মজার আর কি হতে পারে ? দেখতে দেখতে শ্মশানের মধ্যে প্রমোদ বিলাসী ছেলেগুলো পাগলাকে ঘিরে উদ্বাহু নিত্য জুড়ে দিলে।

মাছ ধরা ছেলেগুলোও ছুট লাগিয়েছে। জল ছেড়ে উঠে পড়েছে একে একে সব। ছুটতে তাদের দিকে। পাড়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল একজন। চোখে বালি গিয়ে থাকবে। কানামাছির মত দুহাত বাড়িয়ে দুপা এগোতেই সোজা গিয়ে পড়ল পেট্রোম্যাক্সের ওপর। গড়িয়ে পড়ল সেটা। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছেলেটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্ধের মত ছুটে চলে গেল।

উড়ের রাগ ততক্ষণে সপ্তমে চড়েছে। গালাগালের ভাণ্ডার লুটিয়ে দিচ্ছে। ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে সবাই তাকে কেন্দ্র করে। তুমুল হৈ হট্টোগোল আরম্ভ হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

রামস্বমেরের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম আমি, বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে। হাতের থাবাদুটো সামনে। মুখের একপাশ থেকে চিতার আলো পড়ছে। অনেকটা শিকারী চিতাবাঘের মতো দেখাচ্ছে তাকে। এখুনি যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনি দুটো ক্রুর চোখ। রাগে ফুলছে রামস্বমের। সারা শরীরটা পাথরের মত। নড়ছেনা এতটুকু। এইভাবে চেয়ে আছে ছেলেগুলোর দিকে।

ওদিকে ততক্ষণে মারামারি হয়ে গেছে। পাগলাটা অর্ধেক হিন্দী, অর্ধেক উড়িয়ায় দুর্বোধ্য কতকি অনর্গল বকে যাচ্ছে। পেছন থেকে একআধটা করে চড়-চাপড় পড়তে আরম্ভ করেছে। রাগে হিংসায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিড়বিড় করছে পাগলাটা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে দলের একটা কাউকে লক্ষ্য করে। সে তখন পালাচ্ছে।

গেরুয়া আলখাল্লা জটা রুদ্রাক্ষে মোড়া ক্ষীণ খর্বকায় মানুষটা প্রতিহিংসায় পাগল প্রেতের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। এক এক বার দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। আবার ফিরে আসছে। উঠে ধরলে একসময় পেট্রোম্যাক্সবাহী ছেলেটাকে। জামা ধরে ঝুলে পড়ল। পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়ল দুজনের মুখেই। ছেলেটার মুখে ত্রাস। হিংসায় উন্মাদ সাধুজীর মুখ থেকে যেন দুসারি করাতের মত ঝক্‌ঝকে দাঁত বেরিয়ে এল হঠাৎ। শিউরে উঠলাম। ছেলেটার মুখটা কামড়ে ধরে ঝুলে পড়ল হঠাৎ পাগলাটা। পেট্রোম্যাক্সশুদ্ধ জড়াজড়ি করে ভিজে বালির ওপর গড়িয়ে পড়ল দুজনে। অন্য একজন বাতিটা খপ্ করে তুলে ধরল। বাতিটা বাঁচল। বাঁচলনা পাগলার আলখাল্লা। আগুন ধরেছে তার এককোণে। পাগলার সে খেয়াল নেই। মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার পেটে এক লাথি মারল। তারপর লক্ষ্যবিহীন ছুট দিল অন্ধকারের উদ্দেশ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেন একটা আলেয়া ছুটে যাচ্ছে। জ্বলন্ত আলখাল্লা নিয়ে পাগলাটা ছুটছে। ছেলেরা ছুটছে তার পেছনে। সামনে অন্ধকারের অন্তহীন গর্ভে ছুটে গেল সবাই। ছেলেদের দেখা যাচ্ছেনা। অন্ধকারে লুকোতে চায় পাগলা। জ্বলন্ত আলখাল্লায় সেই সব চাইতে প্রকাশমান।

পাগলাটাকে ধরতে পারলে জ্যান্ত পুঁতবে ওরা। না ধরতে পারলে পুড়ে মরবে পাগলা। উদ্বেগে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। একপা দুপা এগোচ্ছেন।

যে মুহূর্তে আমি রামস্থমেরের দিকে ফিরে তাকালাম, পাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। পাশবিক একটা শব্দ বেরোল তার মুখ দিয়ে। তার পরেই উধাও। ভাববার অবসর ছিল না। আমিও ছুটলাম রামস্থমেরের পেছনে।

ভিজে ভুসভুসে বালি। তার ওপর পলিমাটির পেছল। উঁচুনীচু বালুচর। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। ওভাবে ছুটে যাওয়া প্রায় অসাধ্য। আমার সে খেয়াল ছিল না। আমি ছুটছিলাম। রামস্থমের আমার নাগালের বাইরে না চলে যায়, এই পণ ছিল আমার। কয়েকবার পড়লাম ছুটতে ছুটতে। বালি কাদা মেখে একসময় ওদের মধ্যে গিয়ে পৌছলাম।

রামস্থমের আমার চেয়ে প্রায় একশ'গজ আগে। ছেলেগুলো ততক্ষণে চেপে ধরেছে পাগলাটাকে। বালির ওপর চিৎ করে ফেলেছে। আলখাল্লার আগুন নিভে গেছে বলে মনে হল। এলোপাথাড়ি প্রহার আরম্ভ হয়ে গেছে।

এতটুকু মানুষটাকে মেরে কাদা করবে ওরা। হিংসা আর মদে বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়েছে ওদের।

রামস্থমের সোজা ছুটে গিয়ে বুনো মোসের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। আমি জানি স্বাভাবিক অবস্থায় পাঁচটা জোয়ানের ক্ষমতা রাখে রামস্থমের। এখন ক্ষেপেছে। মোষের মত শরীর নিয়ে ওদের সবাইকে একসঙ্গে চটকে ফেলল রামস্থমের। আমি যখন কাছে গিয়ে পৌছলাম পাগলাটাকে ও বুকের তলায় চেপে উন্মত্তের মত কিলচড় লাথি ছুড়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলো ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারদিকে। উড়েটা ওই ফাঁকেই উঠে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করল। পালাবে কোথায়? রামস্থমের আবার কিছুদূর তাড়া করে ধরলে তাকে। বালির মধ্যে ফেলে নিজের আড়ালে করে নিল আবার।

ছেলেরা কেউ ছুটে আসেনি। আমিই ছুটে এসেছিলাম। রামস্থমেরের শরীরের চাপে উড়ে ওদিকে মরণাপন্ন। গোঁয়ারের সে খেয়াল টুকু নেই। কোথায় ছেলেগুলো তার ঠিক নেই। ওইভাবে উড়েকে চেপে এখনও লাথি ছুড়ছে। দমবন্ধ হয়ে মরবে এবার ক্ষীণখর্বকায় মানুষটা। এই উদ্বেগ নিয়েই ওদের অতকাছে গিয়ে পৌছেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল রামস্থমেরের চাপ থেকে উড়েকে বাঁচাব। তা আর হলনা।

রামস্থমেরের গোদা পায়ের এক মোক্ষম লাথি খেয়ে চার হাত দূরে ছিটকে পড়লাম আমি। লাথিটা লেগেছিল হাঁটুর নীচে। সেই অন্ধকার পৃথিবীর ক্ষীণ আলোটুকুও অপসৃত হয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। দুহাতে হাঁটুটা চেপে দাঁতে দাঁত চেপে ভিজে বালির ওপর বসে পড়েছিলাম আমি। শরীরে আর একবিন্দু ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। রামস্থমের ততক্ষণে চিনতে পেরেছে আমায়। উঠে বসেছে। মুখে একটা কিছু বলবার চেষ্টা করল। দুর্বোধ্য কিছুটা শব্দ বেরোল তার গলা দিয়ে। তারপরেই সোজা মাটির ওপর প্রণিপাত হ'য়ে জড়িয়ে ধরল আমার পাদুটো। ভিজে বালির উপর মুখটা গুঁজে দিল। কাঁপছে থরথর করে। কোথায় গেল তার শৌর্যবীর্য। অসহায় শশকের মত কাঁপতে লাগল।

উড়ে ততক্ষণে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতেই ছুটল জলের দিকে। আমার নিজের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। বুঝলাম জলে পড়ে মরবে পাগলা। বহু কষ্টে জামার কলার ধরে রামস্থমেরের মাথাটা উঁচু করলাম। পাগলাকে দেখতে পেল রামস্থমের। বললাম, আগে ওকে বাঁচা, ছোট।

আমার পা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল রামস্থমের। ছুটল আবার পাগলার পেছনে। পাগলা শ্মশানের উল্টো দিকে ছুটছে। দূরে সরে যাচ্ছে। মেঘে ঢাকা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ওদের দেখছি। পাড় ভাঙ্গার শব্দ শুনছি।

জলের ধার দিয়ে টলতে টলতে ছুটছে পাগলা। দৈত্যের মত বালি ভাঙতে ভাঙতে রামস্থমের ছুটছে তার পেছনে। আমাদের চারপাশে আর একটাও ছেলে নেই। দলের মধ্যে ফিরে গেছে সবাই। দূর থেকে গোটা দলটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই। অন্ধকারের মধ্যে শুধু গ্যাসবাতিটা দেখতে পাচ্ছি।

আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। ওদের দুজনের উদ্বেগ আমায় উঠিয়ে বসাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমিও ছুটলাম ওদের দিকে। বেশী দূর যেতে দিলে চলবে না। অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

পাগলা ছুটছে সবার আগে। রামস্থমের ঠিক তার পরেই। সবশেষে আমি অনেক পেছনে।

প্রায় ধরে ফেলেছিল রামস্থমের। এমনি সময় পাগলা সাধু হঠাৎ ঘুরে ঝপাং করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে ধরতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হল রামস্থমের। বালির পাড়ের ওপর পড়ল হুড়মুড়িয়ে। উঠল না আর। পড়েই রইল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমিও একসময় পৌঁছলাম তার পাশে। বসে পড়লাম। রামস্থমের জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। মুখে কোন কথা না বলে আঙুল দিয়ে দেখাল। চোখে তার অপার বিস্ময়। তার সংকেত অনুসরণ করে আমি যা দেখলাম অবাক হতে হ'ল।

মেঘের ছিদ্র দিয়ে বেশ কিছুটা আলো এসে পড়েছিল জলে। তাতেই দেখতে পেলাম। পাগলা সাধু অবলীলাক্রমে সাঁতার কাটতে কাটতে ঝুঁসির দিকে চলেছে। লোকটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। জলের আলোড়ন দিয়ে বোঝা যাচ্ছে।

প্রথম বর্ষার জল নেবেছে। নদী তখনও খুব মারাত্মক হয়ে না উঠলেও প্রস্থে এমন কিছু কম নয়। দীর্ঘদিন গঙ্গাস্নান করেও রামস্থমের সাঁতার জানেনা। অভ্যাস ছেড়ে গেলেও আমার জানা আছে। কিন্তু ওকে ফেরাই এমন ক্ষমতা আমার নেই। অসহায়ের মত দুজনেই জলের ধারে বসে পাগলা সাধুর সাঁতার

দেখতে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

আমরা দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে মাঠ-ময়। উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। কোথায় আছি আমরা জানবে কি করে। ওদের ফেরাবার উৎসাহ নেই আমাদের। সেই বিরাট প্রান্তরের শূন্যতায় চারপাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নার কুহেলিকা নিয়ে আমরা দুজন ক্লান্ত মানুষ চুপ করে বসে রইলাম।

রামসুমের এতক্ষণ যা নাটক দেখাল বসে বসে তার বিশ্লেষণ করছিলাম আমি। তার আচরণ মানবোচিত হলেও সম্পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়ছিল না। পাগলার ওপর এত কিসের দরদ ওর। দোষ ত' তারও কিছু কম ছিলনা।

রামসুমের হাঁফাচ্ছিল। বলল, মাস্টারমশাই, ভেসে যাবে না তো?

আমি তা কি করে জানব? ওর মত একটা অপদার্থ ভেসে যাক্ মরে যাক্, আমাদের তাতে কি? রামসুমেরের কাছে এতো আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। ক্ষুধার্তের পংক্তি থেকে আর একটা মানুষ সরে যাবে, মন্দ কি? হঠাৎ তার এমন মতিভ্রম হল কেন?

রেগে গিয়ে বললাম, মরুক না ডুবে। তোমার কি ভাবনা, একটা মানুষ ত' কমবে?

রামসুমের অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। চোখমুখ বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। বললে, আপনি বলছেন এই কথা। এইভাবে মরে যাবে? আমরা বাঁচাতে পারব না? কিছুই করতে পারব না? অতগুলো ছেলে মিলে ঠ্যাঙাচ্ছিল ওকে, খুন করে ফেলত, পুড়ে মরতে যাচ্ছিল—। এই চান আপনি? আপনিও কি ওদের দলে?

আমার আহত হাঁটুটা চেপে ধরেছে ততক্ষণে। চোখদুটো জলজল করছে। হাঁটুতে যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম। অসহ্য বোধ হচ্ছিল। রাগে গা জ্বালা করছিল। আমি আর থাকতে পারলাম না। বালির ওপর দুহাতে ভর দিয়ে অন্য পাটা দিয়ে প্রাণপণে ঠেলে দিলাম। সরে গেল রামসুমেরের মাথাটা। ঘাড়টা চেপে ধরলাম তখন। বললাম, হয়েছে কি? মাথাটা বিগড়েছে তোমার! বাচ্চাটা যখন মরল তখন তো ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছিলে। আর ওই পাগলার শোকে এত উতলা হয়েছ কেন? একেবারে দরদ উথ্‌লে উঠছে।

আমাকে উত্তেজিত হতে দেখে রামস্বমের আবার আমার পায়ের কাছে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দিল। আবার কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল।

—আপনি, আপনিও আমায়—হায় রাম, আপনিও আমাকে এই বুঝলেন। আমি,—আমি ওর কষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাইত, তাইত যখন মরে গেল, কষ্ট শেষ হল ওর, আনন্দ হচ্ছিল আমার। আপনিই বলুন, অতটুকু বাচ্চার অত কষ্ট সহ্য হয়। আমি কি এই চেয়েছিলাম, ও মরে যাক্—, তবে, তবে ত'—, ওই বাচ্চাটাকে খুঁড়ে বার করেছিলাম, তার মৃত্যুও কি আমি চেয়েছিলাম? খুড়ে বার করে আনন্দে নেচেছিলাম? রোজ কততো অমন মরে যাচ্ছে, সব—সব আমার ইচ্ছেয়—?

সে রাতে রামস্বমেরের নাটকীয় প্রলাপের এ শুধু ভূমিকা মাত্র। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, পাগলা সাধুর ওপর এত কিসের দরদ ওর। রামস্বমেরের প্রলাপের পরবর্তী অংশে তার কারণ জানা গেল।

সে কারণ রামস্বমেরের প্রলাপের ভাষায় ব্যাখ্যা করি এমন রুচি আমার নয়। তাছাড়া, সে অসংযত প্রলাপের সব অংশ আমি মন দিয়ে শুনিনি, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু আমি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছিলাম। সেখানে আমার কোন ভুল নেই।

বড় বিচিত্র সংবাদ শোনাল রামস্বমের। একটু আগে ওই যে ক্ষীণখর্বকায় পাগলা সাধু প্রাণঘাতী দুঃসাহসে গঙ্গার প্রস্থ সাঁতরে আরাইলের মত কুখ্যাত বালুচরে ফেরার হল, সে পুরুষ নয়। সে নারী।

এই সত্য উদ্ঘাটনের পর রামস্বমেরের সম্প্রসারিত দীর্ঘ প্রলাপের মধ্যে থেকে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাহিনী জানা গেল।

আজ রাতে আমরা যেখানে বসে আছি, বছর ছয় আগে সেখানে এক মহাকুম্ভের বিপুল আয়োজন হয়েছিল। গঙ্গার ওই ব্রীজের ওপারে, অর্থাৎ ত্রিবেণী সঙ্গমের বিপরীত দিকে ক্ষুদ্রকায় কয়েকহাজার কুঁড়েঘর তৈরী করা হয়েছিল। তারই একটায় কল্পবাসী হয়েছিল রামস্বমের।

তারপর এক অশুভ অপরাহ্নে সেই কুম্ভের সেই বহুচর্চিত ঘটনাটি ঘটল। বিশুদ্ধ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সেই পুণ্যভূমিতে মানুষের পদভারে দলিত ও পিষ্ট হয়ে প্রাণ দিল অগণিত ভক্ত।

সে রাত্রে ত্রিবেণী সঙ্গমের কূলে মানুষের এই উন্মত্ততা একসময় শান্ত হয়েছিল। মৃতের স্তূপের মধ্যে বিশালদেহী দৈত্যের মত রাতের আলো আঁধারিতে চরে বেড়াচ্ছিল রামসুমের।

এমনি সময় মৃতের স্তূপের মধ্যে থেকে কে যেন তার পাদুটো জড়িয়ে ধরল। পুণ্যালোভাতুরা উৎকলের এক গ্রাম্য বধূ। হতভাগিনীর দুর্দশা দেখে রামসুমেরের কোমল চিত্ত বিগলিত হয়ে থাকবে। মৃতের স্তূপের মধ্যে থেকে মৃতপ্রায় প্রাণটাকে উদ্ধার করে তার কল্পবাসের কুঁড়েয় নিয়ে তুলল রামসুমের। তারপর।

তারপর ভীষণ উল্লাসে উন্মত্তের মত আমি আমার কল্পনার ঘোড়াকে চাবকে ছোটালাম। রামসুমেরের প্রলাপের আর এক বর্ণও শোনাবার প্রয়োজন হ'ল না। আমার স্থির প্রতীতি দিবালোকের মত সব সত্য আমার সামনে মেলে ধরল।

ভ্রান্তির স্খালন থেকে নিষ্কৃতি পায়নি কল্পবাসী ব্রহ্মচারী। ধূমকেতুর মত আত্মগ্লানির অবিচ্ছেদ্য দাবদাহ নিয়ে ভোর রাতে কুঁড়েঘর থেকে উধাও হ'ল রামসুমের। পেছনে ফেলে রেখে গেল একবিন্দু বিষ। সেই বিষ বাষ্পীভূত হ'য়ে আচ্ছন্ন করল জীবনের অমৃতময় অতীত! তার দাহন জ্বালা চেতনার দিগন্ত জুড়ে বিস্তীর্ণ রইল ভবিষ্যতের অন্ত পর্যন্ত।

ওরা আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছিল। আমরাও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওদের ধরলাম। পাগলাটার কি হ'ল তাই নিয়েই প্রশ্ন সবাইকার। রামসুমেরের বেয়াদবীর প্রসঙ্গটা উঠালে না কেউ। সেই বিরাট বালুচরের মধ্যে আমরা সবাই একত্র হলাম আবার। দাহ শেষ হয়েছে ততক্ষণে। রাত প্রায় দুটো। এবার সবাই ফিরে যেতে ব্যস্ত হ'ল; বাঁধ পর্যন্ত দুদলই একসঙ্গে এলাম আমরা। সেখান থেকে ভাড়ার টাঙ্গা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লাম।

তিনখানা টাঙ্গা নিয়েছি আমরা। মাঝেরটায় আছি আমি, রামসুমের আর অজু। অজু সামনের সীটে, আমি আর রামসুমের পেছনে। শেষেরটা কিচলুদের টাঙ্গা, সেটা ছুটছে আমার আর রামসুমের মুখোমুখি।

রাত নিশুতি। নির্জন শহরতলীর মধ্যে দিয়ে টাঙ্গা তিনটে ছুটে চলেছে। পথ ফাঁকা বলেই বেশ জোরে ছুটেছে। আমরা সবাই ক্লান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পাকা পথের ওপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছে। ঘণ্টার ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে মিশে এক বিশেষ ছন্দের ঐকতান তুলেছে।

রামস্থমের টাঙ্গার হ্যাণ্ডেলে ভর দিয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছিল। চোখদুটো ছিল সামনে ঘোড়ার পায়ে নিবদ্ধ।

আমিও দেখছিলাম। ঘোড়ার পায়ে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে। রামস্থমের একদৃষ্টে স্ফুলিঙ্গ দেখছে।

সিমেণ্ট বাঁধান মসৃণ পথ। ঘোড়ার পায়ে সম্ভবত নতুন নাল লাগান হয়েছে। প্রায় প্রতিপদক্ষেপেই একটি দুটি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছে ঘোড়াটা। প্রতিপদক্ষেপেই একটি দুটি দাবানলের সম্ভাবনা নিমেষে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

আমি আর রামস্থমের উল্টোদিকে মুখ করে বসে আছি বলে মনে হচ্ছে আমরা যেন ওই স্ফুলিঙ্গগুলোর ভয়ে পিছু হটে পালাতে তৎপর। ক্রমাগত ওদের তাড়া খাচ্ছি।

পথ দীর্ঘ। ঘোড়ার পায়ে শত শত স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে।

হঠাৎ রামস্থমের সোজা হয়ে বসল। চোখে মুখে একটা আবিষ্কারের আনন্দে। ল্যাম্পের চকিত আলোয় চোখ দুটো তার জলজ্বল করে উঠল।

হঠাৎ বলল, চিন্‌গারী দেখেছেন, চিন্‌গারী। কেমন বলুন তো ?

—কেমন আবার ?

—বলবো, নির্বোধের হাসি মুখে, রামস্থমের রায় দিল ঠিক ওই দুটো বাচ্চার মত, নয় !

ঠিক এমনি সময় টাঙ্গাটা বিশ্রী রকম ঝাঁকিয়ে উঠতেই আমরা দুজনে দুজনকে ধরে ফেলবার চেস্টা করলাম। রামস্থমেরের শরীরের সম্পূর্ণ ভারটা পড়ল আমার আহত হাঁটুর ওপর। অসহ্য যন্ত্রণা পেলাম।

আর সেই মুহূর্তে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় একরাশ কুৎসিত চিন্তা এল আমার মাথায়। মনে মনে ওই স্ফুলিঙ্গগুলোর সঙ্গে বাচ্চাদুটোর তুলনা করে এতক্ষণ একটা নিষ্ঠুর আত্মগ্লানির যাতনা পাচ্ছিলাম। মহাকালের পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গের মত কল্পনা করেছিলাম ওদের। প্রতিটিতেই যেন প্রলয়ঙ্কর দাবানলের সম্ভাবনা, অথচ মুহূর্তে ব্যর্থ। বুঝতে পারছিলাম, সামঞ্জস্য থাকলেও, এ ভুল। একটা অত্যন্ত লজ্জাকর সিদ্ধান্ত। হয়ত সম্পূর্ণভাবেই বিশেষ অভীষ্ট সন্ধানী চিন্তার প্রসূত ফল। এমন অশুচি ধারণাকে প্রশ্রয় দেবার মত বলিষ্ঠ মন আমার নয়। যোগ্যতাও নেই অনাদিকালের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ আনার।

নির্বোধ রামসুমের সেই এককথাই ভেবে বসে আছে। শুধু যে আমার কুচিন্তায় সহমত হয়েছে এতটুকুই নয় নির্বোধের মত তা প্রকাশ করার স্পর্ধা করেছে।

শুধু কি তাই, যেন সেই মুহূর্তেই প্রকট হল, লোকটা একটা শঠ, প্রতারক। আজ দীর্ঘ সাতবছর আমার সঙ্গে তার উত্তম আর অধমের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, তাতে বরাবর আমার নিজেকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করে আসার জন্যে দায়ী রামসুমেরের এই শঠতা। আজ রাতে, এই কিছুক্ষণ আগে জানা গেল, লোকটা আমার চেয়েও পতিত, আমার চেয়েও ভণ্ড।

রামসুমেরের মোষের মত দেহের সমস্ত ভারটা পড়েছিল আমার আহত হাঁটুর ওপর। ক্রোধে ক্ষোভে যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হলাম আমি। মুহূর্তে প্রতিশোধ বাসনা বলবতী হয়ে প্রত্যাঘাত চাইলে, ডান হাতটা যতটা সম্ভব পেছনে করে উল্টো হাতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক চড় কষালাম তার মুখের ওপর।

তীব্র একটা চিৎকার করে টাঙ্গার বাইরে ঝুলে পড়ল রামসুমের।

মুহূর্তে প্রলয় ঘটে গেল যেন। এ টাঙ্গা থেকে অজু, পেছনের টাঙ্গা থেকে কিচলু চিৎকার করে উঠল। তাতেই লাগাম বেসামাল হল টাঙ্গাওয়ালার। ঘোড়া গেল আয়ত্বের বাইরে। প্রাণপণে লাগাম টানল সে। ফাঁকা পথের উদ্দাম গতি মুহূর্তে থামাবার চেষ্টা হ'ল। দুপা শূন্যে তুলে আছড়ে পড়ল ঘোড়া। টাঙ্গা ততক্ষণে ফুটপাথের ওপর উঠে এসেছে। কিচলুদের টাঙ্গা এসে পড়েছে আমাদের ঘাড়ের ওপর। সামাল সামাল রব উঠেছে তিনটে টাঙ্গা থেকেই।

আমাদের এক হাত দূরে থেমে গেল কিচলুদের টাঙ্গা। ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হ'ল। স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিও থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

ওই মারাত্মক অবস্থার মধ্যে এইটাই লক্ষ্য করেছিলাম আমি। রামসুমের করেনি। করলে বুঝতে পারত, এ ভাবে মহাকালের চাকা রুদ্ধ না হলে, এ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিও থামবে না। তার জন্যে বিধাতার মুখে আগামীকালের কোন বিদ্রোহী ভৃগুর এমনি মোক্ষম চপেটাঘাতের প্রয়োজন হবে।

আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি তার কণামাত্রের অধিকারী।

## ॥ মহুয়া ফোটার দিন ॥

বৃষ্টি এল না। দুরন্ত বাতাস এল। এপ্রিলের রিক্ত আকাশে যতটুকু মেঘের সঞ্চার হয়েছিল বাতাসে বিক্ষিপ্ত হ'ল। দেখতে দেখতে দিগন্তের সীমানার বাইরে উধাও হ'ল মেঘ। অল্প কিছু ধুলো উড়ল। ঝরা পাতায় সমাবৃত পালামৌব বনতল মর্মরিত হ'ল। মহুয়ার পল্লবহীন শাখায় শাখায় বাতাসের দোলা লাগল। তৃষিত ধরিত্রীর যাতনা বাড়িয়ে বৃষ্টির প্রহসন শেষ হ'ল।

সুষমা আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। পথের ধারে দাঁড়িয়ে মেঘের এই নির্যাতন দেখলেন। গলায় মুখে বাতাসের সজল স্পর্শ অনুভূত হ'ল। বৃষ্টিব দুরাশা করেননি। তবু একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। এলে ভাল হত। বৃষ্টি এলনা।

চোখে মুখে ধুলো জমেছিল। আঁচল দিয়ে পুছলেন। সাদা শাড়ীতে ময়লা দাগ লাগল। বিশ্রী দাগ। বিরক্ত হলেন সুষমা।

ডাঃ মিস্ সুষমা সান্যাল। লাতেহার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালেব লেডি ডাক্তার। নিত্যকার অভ্যাস মত বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। তাঁর উদ্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত পৌছবার আগেই বেয়াড়া হাওয়ায় পড়ে গেলেন। অসময়ের মেঘ হাওয়ায় উড়ে গেল। শাড়ীর আঁচল ময়লা হ'ল। সুষমা অনুমান করলেন, এই হাওয়ায় তাঁর মহুয়ার ডাল থেকে অসময়ে কয়েকটা ফুল অযথা ঝরে গিয়ে থাকবে।

সঙ্গে যথারীতি পোষা কুকুরটা ছিল। রক্। ছোট্ট পেকিনিজ্। হাতে তার ষ্ট্রাপ্। সুষমা জানেন, রক্ তাঁকে থামতে দেবেনা। ওর জেদ আর আব্দার টেনে নিয়ে যাবে সেই বিশেষ মহুয়া গাছটার সীমারেখা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে গাছটার তলায়। দেখবেন গাছটার পল্লবহীন শাখায় শাখায় মহুয়ার গুচ্ছগুচ্ছ কুঁড়ি। এখন ফুল আছে একটা দুটো। সারারাত ফুটবে। ভোররাতে ঝরে পডবে। পথের ধারে গাছের গুঁড়িটাকে কেন্দ্র করে এক বৃত্তাকার ভূখণ্ডের ওপর শ্বেতআস্তরণ পড়বে। এক আধটা দল ছাড়া হয়ে পড়ে থাকবে কালো পিচ্ঢালা পথের ওপর। কাল ভোরে বেড়াতে এসে রক্

সেগুলোর ঘ্রাণ নেবে। সুষমা নিজে এক বিচিত্র লীলাচ্ছলে পায়ের তলায় পেষণ করবেন গোটা দুই ফুল।

ছোকরা ডাক্তার ব্রজেশ সারস্বত সঙ্গে নেই এখন। বিকেলে সে আসেনা। সকালেও সঙ্গ নেয় খুব কম। ব্রজেশ বোঝে সুষমা চাননা এ সময়টা কেউ তাঁর নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করে।. তাই যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। অবশ্য এখন বিকেলে তার ফুরসৎ নেই। রিণার সেতারে পূরবী এখন সপ্তমে চড়েছে। পালং-এর বাজুর ওপর ব্রজেশ সারস্বতের অবাধ্য আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে প্রায় নিঃশব্দে ঠেকা দিতে।

দৃশ্যটা মনে পড়তে হাসি পেল সুষমার। হাসলেন। সে হাসিতে কিছু স্নেহ, কিছু মমতা কিছু বেদনা মিশে ছিল। তার সবটুকু রিণার প্রাপ্য। ব্রজেশ সারস্বতের নয়। বেচারী রিণা। সেতারের কটা তারে ক্লিষ্ট জীবনের সব সুর যেন বাঁধা পড়েছে।

সুষমা আকাশের পানে চেয়ে রইলেন। মেঘান্তরিত আকাশ। ধূসর নীলিমায় কোন সজল স্পর্শ নেই। এতবড় শূন্যতার মাঝে রিণাকে একটা স্থির বিন্দুর মত মনে হ'ল। মুহূর্তের কল্পনা বিলাস সারস্বতকে এনে দাঁড় করাল তার পাশে। নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটি ব্রাহ্মণ তনয়। সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এ এব অলীক সম্ভাবনার অতিরিক্ত কিছু নয়। এই সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে মন সরেনা তাঁর।

বুঝতে পারেন উনিশ বছরের কাঁচা বুনিয়াদে কাঁপন লেগেছে। চেতনার দিগন্ত জুড়ে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের বর্ণবহুল মেঘসঞ্চার কে আটকাবে। তাই ভয় হয়। এর পরই দুরন্ত বাতাস উঠবে। বাতাসে বিক্ষিপ্ত হবে মেঘ। ধূলো উড়বে। অল্প কিছুক্ষণের মাতামাতি। তারপরই আবার এমনি রিক্ত আকাশ।

ষ্ট্রাপে টান পড়ল। রক থেমে গেছে। সুষমার খেয়াল ছিল না। মহুয়া চিহ্নিত সীমারেখা পার হয়ে এসেছেন। থামলেন। জনহীন পথ। সুষমা তাঁর অভ্যাসমত ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন।

রাঁচী ডালটনগঞ্জের পিচ্‌ঢালা অপ্রশস্থ পথ। পথের দুধারে মোরম ছড়ান রাঙামাটির বন্ধনী রেখা। এ জায়গাটা খোলা মাঠ। পথের দুধারে অনুদঘাতী জমি! দূরে নীল গিরিরাজ দিগন্তের সমান্তরালে প্রসারিত।

পথের ধারে ছোট্ট একটা মহুয়া গাছ। সুষমার প্রাতঃভ্রমণ বা সন্ধ্যাভ্রমণের নিত্যকার সীমারেখা। এর বাইরে যান না। এতদূর আসেন। গাছের তলায় পাহাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। প্রাতে পূর্বে, সন্ধ্যায় পশ্চিমের পানে চেয়ে থাকেন। হাতে ষ্ট্রাপে বাঁধা সদাচঞ্চল রক্। এ সময়টা সেও দাঁড়িয়ে থাকে স্থির হয়ে!

এইখানে এসে দাঁড়ালে সুষমা সান্যালকে তাঁর যথার্থ অভিব্যক্তিতে চেনা যায়।

ডাঃ মিস্ সুষমা সান্যাল। পেডিয়াট্রিস আর গায়নোকলজিষ্ট—বিশেষজ্ঞ। বয়সটা পঁয়ত্রিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি কোথায় যেন স্থির হয়ে গেছে বোঝা যায় না। চোখে রিমলেশ্ বাইফোকাল চশমা। সরু কাল পাড়যুক্ত সাদা শাড়ী। সাদা ব্লাউজ। পায়ে কালো জুতো। বাঁহাতের কব্জীতে সোনালী ব্যাণ্ডে চোখে পড়েনা এমনি রিষ্টওয়াচ্। পাশে কালো ষ্ট্র্যাপে বাঁধা কুচকুচে পেকিনিজ রক্।

সুষমা সান্যাল জনহীন পথের ধারে দাঁড়িয়ে মহুয়ার গুচ্ছগুচ্ছ কুঁড়ির দিকে চেয়ে থাকেন। পালামৌর পটভূমিতে এ ছবি, এ রূপ বিস্ময়কর। এখানকার বুনো মানুষ বলে—মেম ডাগ্দর।

দুটো বন্যশিশু এই সময় দূর থেকে সুষমার দিকে চেয়ে থাকে। কাছেই কুঁড়ে, বাচ্চা দুটোর। পিঠাপিঠি দুই ভাইবোন। পরনে দু'টুকরো নোংরা ন্যাকড়া। সুষমা জানেন, এই গাছের মহুয়া ওদের সারা বছরের সংস্থান। যতদিন যতগুলো মহুয়া পড়বে সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে ওরা। রোদে শুকিয়ে রাখবে। সারা বছরের সেই আহার্য। মাটির হাঁড়িতে বজরার আটার গুলি আর সস্তা গুড়ের সঙ্গে সেদ্ধ হবে একমুঠো মহুয়া। সেই অমৃত ওদের দুবেলার খাদ্য।

দৈন্যের প্রতি বিগলিত অনুকম্পা—এ জীবনদর্শন সুষমার নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যারা বেঁচে থাকে, মৃত্যু কেন তাদের কাম্য নয়, এ সুষমা বোঝেন না। এই মনোভাবের রুক্ষতা বুঝিবা মূর্ত থাকে তাঁর ব্যক্তিত্বে। বাচ্চাদুটো তাই কখনও সাহস পায় না কাছে ঘেঁষার। তাছাড়া সবসময় রক্ সঙ্গে থাকায় সুষমা ওদের কাছে আরও বর্জনীয়া।

খুব ভোরে বাচ্চাদুটো এসে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সুষমা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পৌঁছান সচরাচর একটু পরে। যেদিন ওদের দেখতে পান

মহুয়া তলায় থামেন না। জানেন ওরা ভয় পাবে। মহুয়ার সীমারেখা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যান। ওদের অনুপস্থিতিতে কালো পথের ওপর বিক্ষিপ্ত গুটি ত্নই সাদা ফুল দূর্বার আকর্ষণ করে সুষমাকে। জুতোর তলায় পেষণ করেন গুটি ত্নই ফুল। এ এক বিচিত্র আমোদ তাঁর। অল্প একটু অপচয়, অল্প একটু বেহিসাব মনের প্রসার বৃদ্ধি করে। ছোট ছোট বিক্ষোভের হাত থেকে মুক্তি দেয় সংসারী মানুষকে। ত্নটো মহুয়া ফুলের অপচয়ের আনন্দ থেকে নিজেকে তাই বঞ্চিত করেননা সুষমা। তবে জানেন বাচ্চাত্নটো দেখতে পেলে কষ্ট পাবে। ওরা জানেনা, এটা সুষমার কৃতিত্ব, এ মহুয়াতলা থেকে আর কেউ ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায় না। সাহস পায়না। সবটাই বাচ্চাত্নটো পায়। দৈনন্দিন ত্নটি ফুল তারই মাশুল।

ডাক্তার সুষমা সান্যালের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন।

লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করার পর প্রায় বছর পনেরো নানান জায়গায় চাকরি করে বেড়িয়েছেন। সেদিনের সুষমাকে তিনি আজও মনে মনে ঘৃণা করেন। রূপ ছিল আপদ। লোভী পুরুষের ভীরু লালসার কবল থেকে পনেরোটা বছর পালিয়ে বেড়িয়েছেন সুষমা। লাতেহারে এসেছেন বছর পাঁচেক। ভাল লেগে গেছে এই ছোট্ট সহরটাকে। এখানে মানুষ কম, কোলাহল কম। সবচেয়ে বড় কথা সুষমা সান্যাল বয়সের দিক থেকে আজ পুরুষের লালসার গণ্ডীর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছেন। ছোকরা ডাক্তার ব্রজেশ সারস্বত হয়ত বোঝেনা, মনেপ্রাণে সুষমা সান্যাল খাঁটী পুরুষ বিদ্বেষী, ব্রতী।

সুষমার বড় বিচিত্র অনুভূতি এই ব্রজেশ, ছেলেটাকে মন্দ লাগে না তাঁর নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটী এই এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এক প্রতিশতের যে খুঁত তার জন্য দায়ী সুষমা নিজেই। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তনয়ের জাত মেরেছেন তিনি। ব্রজেশ তাঁর কোয়ার্টারে মাছ মাংস ডিমের লোভে ত্নবেলা হাজরি দিয়ে যায়। সময় নেই অসময় নেই ত্নম্ করে এনে হাজির করে ইয়া মস্ত এক বোয়াল আর নয় পায়ে দড়ি বাঁধা জোড়া মোরগ।

সুষমার কাছে এ এক মস্ত কৌতুক। এমনিতে আমিষ ভোজী লোভী পুরুষ জাতটার প্রতি অন্তরভরা বিদ্বেষ পোষণ করে রেখেছেন ; হেরে গেলেন শুধু ব্রজেশ সারস্বতের কাছে। দেখলেন এ ছেলে এক খাঁটী শিব। নারী মাংসের

চেয়ে মুরগীর মাংস বেশী সুস্বাদু, ব্রহ্মচারী এই কথাটা না জানি কি ভাবে বুঝে নিয়েছে। জীবনে এই প্রথম এক লোভনীয় পরাজয় বরণ করলেন সুষমা।

ব্রজেশের কথা চিন্তা করতে গেলে পিছু ফিরে চান সুষমা। সেই কৈশোরের বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে পুরুষ তাঁকে দেখে লুব্ধ হয়েছে। দেহ মন প্রেম প্রীতি কিছু একটার ওপর অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছে। চাইল না কেবল ব্রজেশ। সমীহ করল। বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করেও দূরে দূরে সরে থাকলে। সুষমা অবাক হলেন। এ কেমন ছেলে? লোহা অথচ চুম্বককে টানে না। এ পরাজয় তাঁকে আনন্দ দিল। নিজে যেচে ভাব করলেন। কাছে টেনে নিলেন ব্রজেশকে।

লাতেহার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের মেল ওয়ার্ডের ডাক্তার ব্রজেশ। ফিমেল ওয়ার্ডের দায়িত্ব সুষমার। ওঁরা সহকর্মী হলেও আধিপত্য বেশী সুষমারই। তাঁর অভিজ্ঞতার সামনে ভাল রেজাল্টের দম্ভ প্রকাশ করেনি ব্রজেশ কখনও।

হাসপাতালের লাগোয়া ছোট কোয়ার্টার পেয়েছেন সুষমা। কোয়ার্টারের দুটো বড় ঘরের একটায় দিদির স্থায়ী বিছানা। দেহে মনে পঙ্গু দিদি সারাদিন বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকেন। পাশের ঘরে একহাত উঁচু একটা চৌকির ওপর নরম গালিচা পাতা। দুটো ঘরের মাঝখানে তাঁর পূর্ববর্তী কোন ডাক্তারের খামখেয়ালে গড়া কাঁচের জানলা। রিণা দেওয়ালে ভর দিয়ে চৌকির ওপর উঠে দাঁড়ালে পাশের ঘরে মাকে দেখতে পায়। ওই চৌকির ছোট গণ্ডী রিণার সারা পৃথিবী। রিণা, তার সেতার আর একজোড়া ক্রাচ।

রিণার ঘরে একটা বড় পালং। ওটা সুষমার সম্পত্তি নয়। ঘরের মাঝখানে জানলা যিনি গড়েছিলেন তিনি ফেলে রেখে গেছেন। সুষমাও যেদিন চলে যাবেন ফেলে রেখেই যাবেন। পালং-এর ওপর সুষমা আর রিণার বিছানা। আজ উনিশ বছর রিণা তার সঙ্গে শুচ্ছে।

চৌকি থেকে পালং পর্যন্ত উঠে আসতে ক্রাচ দুটোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় রিণার। ব্রজেশ সারস্বত এখন ওই পালং-এর এককোণে বসে রিণার সেতার শুনছে। সুষমা যেন দেখতে পেলেন পালং-এর বাজুর ওপর ব্রজেশের কটা আঙুল নিঃশব্দে তাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। অতি প্রাচীন এক মটোর সাইকেল আছে ব্রজেশের। তার উৎকট শব্দে পালামৌর বন সচকিত করে রুগী

দেখতে যায়। চাঁদোয়ার বাঙলা বইয়ের লাইব্রেরী থেকে বই এনেছে হয়ত ব্রজেশ। সে দুটো রাখা আছে চৌকির একপাশে। ও দুটো পড়া হয়ে গেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আবার নিয়ে আসবে অন্য আরও দুটো। কলকাতা থেকে মেডিকেল পাশ করেছে ব্রজেশ। সুন্দর বাঙলা বলে। তবে তার দুঃখ এই, লিখতে পড়তে পারেনা। চেষ্টা করেছিল শিখবার। সুষমা তার কোয়াটারে গিয়ে ধরে ফেলেছিলেন। একগাদা শিশুপাঠ্য বাঙলা বই জোগাড় করে এনেছিল। সুষমা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সাধ্যমত সাহায্য করবার। তবে বিশেষ এগোতে পারেনি ব্রজেশ। কেমন একটা লজ্জা পেয়ে গেছিল। সুষমা জানেননা, ও নিজে আর এগিয়েছে কিনা।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিগন্তের গিরিরেখায় আবার কিছু মেঘসঞ্চার হয়েছে। সুষমা অস্তগামী সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। দুচোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল। আকাশ ভরা এত আলো, এত বর্ণের সমারোহ, এর কিছু সঞ্চয় থাকেনা। কে জানে, আগামীকালের অস্তাচল জুড়ে হয়ত শুধু বিবর্ণ মেঘের মেলা বসবে।

মহুয়ার সীমারেখা পেছনে পড়ে রইল। সূর্য অস্ত গেছে। সুষমা ফিরে চললেন। বাচ্চাদুটোকে আজ দেখতে পাননি। ওদের কথা ভাবলেন কিছুক্ষণ। পথের দুপাশের প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সঙ্গে পালামৌর দৈন্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ান। কাঠ, কয়লা, অভ্র, গ্রাফাইট, লা, চন—আরও কত কি বনজ আর খনিজ সম্পদ-এর বুক থেকে শোষণ করছে ধনকুবের বণিক। সুষমা ভাবলেন, মহুয়া যদি বারোমাসের ফুল হত, ওই বাচ্চাদুটোকে তিনি কিছু টাকা যোগাড় করে দিতেন। মহুয়ার ডিস্‌টিলারি খুব সম্ভব ওদের দারিদ্র জয় করতে পারত। দুমাসের ফসলে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। কি দিয়ে মদ বানাবে ওরা! মহুয়ার নির্যাস সভ্য দুনিয়ায় চলবে কিনা সুষমা জানেননা। জানেন, সভ্য দুনিয়া মদ চায়, মহুয়া চায়না।

চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রিণা। জানলা থেকে সামান্য আলো আসছিল তখনও। বই পড়ছে রিণা। সেতারটা পাশে শোয়ান। ক্রাচদুটো চৌকির তলায়।

নিস্তব্ধ বাড়ীটা। এখনও আলো জ্বালেনি রুক্মি।

দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন সুষমা। রিণা টের পায়নি। ব্রজেশ এসেছিল কিনা

বোঝা যাচ্ছেনা। রিণা কিছুটা অসংবৃত। সাড়ীর আড়ালে একটা শীর্ণ পা সুষমা দেখতে পাচ্ছেন।

শুধু ওইটুকুই খুঁত। তবু যেন এক অপাংক্তেয় সৃষ্টি। একটা পায়ের যতটুকু অভাব, শরীরের উত্তাল তরঙ্গে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ করা আছে। তাই বিস্মিত হন: নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটি ব্রাহ্মণতনয়ের আমিষের লোভ ওকে স্পর্শ করলনা।

—রিণা!

চমকে উঠল রিণা। শাড়ী সামলে উঠে বসল। বই মুড়ে পাশে রাখল। চোখে মুখে অপরাধের অপ্রতিভ ভাব।

সুষমা বললেন, আমার পাওয়ার বেড়েছে। চশমাটা বদলাব ভাবছি। এটা তোমার লাগবে নাকি?

রিণা নিরুত্তর। সুষমার 'তুই' ছেড়ে 'তুমি' সম্বোধনটাই বিরক্তির লক্ষণ।

—ব্রজেশ আসেনি?

—না তো।

দুটো ঘরের মাঝখানে দরজা আছে। সুষমা দিদির ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এমনি সময় রুক্মি আলো নিয়ে এল। সুষমার চোখের বিরক্তি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। মাথা নীচু করে পাশের ঘরে চলে গেল। আলো জ্বালতে দেরী হয়ে গেছে।

দিদির বিছানার পাশে দাঁড়ালেন সুষমা। ঘরে আলো দিয়ে গেছে রুক্মি। পাশের দেয়ালে দিদির উর্দ্ধাঙ্গের সিলউট্ স্থির হয়ে রয়েছে। সুষমা জানেন, এভাবে অনন্তকাল প্রতীক্ষা করলেও দিদির কাছ থেকে কোন সম্ভাষণ আশা করা যাবেনা। কোন প্রশ্ন যদি করেন সুষমা, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব পাবেন।

কোয়ার্টারের দুটো ঘরে সুষমা সান্যালের জীবনের সবচেয়ে বড় দুটো ব্যর্থতা লালিত হচ্ছে। দিদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রিণাকে সারিয়ে তুলবেন। পারেন নি। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দিদির মন ফিরে পাবেন। পাননি।

চেষ্টা আজও চলছে। বাড়ীটাই ছোটখাট একটা আরোগ্য নিকেতন। দেহমন দুয়েরই চিকিৎসা করে যাচ্ছেন সুষমা। ব্রজেশ সারস্বতের সহযোগীতা আশা করেছিলেন, সুষমা নিজেই স্থির করে উঠতে পারেন নি, সে সহযোগীতায় ব্রজেশের যথার্থ ভূমিকা কি?

—ওষুধটা খেয়েছ ?

—খেয়েছি।

—বুকের ব্যথাটা আর—

—না। ঠিক আছি।

—ব্রজেশ আসেনি বুঝি।

—না তো। রিণা—!

ব্রজেশ যে আসেনি সে কথা জানতে চাওয়াই অর্থহীন। এ ঘরে ব্রজেশ বড় একটা একলা আসেনা।

দিদির ঘরে কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আছে। গীতা বেদ, উপনিষদ—এমনকি কোরাণ, বাইবেলের বাংলা সংস্করণ, আর তেমনি কিছু আধ্যাত্ম দর্শন ঘেষা বই। দিদির সারাদিনের সাথী। মাঝেমাঝে এ ঘরে বড় বিচিত্র মজলিশ বসে। ব্রজেশ আসে, আসেন চিরকুমার সদাপ্রসন্ন মৌলবীসাহেব। দিদির বিছানার ওপর বসে রিণা গীতা পড়ে। মেঝের ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে ব্রজেশ। পাশে হাঁটু মুড়ে বসেন মৌলবী সাহেব। ঘরে ধূপ জ্বলে। আশ্চর্য মানুষ মৌলবী সাহেব চোখ বুজে গীতা শোনেন। শোনেন বেদ, উপনিষদ; এ-দৃশ্যের শুচিতা বর্ণনাতীত। সুষমা একা গিয়ে হাসপাতালের কামরায় বসে থাকেন চুপ করে। সেই সময়টুকু এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁর কাছে কাম্য মনে হয়।

দিদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুষমা। রিণা সেতারের তার বাঁধছে। আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে একটি দুটি।

দুটো বড় ঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘর। তারপাশে রান্না ঘর। এ ঘরদুটো বড়ঘরদুটোর সমকোণে তৈরী। চারটে ঘরের সামনে 'এল' আকারের বারান্দা। তারপর পাঁচিল ঘেরা উঠোন। রান্নাঘরের লাগোয়া আর একটা ছোট ঘর আছে। রুক্মি থাকে।

সুষমা গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলেন। একটা আলো তুলে নিলেন। ঘরের কোণে ঝুড়ি ঢাকা একটা মাটির জালা। সুষমা ঝুড়িটা তুলে আলো ফেললেন ভেতরে। দেখলেন কিছুক্ষণ। চিন্তিত হলেন। ছেলেটা কাল যদি মাছ নিয়ে না আসে মুশকিল হবে।

এ দেশে গরই বলে। মাটির জালায় সেই মাছ। দিদির খাদ্য। ভেতরে একজোড়া মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে।

একহাতে ঝুড়ি অন্যহাতে হ্যারিকেনের আলো। সুষমা কিছুক্ষণ মাছদুটোর সাঁতার কাটা দেখলেন ॥

এ কেমন জীবন। পুকুরের বিস্তীর্ণ পরিধি ছেড়ে এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে দুটো অসহায় প্রাণ। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে সুষমাই যেন আর একটি স্তর সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জীবনের এই বিলম্বিত রূপ ব্যথিত করল সুষমাকে। আলোটা সরিয়ে নিলেন।

রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। রুক্মি উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ বার করে নিয়ে কড়ার মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে তরকারি দেখছে। সুষমা অপেক্ষা করলেন। এখুনি কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরিত হবে। রুক্মি কাঠটা স্বস্থানে গুঁজে দিচ্ছিল। সুষমা বললেন, ছাই দিয়ে রাঁধছিস নাকি? ভেতরে পড়বেনা?

—ডিবরি থেকে যে কেরোসিন—

—টর্চ রাখ তাহলে একটা। আমায় বলেছিস্ কখনো! দিদির মাছ শেষ হয়েছে সে হুঁস আছে তোর?

রুক্মি আর জবাব দিলনা। সুষমা সরে এলেন। এবার নিজের ঘরে গিয়ে বসবেন। ঘণ্টাখানেক মেডিকেল জার্ণালে চোখ বুলোন রোজকার অভ্যাস তাঁর।

টেবিলের ওপর একটা সুদৃশ্য ল্যাম্প। পাশে একটা কেরোসিন কুপির ফ্যান। রুক্মি সেটাকে চালিয়ে দিয়ে গেছে। সুষমা টেবিলে বসতে যাচ্ছিলেন। বসা হ'ল না। ডাক এসেছে হাসপাতাল থেকে। এখুনি যেতে হবে। ডেলিভারি কেস।

যন্ত্রচালিতের মত সুষমা উঠলেন। যেমন অবস্থায় ছিলেন বেরিয়ে পড়লেন।

রুগী দেখেই মেজাজ খারাপ হ'ল সুষমার। চেনা মুখ। পাঁচ বছর লাতেহারে এসেছেন সুষমা। এই নিয়ে ছবার একে হাসপাতালে নিচ্ছেন। কোনবারই বিশেষ অল্পের ওপর দিয়ে যায় না। পালামৌর মাটিতে আর একটি নতুন প্রাণের সংযোজন হ'ল।

রাত প্রায় দুটো। সুষমা কিছুক্ষণ মৃতবৎসা প্রসূতির দিকে চেয়ে রইলেন। জ্ঞান হারিয়েছে। এবারকার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। নিজেকে দুঃখিত মনে করার

চেষ্টা করলেন সুষমা। কিসের দুঃখ! ওই যে মাংসপিণ্ডটা অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী কালের আর একটি মায়ের রূপ নিলনা এ ব্যর্থতা সুষমাকে বিচলিত করতে পারল না। আশা করা যায় এ ক্ষতিপূরণ করতে আর মাত্র দশটি মাস অপেক্ষা করতে হবে।

বাড়ী ফিরলেন সুষমা। দেহে মনে ক্লান্ত। অথচ ঘুম নেই চোখে।

ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। রুক্মি দরজা খুলে দিল। সুষমা খাবেন কিনা জানতে চাইল। সুষমা আপত্তি করায় দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমতে গেল সে।

শোবার ঘরের দরজা ভেজান ছিল। নিঃশব্দে খুললেন সুষমা। রিণা ঘুমচ্ছে। গড়িয়ে বিছানার একপাশে চলে গেছে। দুচোখের পাতা এক হ'লে লজ্জাশরম বলতে কিছু থাকে না রিণার। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রিণাকে কিছুক্ষণ দেখলেন সুষমা। এখন ওর শীর্ণ পাটা দেখা যাচ্ছে না। অন্য পাটায় ঢাকা পড়েছে। সুষমা অন্য পাটা প্রায় সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন। হঠাং মনে পড়ল, মৌলবী সাহেব বলেন, কিংবদন্তী আছে, বিধাতাপুরুষ যখন মানুষের মধ্যে রূপ বিতরণ করছিলেন, সবচেয়ে উদার ভাগ পায় তুর্কীবাসী। রিণার সঙ্গে কি তুরস্কের— মুহূর্তের আত্মশাসনে এ চিন্তা বন্ধ করলেন সুষমা।

বিছানার ওপর একটা বিলিতি ওষুধ কোম্পানীর সচিত্র বুকলেট্। আজকের ডাকে এসেছে। ও দেশের কোন নার্সিং হোমের আদর্শ শিশুপালনের গোটাকতক আকর্ষণীয় ছবি। রিণা ওটা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই অবস্থায় দোর গোড়ায় দাড়িয়ে রিণার আচরণে একটা অমার্জনীয় দুর্বলতার সন্ধান পেলেন সুষমা হঠাৎ। কেরোসিনের ময়লা আলোয় দুচোখে বিরক্তি চমকিত হ'ল। হাসপাতালে ফিরে গিয়ে মরা বাচ্চাটাকে তুলে এনে রিণাকে উপহার দিতে ইচ্ছে হ'ল সুষমার। অনুভূতি প্রবণতার উর্দ্ধে জীবনের বাস্তব রূপটা চিনতে শিখুক রিণা।

রাত শেষ হ'ল। নিত্যকার অভ্যাস মত একই সময় ঘুম ভেঙ্গে যায় সুষমার। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। এমন আলস্যকে প্রশয় দিলে চলবে না, উঠলেন। রিণা কখন উঠে গেছে টের পাননি। ক্রাচ্ দুটোর সাহায্যে তাকে ব করতে হয়। সুষমা দুচোখ ভরা তন্দ্রা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

পূব খোলা ঘর। ভোরের আলোয় এ ঘর উদ্ভাসিত। সেই আলোর মাঝে এক কল্পনাতীত দৃশ্য সুষমাকে হতবাক করল।

জানলার দুটো গারদ চেপে ধরে নির্নিমেষ উদায়চলের পানে চেয়ে আছেন অনিমা। মুখে আলো পড়েছে।

কথা বললেন না সুষমা। প্রসন্নতায় মন আপ্লুত হল। দুর্লভ এই মুহূর্ত কটিকে যতদূর সম্ভব বিলম্বিত হতে দিলেন।

কি ভাবছেন দিদি? সুষমা জানেন কি ভাবছেন অনিমা। এমন কল্পনা বিলাসের জন্য অনিমার সঞ্চয়ে দু-একখণ্ড মধুস্মৃতির অতিরিক্ত কিছু নেই। অনিমার মানসপটে সুষমা প্রত্যক্ষ করলেন পঁচিশ বছর পূর্বের দুটো কাঁচা সবুজ হৃদয়। সেই সুন্দরতম পৃথিবী সেই প্রজাপতি মন আজ আবার বিস্মরণের আঁধার অতিক্রম করেছে।

সুষমা দেখতে পেলেন কৈশোরোত্তর একজোড়া ছেলেমেয়ের অবাধ ছেলেমানুষী। হয়ত একখণ্ড চকোলেটের দুপ্রান্ত দুজনে একসঙ্গে কামড়ে ধরেছে। আর নয় এক প্লেট পরমান্নে চুমুক দিয়েছে একত্রে। এমনি আরও কত ছোট ছোট ছবি। সেদিনও সুষমা এমনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দেখতেন। মনে হল, যেন আজও দেখছেন।

তারপর হঠাৎ, বাতাস উঠল। রিক্ত আকাশের যূথভ্রষ্ঠ মেঘ বাতাসে বিক্ষিপ্ত হ'ল। মাতন লাগল ঝরা পাতার বনে। মেয়েটি ছুটে এসে চেপে ধরল ছোট বোনের হাতদুটো। কান্নায় ডুকরে উঠল, সুষি, তুই আমায় বাঁচা।

* * * *

মহুয়ার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্যকে পূর্বাচলে উদিত হতে দেখেন সুষমা। অস্ত হতে দেখেন পশ্চিম দিগন্তের গিরি রেখায়। দিন কেটে যায়। মোটামুটি ভালই লাগে এই গতানুগতিকতা। দিন কেটে যায়। বৈচিত্র্যের সন্ধানে অবসাদ এসেছে। জীবনে নিয়ে নতুন কোন পরীক্ষা করতে আর ইচ্ছে হয়না।

ব্রজেশ সারস্বত সঙ্গে ছিল। পেকিনিজ রক্ ছিল অন্যপাশে। বেড়িয়ে ফিরছিলেন সুষমা। আজ পিচবাঁধান পথের ধারে ব্রজেশ এর জুতোর তলায় গোটা ছয়েক মহুয়া পিষ্ট হয়েছে। সুষমা দেখে দেখে পা ফেলছিলেন। ব্রজেশের এই অপচয়, যদিও অনিচ্ছাকৃত, সুষমাকে বিরক্ত করেছিল। ছটা মহুয়া তাঁর তিনদিনের বরাদ্দ। ব্রজেশের এই অপচয়ের ক্ষতিপূরণ করতে সুষমাকে একাদিক্রমে তিনদিন কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে।

ব্রজেশ কটা দিনের ছুটি নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বাড়ী যাবে। বাড়ী তার পাটনার কাছে কোন গ্রামে, ডালটন্‌গঞ্জে সিভিলসার্জনের কাছে দস্তখাস্ত দিতে হবে।

—বাড়ী কেন যাবে? সুষমা জানতে চাইলেন।

—মা বাবা ডাকছেন। আর, আমার এক বোন আছে, তার ইচ্ছে এখানে এসে থাকে কিছুদিন।

—হুঁ, তোমার বিষয় কিছু ইনভেস্‌টিগেসন—?

—কি রকম?

—না, মানে, যেমনটি ছিলে তেমনি ঠিক আছ কিনা,—একলা রয়েছে, গুরুজনদের ভাবনা হয় বৈকি?

—না না, এসব ভাবছেন কেন? ভয় পেয়েছে ব্রজেশ, বলল, এমনিই আসতে চায়। আসলে উদ্দেশ্যটা—কনভ্যালেনসিং, অসুস্থ ছিল কিনা—এখানকার খাঁটী বাতাস, দুধ ঘি—

—বেশ তো। নিয়ে এস। কত বড় বোন?

—ওই ওর—রিণারই বয়সি প্রায়। বিয়ে হয়ে গেছে। বাচ্চা আছে একটা। ছেলে। তবে একেবারে গেঁয়ো, বুঝলেন। আর ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা যা গোঁড়া না—।

সুষমা কথা বললেন না। চুপ করে হাঁটছেন। ব্রজেশ আবার বলল, কাল রিণাকে বলেছি, ওকে নিয়ে আসার কথা। রিণা ত' খুব খুশী। রিণার কথা বোনকে আমি চিঠিতে লিখেছিলাম।

—খোড়া পায়ের কথা? অতর্কিতে প্রশ্ন করলেন সুষমা। সোজাসুজি তাকালেন ব্রজেশের চোখের দিকে।

—না না—এ কথা বলছেন কেন? বেজায় অপ্রতিভ হল ব্রজেশ। প্রতিবাদ করল, শুধু পায়ের কথা কেন সেতারের কথা, বোনার কথা, সেলাই, স্বভাব, রূপ—সব কথাই লিখেছি আপনি জানেন না, আমার বোন বড় আগ্‌লি।

—তাতে কিছু আটকেছে? বাচ্চা কত বড় ওর?

—বছর খানেক—না, বোধহয় আর একটু বড়।

—বেশ তো। নিয়ে এস। আলাপ হবে। হাসলেন সুষমা, বললেন আমি কিন্তু মাছ মাংস খাওয়ার কথা সব ফাঁস করে দেব।

হাসল ব্রজেশ। দুহাতের দুটো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করে আকাশের দিকে তুলে ধরল। বেপরোয়া গলায় বলল, বয়ে গেছে।

এবার দুজনের মিলিত হাস্যে নিস্তব্ধ বন মুখর হ'ল। সুষমা প্রশ্ন করলেন, কি নাম বোনের। বললেনা!

—লক্ষ্মী।

—হুঁ, লক্ষ্মী! লছ্‌মী বল। সুষমা আবার হাসলেন।

ছুটি পেলনা বলে ব্রজেশের যাওয়া হ'ল না। লছ্‌মী এল। তার এক দেবর তাকে ব্রজেশের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে গেল।

লছ্‌মী আর তার বাচ্চা। কুৎসিত একটা গেঁয়ো মেয়ে, আর এক তাগা তাবিজ মাদুলী পরিকীর্ণ কাঁদুনে বাচ্চা। সুষমা ওদের সইতে পারলেন না। ওদের তরফ থেকে সৌহার্দের যতটুকু প্রয়াস হয়েছিল সুষমার নির্লিপ্ত উপেক্ষায় ব্যর্থ হ'ল।

ভাব হ'ল রিণার সঙ্গে। লছ্‌মী আর তার বাচ্চা রিণার চৌকির ওপর দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগল।

সেই সুযোগে ব্রজেশকে দিদির সম্পূর্ণ গল্পটা বলে ফেললেন সুষমা। দিদির আর রিণার গল্প। তবে সে গল্পের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ ভূমিকায় স্থান তাঁর নিজের।

ব্রজেশ অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে জানতে চেয়েছিল—অবশ্য লছ্‌মীর মেয়েলী কৌতূহলে উত্যক্ত হয়েই, বিয়ে কেন করেননি সুষমা!

ব্রজেশের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন সুষমা, তুমি কেন করনি?

—আমি? কেমন যেন বিহ্বল ভাব করল ব্রজেশ, বললে, আহা—মানে, আমার ত' এখনো ও স্কোপ আছে।

—আমার নেই বুঝি? সুষমার চোখে কৌতুক, মুখে হাসি। ব্রজেশকে বিব্রত করে আনন্দ পাচ্ছেন।

এই থেকেই গল্পের অবতারণা। লাতেহার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের নিরিবিলি কামরায় বসে ডাক্তার সুষমা সান্যাল ডাক্তার ব্রজেশ সারস্বতকে তাঁর কাহিনী শোনালেন। সেদিনের বেড়ান স্থগিত রইল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল। আবার বিশ বছর পুরোণ সেই অপ্রিয় স্মৃতিচারণ করলেন সুষমা।

অনিমা আর সুষমা। লক্ষ্ণৌ-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের দুই মেয়ে। পিঠোপিঠি দুই বোন। যখন মা মারা গেছেন তখন অনিমার এগারো, সুষমার আট বছর।

বাড়ীতে ঐশ্বর্য ছিল। মানুষ ছিল না। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বাবা অধিকাংশ সময় দেশের বাইরে, সহরের বাইরে আর নয় বাড়ীর বাইরে থাকতেন।

সুষমার ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনাটা ছিল নেশা। দিদি অনিমা ছিল আমুদে প্রকৃতির মেয়ে। স্বচ্ছল জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চেয়েছিল সে।

বাড়ীতে গাড়ী ছিল। ছোকরা ড্রাইভার ছিল এক। বাবা যাকে প্রায় পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। হশ্‌মত কামাল। দিল্লী লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের ওপর মটর অ্যাক্সিডেন্ট করে মৃতপ্রায় পড়েছিল। ডাক্তার ফিরছিলেন দিল্লী থেকে নিজে ড্রাইভ করে। হশ্‌মত কামালকে গাড়ীর মধ্যে মৃতপ্রায় রেখে দলের অন্যরা পালিয়েছিল পুলিশের ঝামেলা এড়াতে।

এই সুদর্শন মুসলমান তরুণ ক্রমে, বাড়ীর মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ড্রাইভিং ছাড়াও ডাক্তারের রিসার্চের যন্ত্রপাতি মডেল্ ইত্যাদি তৈরীর কাজে নানাভাবে সাহায্য করত।

তারপর একদিন আর এক দুর্ঘটনা।

সুষমা তখন স্কুল ফাইনালের ছাত্রী। ড্রাইভিং শেখার খেয়াল চাপল দিদি অনিমার মাথায়। অবাধ্য হয়ে ষ্টিয়ারিং হাতে নিল। পাশে রইল হশ্‌মত কামাল। পথ প্রায় জনহীন। অন্যদিক থেকে পাড়ারই এক বাঙালী ছেলে বাচ্চা বোনটিকে সামনে বসিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। মোড়ের মাথায় অ্যাক্সিডেন্ট হ'ল। বাবা বাড়ি ছিলেন। মেয়েটি মারা গেল ক্লিনিকে তুলে আনার কিছুক্ষণ পরেই। পল্লব মিত্র আঘাত পেয়েছিল গুরুতর। তার সারতে সময় লাগল মাস দুয়েক।

সহরে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার বলে হাঁকডাক থাকলেও পুলিশের বিপদ এড়াতে বাবাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভার বলে হশ্‌মত কামালের ছ'মাস জেল আর সেই সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হ'ল। কোর্ট-কেসে পুলিশ তার আগের এ্যাক্‌সিডেন্টের রেকর্ড দেখিয়েছিল।

পল্লব মিত্রের সঙ্গে এই দুর্ঘটনার পর থেকেই ওদের পরিচয়। যার শুরু এমন অশুভ তার শেষ কি হতে পারে দুটি অপরিণতবুদ্ধি মেয়ে সেদিন সেকথা বোঝেনি। বাচ্চা মেয়েটির ওই অপঘাতমৃত্যুর অপরাধবোধই সম্ভবত অনিমা আর পল্লব মিত্রকে একসূত্রে বেঁধেছিল। আত্মকেন্দ্রিক সুষমা সৌজন্যের অতিরিক্ত এগোন নি। বাড়ীতে মেয়েমানুষ কেউ ছিল না। বাবা ব্যস্ত থাকতেন তাঁর ডাক্তারী নেশা নিয়ে, আর নয় বিলিতি জার্ণালে প্রবন্ধ রচনায়। সুষমা থাকতেন পড়াশুনা নিয়ে। অনিমা আর পল্লব মিত্রের মেলামেশা সম্পূর্ণ অবাধ ছিল।

ছমাস জেল খাটার পর হশমত কামাল ফিরে এসেছিল। বাবা তাকে দ্বিতীয়বার চাকরী দিতে পারেন নি। বাড়ীতে সবাইকার, এমনকি পল্লব মিত্রেরও সহানুভূতি পেয়েছিল হশমত কামাল। ছেলেটা ড্রাইভার ছাড়াও ভাল মোটর মেকানিক্ ছিল। ডাক্তার এর পরও তার এই কারিগরি কুশলতা কাজে লাগাতেন ডি. এন. এ., আর. এন. এ. ইত্যাদির নানান রকম মডেল বানাতে।

হশমত কামাল, পল্লব মিত্র আর পিতা ডাঃ সুধীরঞ্জন সান্যাল। তিনটি পুরুষ, তিনটি নাম। পুরুষবিদ্বেষ ব্রতী সুষমা সান্যালের চেতনার গভীরে অবিচ্ছেদ্য বিষজ্বালা হয়ে থেকে গেছে।

সুষমার মত পল্লব মিত্রও ক্রমান্বয়ে এক চাকরী ছেড়ে অন্য চাকরী করে বেড়িয়েছেন অনেকগুলো বছর। এখন সম্ভবতঃ স্থিতির চেষ্টায় রয়েছেন ব্যাঙ্গালোরের কাছে জলহল্লীর এক ফ্যাক্টরীতে। শুনেছেন তাঁর মত একাএকাই থাকেন। পল্লব মিত্রের ভ্রষ্টাচারের নিন্দা এতদূর লাতেহারের মত ছোট সহরেও এসে পৌঁছেছে একাধিকবার।

সুষমা যে বছর মেডিকেল পাশ করেন তার ছ'বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন পল্লব মিত্র। আজ পল্লব মিত্র কোথায় সুষমা জানেন। দিদি অনিমা জানেন না।

এরজন্যে কে দায়ী? সুষমা না অনিমা? পল্লব মিত্রের মত জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের দুবোনের কোন একটির জন্য। সে যে কে আজও তার বিচার হ'ল না।

ব্রজেশ সারস্বতকে গল্প শোনাচ্ছিলেন সুষমা। সেই টুকরো টুকরো ছবিগুলো, যা পল্লব মিত্র আর অনিমার অনুরাগের মাধুর্যে চিত্তাকর্ষক, সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করলেন না।

প্রায় কিশোর বয়সে যে ভালবাসার অঙ্কুর জন্মেছিল সুষমা যখন মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারে সে তখন পূর্ণ পুষ্পিত তরু।

এরপর ব্রজেশকে সেদিনের সন্ধ্যায় দেখা মেঘ আর ঝড়ের উপমার কথা বললেন। যেন সব শুদ্ধ ভালবাসা এইভাবে তাড়িত বিক্ষিপ্ত হবার অনিবার্য পরিণতির জন্যই সঞ্চার হয়।

ছোটবোন ডাক্তার সুষমার দুহাত চেপে ধরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে আকুতি জানিয়েছিলেন অনিমা, সুষি, তুই আমায় বাঁচা।

নিঃসঙ্কোচে এতদূর বললেন সুষমা। এইখানে থামলেন। ব্রজেশ সারস্বত মাথা নত করে বসেছিল। সুষমা কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে বাইরে ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন ব্রজেশকে—

—আচ্ছা ব্রজেশ, তুমি স্বীকার কর, নারী আর পুরুষের মধ্যে এই যে ভালবাসার আকর্ষণ এর একটা বায়োলিজিক্যল্ সিগ্‌নিফিকেন্স আছে।

—সম্ভব। সঙ্কোচে উত্তর দিল ব্রজেশ।

—একে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার শেষ ফল শুভ হতে পারে না। অন্ততঃ আমাদের মেডিকেল এথিকস্ এমন কিছু সমর্থন করে না। নিষ্কাম প্রেম বা ওই ধরনের ইন্দ্রিয়াতীত কিছু সাধ্যের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা শুধু অপূরণীয় ক্ষয় করে। দিদি আর পল্লবদা দুজনেই নাবালকের গণ্ডী ছাড়িয়েছিল অনেকদিন। হয়ত পরস্পরের নিষ্ঠার পরীক্ষা চলছিল বিয়েটাকে বিলম্বিত করে। ওদের স্বপ্নে দেখা সমুদ্র বিস্তীর্ণ ছিল, কিন্তু সমুদ্রের বাসনা সার্থক হ'লনা। গোষ্পদে পদস্খলন লেখা ছিল দিদির নিয়তিতে। আমি যখন জানতে পারলাম আড়াই মাস হ'ল রিণাকে কন্‌সিভ করেছে দিদি।

—পল্লব বাবু—

—না ব্রজেশ। সেদিন যেমন আমি ভুল বুঝেছিলাম, তুমিও আজ ঠিক তাই বুঝলে। রিণার জন্মের জন্য পল্লবদা দায়ী ছিলেন না।

—তবে ?

—সেকথা দিদি আজও আমার কাছে প্রকাশ করেননি। তবে আমি জানি।

সুষমা দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য ক্রূরতা নিয়ে ব্রজেশের বিবর্ণ মুখটার দিকে তাকিয়েছিলেন। নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটী ব্রাহ্মণ তনয় বজ্রাহতের মত বসে আছে।

সুষমার সমস্ত অন্তর জ্বালা করছিল। ভাবছিলেন, এ কাকে তিনি গল্প

শোনাচ্ছেন! এযে একেবারে কাঁচা মাল। এ আঘাত কি পারবে সইতে ব্রজেশ।

—আমি দুঃখিত ব্রজেশ। তুমি হয়ত আঘাত পেলে। এ গল্পের বাকীটুকু তুমি আর শুনো না।

—না, আপনি বলুন। আমি সব জানতে চাই। ব্রজেশ সারস্বত প্রায় ককিয়ে উঠল।

—আজ আমার গল্প শুনে তুমি যতটা বিচলিত হলে বিশ বছর আগে আমিও ততটাই হয়েছিলাম। কেননা আমার মন তখন তোমারই মত কাঁচা ছিল। সেই যে দিদি আমায় বলেছিল, সুষি, তুই আমায় বাঁচা, তার জবাবে বলেছিলাম, তোমার জীবন মৃত্যুর দায়িত্ব আমার নয় দিদি। আমার ডাক্তারী জীবনের সবেমাত্র শুরু। গোড়াতেই এভাবে আদর্শ হারাতে বোলোনা। তুমি কি করবে আমি জানিনা। আমি তোমার সন্তানকে বাঁচাব। তুমি কিছুতেই ওকে নষ্ট করতে পারবে না। আমার সেদিনের মনোভাবকে বিচার কর। পীড়িতের সেবার মন্ত্রে সবে দীক্ষা নিয়েছি। সোস্যাল এথিকস্-এর চেয়ে মেডিকেল এথিক্স্-এর মর্যাদা আমার চোখে তখন অনেক বড়। বল, সেকি ভুল ?

—আমি বুঝিনা, আপনি বলুন।

—তোমার বিশ্বাস করতে বাধবে, আমার সেদিনের আদর্শকে আজ আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। পরিণাম দিয়েই সব কিছুর যথার্থ বিচার হয়। পরিণামটা দেখ, এতগুলো জীবন ধূ ধূ মরুভূমির মত রিক্ত করে রেখেছি। আমার ভয় হয় এর মধ্যে তুমি না জড়িয়ে পড়। বল, এ অপরাধ নয় ?

—কি করতে পারতেন আপনি ?

—যা দিদি চেয়েছিল। তোমার যে অমন গোঁড়া বোন, অমন অবস্থায় পড়লে সেও যা চাইত, যা সব কুমারী মা চেয়ে থাকে তাই করতে পারতাম। কিউরেট্। রিণাকে ভ্রূণে হত্যা করে দিদির সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতাম। পল্লবদা টেরও পেতেন না। আজ হয়ত দিদিকে একটা সুখী সমৃদ্ধ জীবনের সব ঐশ্বর্য দিতে পারতেন। ওঁর নিজের জীবনটাও এমন বিষময় হয়ে উঠত না। ফাঁকি ঠিকই থেকে যেত ; এতগুলো জীবনের ওপর এমন মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া তো হত্যা। এই কি ভাল হয়েছে ?

—তারপর কি হল ?

—আজ থাক্। রাত হয়েছে। কাল ভোরে বেড়াতে এসো। বলব তোমায়। শুনে রাখ, আমিই এ গল্পের উপনায়িকা। আজও দিদির ক্ষমা পাইনি।

সারাটা রাত প্রায় না ঘুমিয়ে কাটাল ব্রজেশ। ভোরে উঠতে দেরী না হয়ে যায় এই উদ্বেগে রাতটা কেটে গেল। লছ্মীকে বলে রেখেছিল ভোর সাড়ে পাঁচটায় তুলে দিতে। ছটার সময় যখন ধড়ফড় করে উঠল ঘুম ছেড়ে, লছ্মী তখন মড়ার মত ঘুমচ্ছে। তার বাচ্চাটা চারহাতপা তুলে খেলা করছে আপন মনে।

প্রায় ছুট লাগাল ব্রজেশ। একে সারারাত ঘুমোয়নি, তার ওপর একটু পরিষ্কার হবার সময় পেলনা। চোখে মুখে দু-ঝাপটা জল দিল। মুখ না পুছে, মাথা না আঁচড়ে সুষমার কাহিনীতে উপনায়িকার ভূমিকা শুনতে মহুয়ার সীমারেখার উদ্দেশ্যে ছুট লাগাল।

দূর থেকে দেখতে পেল সুষমাকে। পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। মহুয়া গাছটার তলায়। ও কি করছেন? দূর থেকে সুষমাকে নিরীক্ষা করে বিস্মিত হ'ল ব্রজেশ।

বাচ্চা দুটো এই মাত্র মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। কালো পথের ওপর দু-তিনটে শ্বেতবিন্দু সুষমাকে লুব্ধ করেছিল। জুতো দিয়ে অল্প অল্প করে সেগুলোকে পেষণ করছিলেন তিনি। সূর্য তখনও পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে। সুষমা সময় কাটাচ্ছিলেন।

ব্রজেশকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। বুঝতে পারছিলেন, তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয়। বেচারা দুর্বলচিত্ত মানুষ, আঘাত পেলে ককিয়ে কাঁদে, আনন্দে অট্টহাস্য করে, রাগলে গলার শির ফুলিয়ে চেঁচায়।

ব্রজেশ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অমার্জিত চেহারাটা মনের অবস্থার প্রতিচ্ছবি। সুষমার পায়ের নীচে তখনও শেষ মহুয়াটা পিষ্ট হচ্ছে। কালো পথের ওপর তার শেষ অস্তিত্বটা লোপ পাচ্ছিল। ব্রজেশের অশান্ত মন সুষমার এই পায়ের নীচে মহুয়া নিষ্পেষণের সঙ্গে উপনায়িকার ভূমিকার একটা যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করল। সফল হ'লনা। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ নিজেকে বড় অবোধ বড় অনভিজ্ঞ বিবেচনা করে বসল ব্রজেশ। উনি কি আরও মহুয়া—, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে

সুষমার পায়ের গতি নিরীক্ষণ করতে লাগল ব্রজেশ। বিক্ষিপ্ত মন দ্রুত এক সমস্যা থেকে অন্যতে ছুটে বেড়াচ্ছে। রিণার বই বদল হয়নি ছ'দিন, মৌলবী সাহেব দীর্ঘ দিনের জন্য আজমীর শরীফ যাচ্ছেন, পল্লব মিত্র যদি না হন—তবে— হাসপাতালের ড্রাগ রিকুইজিশন্ স্লিপ্ ভরে পাঠাতে হবে পরশুর মধ্যেই। ব্রজেশে-র মনে হ'ল, জীবনে এত সমস্যায় সে আগে কখনও এমনভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি।

ব্রজেশের চোখে চোখ রেখে সুষমা হাসছিলেন। বললেন, গুড মর্নিং। কিন্তু মর্নিং-এর সূচনা তো এখনও হয়নি। এস আমরা সূর্য উঠা দেখি।

মাঠের মধ্যে দিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত সুষমা হাঁটছেন। একপাশে পেকিনিজ রক্। অন্যপাশে ডাক্তার ব্রজেশ। দিগন্তের গিরিরেখায় বর্ণোজ্জ্বল আলোকের স্পর্শ লেগেছে।

মাঠের প্রান্তে কিছু পাথরের স্তূপ ছিল। সুষমা গিয়ে বসলেন একটা পাথরের ওপর। ব্রজেশ বসল অন্য আর একটায়। পাশ দিয়ে একটা নালা চলে গেছে। বর্ষার জল বহন করে। এখন সম্পূর্ণ শুক্‌নো। নালাটা বালি আর পাথরে ভরা।

সুষমার মুখমণ্ডলে ভোরের অরুণাভা পড়েছে। তাতে রূপের উগ্রতা প্রকট হয়েছে আরও। ব্রজেশ জানেনা, বিশ বছর আগে এই মুখ পল্লব মিত্রকে বিভ্রান্ত করেছিল। আজ ভোরে এই উপনায়িকার এপিসোড্ শোনার তাই এমন যোগাযোগ।

সুষমা উদয়াচলের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন, ভোর বড় সুন্দর, না! সব আরম্ভই এমনি ভোরের মত সুন্দর হয়। তোমায় যে গল্প বল্‌ছি, তার আরম্ভ অর্থাৎ বিশেষ করে যে ছবি আমি কল্পনা করি, তাও এমনি সুন্দর। দিদি আর পল্লবদার একটা বড় মজার অভ্যেস ছিল। পল্লবদা যখনই আমাদের বাড়ী আসত দিদি তাকে কিছু না কিছু খাওয়াতো। আমি বরাবর লক্ষ্য করতাম, কোন কিছুই ওরা ভাগ না করে খেতে পারতনা। একটুকরো মিষ্টি দুভাগে ভাগ করত দিদি। একটুক্‌রো তুলে দিত পল্লবদার মুখে, অন্যটা নিজে খেত। পল্লবদা নিজেও ঠিক তাই করতেন। এটা যেন ক্রমে একটা অঙ্গীকারে দাঁড়িয়ে গেছিল। পড়াশোনায় বিশেষ মন ছিল না দিদির। স্কুলে যা রান্না শিখত বাড়ীতে রেঁধে রাখত পল্লবদার জন্যে। কতদিন নিজের হাতে খাইয়ে দিতে দেখেছি। ছেলেমানুষী খেয়ালে অসভ্যতাও কম করত না।

আমার সামনেই একটুকরো চকলেটের দুদিক দুজনে একসঙ্গে কামড়ে ধরত। সেটাকে দাঁতে কেটে বিচ্ছিন্ন করতে সময় নিত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। দিদি আমায় বলত, 'তুই কি দেখছিস' ? যা ভাগ্, 'ব্যাঙের ছবি আঁক্‌গে'। দেখ ব্রজেশ, আমার জীবনে আজ এত রুক্ষতা, অথচ সে সব দিনের কথা ভাবলে, মনে পড়লে কত ভাল লাগে। জান, সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, দিদি ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে আছে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। কি ভাবছিল আমি জানিনা। আমি এই ভেবে খুশী হলাম, দিদি হয়ত মাঝখানের সব অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে পৌঁছেছে সেইখানে, তার পেয়ে হারান সেই তীর্থে। দিদি জানেনা, পল্লবদা আজ ব্যাভিচারের নেশার সব পশ্চাৎতাপ ভোলার চেষ্টায় আছেন। কেন এমন হয় বলতে পার ?

ব্রজেশ নিরুত্তর। সুষমা যেন কিছু সঙ্কোচে কিছু দ্বিধায় বিসংবাদ সাপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করছেন, এইভাবে আরম্ভ করলেন, আমার ধারণা, ভালবাসা যেখানে সার্থক, নারী খোঁজে তার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তোমরা দেখ পুরুষাকারের হার বা জিত্। তাই সেখানে ব্যর্থতা, নারীর বেদনা বোধটা বিচ্ছিন্ন। এমন মর্মান্তিকভাবে পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে যুক্ত নয়—যেমন কিনা পল্লবদার ক্ষেত্রে।

—অদ্ভুত, অভিভূত মন্তব্য করল ব্রজেশ।

—সত্যিই তাই। আজ মনে হয়, যেমন ওরা সব কিছু ভাগ করে নিত, রিণাকে কেন নিতে পারল না।

—পল্লববাবু বুঝি রাজী হননি।

—হ্যাঁ, হয়েছিলেন। দিদি তো আমার কাছে সব কথা প্রকাশ করেনি। আমিও তাই তোমারই মত সরল বিশ্বাসে পল্লবদাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম। দিদির সমস্যা নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম।

—কি হ'ল ?

—পল্লবদা সব শুনলেন। আঘাত কতটুকু পেয়েছিলেন বোঝার চেষ্টা করিনি। আমি তখন সবে মেডিকেল পাশ করে বেরিয়েছি, পল্লবদা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন ছ'বছর আগে। চাকরী করছেন। সে যাক্, ওঁর সঙ্গে কথা হ'ল। যখন বুঝলাম ওঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ভিত্তিহীন, ছুটে পালিয়ে আসতে গেছিলাম আমি। পল্লবদা আমার হাতদুটো চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি আমায় যা করতে বল আমি করতে রাজী

আছি সুষমা। কিন্তু তোমার দিদিকে আমি চিনি, ওকে তুমি রাজী করাতে পারবে না।

সুষমা উদয়াচলের পানে চেয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মুখের রঙের সঙ্গে আকাশের রঙ মিলেছে।

সুষমা বুঝতে পারছিলেন, ব্রজেশ তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টিতে মুগ্ধ বিমূঢ়তা। হয়ত বা ভাবছে, না জানি বিশ বছর আগে এ মুখ কত সুন্দর ছিল। হয়ত রিণার মুখের সঙ্গে মিল অমিল খুঁজছে।

—দিদিকে রাজী করাতে পারলাম না ব্রজেশ। ও ছিল মনে প্রাণে পরিপূর্ণ নারী। জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে ও এসেছে আবেগের ধর্মে, যুক্তির ধর্মে নয়। আমি জানিনা কোন্ দুর্বল মুহূর্তে এইভাবে ও হশ্‌মত কামালের ঋণ শোধ করেছিল। মৌলবী সাহেবের মুখে একটা কথা শুনেছি, প্রতিহিংসার উর্দু প্রতিশব্দ—ইন্তকাম। হশ্‌মত জেল থেকে বেরিয়ে যখন সাত দোরে ঠোক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে তখন দেখল দিদি আর পল্লবদার প্রণয়লীলা। যেন সেই ঘটনা, যা ওর জীবনে এনেছে চরম লাঞ্ছনা, দিদি আর পল্লব মিত্র—যারা যথার্থভাবে দায়ী—তাদের জন্য গড়ে তুলেছে ধরার স্বর্গ। ইন্তকাম শব্দটা তাই মনে পড়ে। হশ্‌মত কামাল সেই স্বর্গের কাঁচা ভিত্ ধ্বংস করে গেল কোন সুযোগে জানা সম্ভব ছিল না। তবে অনুমানে ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই। লাতেহার আসার আগে সমস্ত পুরুষজাত আর সমস্ত মুসলমান দুচোখের বিষ ছিল আমার। এখানে এসে তোমায় দেখলাম, এখানেই দেখলাম মৌলবী সাহেবকে। আশ্চর্য, এই নগণ্য লাতেহার আমায় এতবড় দুটো ব্যতিক্রম দেখাল। যাক্, দিদি এই কাণ্ড বাধাবার ঠিক পরেই আমি হয়ত আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেলাম।

—আপনি!

সুষমার বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে। যেন কাহিনীর এমন এক অধ্যায়ে এসে পৌচেছেন যেখানে বর্ণনা করতে হবে চরম লজ্জাকর কিছু। এ লজ্জা তাঁর নিজের নয়, দিদির, পল্লবদার, রিণার কারুর নয়। এ লজ্জা পরাভূত এক আদর্শের, ভূলুণ্ঠিত এক মহীরুহের—যার ওপর চক্রাকারে ওড়া নীড়হারা বিহঙ্গের ব্যর্থ কাকলী হতাশায় মূক হয়েছে হঠাৎ।

পিতা ডাঃ সুধীরঞ্জন সান্যাল। মাতৃহীনা সুষমার চেতনার দিগন্ত জোড়া এক পুরুষ। বিশালতাই যাঁর পরিচয়। যেন কষ্টে উচ্চারণ করতে আরম্ভ

করলেন সুষমা, বাবা দেশে ছিলেন না। স্টক্‌হোমে সে বছর ক্যান্সার কংগ্রেস হচ্ছিল। বাবার পেপার পড়ার কথা। আমাদের পিক্‌চর পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সেবার কংগ্রেসে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হবার খবর। আমি সবে মেডিকেল পাশ করেছি। দীক্ষা নিয়েছি বাবার মন্ত্রে। মনের মধ্যে তাঁর যে আসন তা জন্মদাতার নয়, তা ছিল গুরুদেবের। সেবার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ইউরোপে থেকে দেশে ফিরলেন বাবা। সঙ্গে নিয়ে এলেন এক সুইডিশ্‌ মহিলাকে—স্টক্‌হোমের চার্চে যাঁকে তিনি বিয়ে করেছেন খৃষ্টান পদ্ধতিতে। এ ঘটনা ঘটল মা মারা যাবার বারো বছর পর। ব্রজেশ, তোমায় অনুরোধ করছি, এ বিষয়ে আমার মনোভাব এর চাইতে আর বেশী জানতে চেয়োনা। আমি হয়ত সামলাতে পারব না। দেশে ফেরার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে বাবা আবার ইউরোপ ফিরে গেলেন। ওখানকার কোন এক ড্রাগ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের সঙ্গে তাঁর নাকি তিনবছরের এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল। দিদির দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পাননি বাবা। রিণা তখন সাড়ে তিন মাসের।

—আপনার বাবা সুইজারল্যাণ্ডে মারা যান ?

—জুরিখে। অনেকের ধারণা আত্মহত্যা করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিয়ের একবছর পরই ছেড়ে যান বাবাকে। শুনেছি ওঁর থিওরিও নাকি ফেল করে। বাবার মৃত্যু বা অন্ত্যেষ্টির বিষয় আমরা সঠিক কিছুই জানিনা। এ কথা থাক। আমরা আমাদের গল্পের বড় ডেলিকেট জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমাদের তখনকার অবস্থাটা বিবেচনা কর। আমার তখনও চাকরী হয়নি। বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা বাবা ট্রাস্টিদের কি বুঝিয়ে গেছিলেন কিছুই বিচার করার মত জ্ঞানবুদ্ধি আমাদের ছিল না। আমরা প্রায় অভিভাবকহীন। দিদির ওই অবস্থা। আমি আর পল্লবদা ওর জেদ ভাঙ্গাবার জন্য যা কিছু করা সম্ভব করেছিলাম। কিন্তু গোঁড়া নিম্নশিক্ষিত মনের জেদ ভরা ছিল ওর সিদ্ধান্তে। ওকে কোন সুযুক্তি দিয়ে ইমপ্রেস্‌ করি এ ছিল অসাধ্য। চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি আর পল্লবদা। আমাদের যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সে এই থেকেই। তারপর, জান ব্রজেশ, আমার জীবনের চরম লজ্জা, ক্রমে বুঝতে পারলাম, পল্লবদা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। দিদিকে ভোলবার ছলনায় আমার সান্নিধ্য পেতে চান।

—তারপর।

—বেশী আর কি বলব বল। জীবন জোড়া দুঃখ ছিল আমাদের সবাইকার কপালে। তাই এমন মতিভ্রম হ'ল পল্লবদার। আমার তখনকার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারছ। পল্লবদার সঙ্গে সোজাসুজি দুর্ব্যবহার করার সাহস পাইনি। আর তাছাড়া, আমাদের মেয়েদের দোষ কি জান, পুরুষের লোভ ঠিক যতক্ষণ চরমে গিয়ে না পৌঁছয়, আমরা তাদের মোটামুটি প্রশ্রয় দিয়ে যাই। একথাটা পরে বিচার করে বুঝেছি। সে যাই হোক, তখন ওই অবস্থা, ভরসা করব এমন একটা পুরুষকে প্রয়োজন আমাদের ছিলই। তাই নিছক দায়ে পড়ে পল্লবদার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে যাচ্ছি। আর ওঁর লোভে সেটা ঘৃতাহুতির মত কাজ করছে।

—কি হ'ল? শঙ্কিত প্রশ্ন করল ব্রজেশ।

—যা হবার তাই হ'ল একদিন। দিদির চোখে ধরা পড়ল পল্লবদার লোভ। আমায় ঘরে একলা পেয়ে সিনেমার নায়কের মত প্রেম নিবেদন করতে বসেছিলেন। তাঁর আকুতির মধ্যে আমার প্রতি দুর্বলতার যাতনা প্রকাশ্য ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দিদি তাঁকে কত আঘাত দিয়েছে তারই রোদনভরা অভিযোগ। সে এক বিশ্রী নাটক। আমি বাধা দেব কি! আমার তখন সেই যাকে বলে সসেমিরা, সেই অবস্থা। হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিলাম। পাশের ঘরে পর্দার আড়াল থেকে দিদি সব শুনল। সেই পর্দা আঁকড়ে ধরেই মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল। রিণা তখন সাতমাসের। দিদির এই পড়ে গিয়ে পেটে আঘাত লাগা থেকেই রিণার অমন পঙ্গু পা। তারপর কি হল কল্পনা করতে পার?

—বলুন।

—দিদি উঠে পড়ে লাগলেন পল্লবদার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। শুনলে তুমি অবাক হবে, পল্লবদা ওই অবস্থায় উপযাচক হয়ে দিদিকে ধরেছিলেন এটা সম্ভব করাতে। আজও চিন্তা করলে ঘৃণায় ধিক্কারে মন রিরি করে ওঠে আমার। তোমায় প্রশ্ন করছি, যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, এমন কিছু সমর্থন করতে পার?

—সেকথা আলাদা, তবে আপনার দিদি ত' ত্যাগের পথই ধরেছিলেন।

—না ব্রজেশ। তুমি যা ভাবছ তা নয়। এরজন্য আরও ব্যাপক আরও সংস্কারমুক্ত বিশ্লেষণ চাই। ত্যাগ ক্ষমা সহিষ্ণুতা, এত সহজসাধ্য নয়। যা সৃষ্টির সবচেয়ে নিখাদ সবচেয়ে খাঁটী, সেই হীরেই আবার সবচেয়ে কঠিন। উপমা

দিয়ে সত্যের প্রমাণ হয়না জানি, তবে দিদির সেদিনের সিদ্ধান্ত, যা শুধুমাত্র তার মনের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষে জন্ম নিয়েছিল, তা যে খাঁটী ছিলনা, এ সব সন্দেহের অতীত। অনেক সস্তা নাটক নভেল পড়া ছিল, আবেগে গদ্‌গদ্ সিনেমা অনেক দেখা ছিল, তাই পেরেছিল এমন একটা নাটকীয় সিদ্ধান্তে আসতে। তুলনা করতে গেলে রূপগুণ সবই অনেক বেশী ছিল আমার। তাই পল্লবদার প্রলাপের যতটুকু কানে গেছিল তাতে সারা অন্তরাত্মা জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেছিল দিদির। ত্যাগ যা করতে চাইছিল তা সেই প্রতিক্রিয়ার ফল, তার মধ্যে দৃঢ়তা বা আন্তরিকতা কিছু ছিলনা। আর একটা দিক আছে। হশ্‌মত কামালের ক্ষেত্রে যেমন নিজেকে করেছিল, পল্লবদার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ঋণ শোধের কড়ি হিসেবে। সে ঋণ আজও শোধ হয়নি। তুমি এতদিনে সবই লক্ষ্য করে থাকবে, আমি আজও দিদির ক্ষমা পেলাম না।

—আপনি কি করলেন ?

—সে আর এক নাটক। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম পল্লবদাকে শেষ পর্যন্ত। তবু এ নাটক এখানেই থামেনি। পল্লবদা নিজের বাড়ী থেকে গুরুজনস্থানীয়দের নিযুক্ত করেছিলেন রীতিমতো সামাজিক প্রথায় সম্বন্ধ পাতিয়ে বিয়েটাকে সম্ভব করতে। তোমায় বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, ওঁর এই পাগলামোর সূত্রপাত কিভাবে জান ? একদিন কোন এক সুযোগে আমার দেহটাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন দুচোখ ভরে। আমায় আবার তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন কবিত্ব করে। হয়ত সেই থেকে জীবনের সব এথিক্স্-এর উর্দ্ধে আমার নগ্ন দেহই ওঁর চেতনায় সব জুড়ে স্থান পেয়েছিল।

ক্ষোভ. বিদ্বেষ, উত্তেজনা, আত্মধিক্কার—ব্রজেশ বুঝবার চেষ্টা করছিল, সুষমার লোহিত মুখশ্রীতে আর কি কি মূর্ত হয়েছে। সুষমা কিছুক্ষণ সেই উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করলেন। চুপ করে রইল ব্রজেশ। সুষমা আবার বলতে আরম্ভ করলেন। —সেই থেকে তোমাদের ঘেন্না করি, সমস্ত পুরুষ জাতটাকে। তোমাকে জানতে ইচ্ছে হয়। বামুনের ছেলে তুমি, মুরগীর মাংসে এত লোভ, আমাদের মাংসে লোভ হয়না ?

—ছি ছি, কি বলছেন আপনি ? সবাই কি এক রকম ?

—এক তোমাকেই ব্যতিক্রম দেখলাম। প্রতি শত কজন তোমার মত বলতে পার ?

—এ আমার গৌরব। তবু বলব, আমার মত অনেক আছে, আপনি যদি বিশ্বাস ফিরে পান, আবার গোড়া থেকে বিচার করবেন।

—তার আর সময় হবে না। অস্বীকার করব না, ক্রমে বুঝতে পারছি, এর অনেকটাই প্রতিক্রিয়াজনিত। আসলে কি হয় জান, ঘা খেয়ে যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে যায় সে পৃথিবীকে সেইভাবেই বিচার করে। তুমি তো দেখেছ, আমার বেলায় যে মনোভাব স্বাধীন মুক্ত, দিদির বেলায় তাই আবার অব্যক্ত, মূক। রিণা জন্মাল নষ্ট পা নিয়ে। একে মেয়ে তায় পঙ্গু, আমাকে ছেড়ে যে ভবিষ্যতে ছেলের আশ্রয় নেবে সে আশাটুকুও গেল। এই যে নিজেকে আমার অনুগৃহীতা বলে মনে করতে আরম্ভ করল এইতেই আরও মন ভাঙ্গল দিদির। আরও একটা কারণ, পল্লবদার যে ঘর দিদি ভেঙ্গে ছিল, ভেবেছিল আমি তা গড়ে তুলে ওর পাপক্ষয় করব। তা তো আমি পারলাম না। দিদির কাছে এও এক পাষাণভার।

—বাবার সম্পত্তি আপনারা কিছু—

—না, ব্রজেশ। ট্রাস্টি হিসেবে নিজের এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে বাবা সব দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন। আমরা তাঁকে পিতৃস্থানীয় বলেই জানতাম। সোজাসুজি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতন সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই আমার হাতে নেই। তবু আমার স্বভাবগত পুরুষবিদ্বেষে তাঁকে আমি ছোবলাব এ ভয় আমার আছে। ফিকস্‌ড্‌ ডিপোজিটে আমাদের দুবোনের নামে সামান্য কয়েক হাজার টাকা ছাড়া বাবা নাকি সবই লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন এক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের নামে—বাবার সেই বন্ধু যার ডাইরেক্টর ছিলেন। তোমাকে যে গল্প বলছি, তাতে অর্থনৈতিক দায়ে আমার ওপর দিদির নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর এ ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। তারপর থেকে আমাদের নতুন জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। আমি দিদির দুচোখের বিষ, রিণা আমার স্নেহের দুলালী, ওরা দুজনেই প্রায় পঙ্গু, আর আমার দেহে তখন রূপ আর যৌবনের জোয়ার এসেছে। এরপর পনেরোটা বছর, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চাকরী নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। ওরা বরাবর আমার সঙ্গেই থেকেছে। আমার কোথাও পসার জমার প্রশ্নই ওঠেনি। বাড়ী গাড়ী আর যা কিছু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করা টাকা, ব্যাংকের টাকা, আর আমার উপার্জিত যৎসামান্য, এসবের কিছুই সঞ্চয়ে থাকেনি। ওদের চিকিৎসার খরচের কথা বাদ দিলেও, কৃচ্ছসাধন আমাদের কখনও করা ছিল না, তাই ক্রমে সব ফুরিয়েছে।

—কোথায় কোথায় ছিলেন আপনি ?

—না ব্রজেশ, আমি অনুরোধ করছি আমাকে আমার গল্পের এই অংশটুকু সংক্ষিপ্ত করতে দাও। কোথায় কোথায় ছিলাম তার চেয়ে কি ভাবে ছিলাম তা বড় কথা। আমি জানি আমি রূপসী। বিশ বছর আগে আরও রূপ ছিল আমার। তোমাদের রূপোন্মত্ততা আমায় পনেরো বছর তাড়িয়ে বেরিয়েছে। আগুন আমি নিজের হাতে হয়ত লাগাইনি। কিন্তু দগ্ধ অর্ধদগ্ধ ভস্মীভূত যত ছবি স্মরণে আনতে পারি সব আজ আমার বিচার চায়। তিল তিল করে অপরাধের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় খাড়া হয়েছে। কত তরুণ ডাক্তারের প্র্যাক্‌টিশের উদ্যম নষ্ট করেছি, কত প্রৌঢ় সার্জন-এর পারিবারিক শান্তি তছ্‌নছ্‌ করেছি, হিসেব রাখিনি—কত শুদ্ধ ভালবাসা পায়ে দলেছি, অবহেলে। সবচেয়ে ট্র্যাজেডি হয়েছে দীঘায়। সমুদ্র বড় ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম থাকব। তারপর সেখানেও—, ঠিক তোমারই মতন একজন তরুণ ডাক্তার—, সদ্য এফ.আর.সি.এস. পাশ করে ফিরেছে—, শেষ পর্যন্ত—বিষ, জ্ঞান বিষ, কারবোলিক আসিড—, উঃ, সে দৃশ্য ভোলা যায় না। তুমি, তুমি কেন ব্রজেশ আরও অনেক বছর আগে আমার কাছে আসনি ? তোমার মত একটা ব্যতিক্রম হয়ত প্রয়োজন ছিল। আমায় তুমি দেখছ, আমি কাঁদছি ?

নির্বাক বিস্ময়ে তাই লক্ষ্য করছিল ব্রজেশ। ডাঃ সুষমা সান্যালের দুর্লভ দুবিন্দু অশ্রুতে ভোরের সূর্য প্রতিফলিত হয়েছে। যেন বাক্‌রোধ হয়েছে ব্রজেশের, চেষ্টা সত্ত্বেও স্বর ফুটল না গলায়। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে পূবের আকাশে। বিষাদে তিক্ত হয়ে গেছে মন তার। পূর্বাচলের আবির উৎসব লক্ষ্য করছিল। গতকাল এই পৃথিবী তার চোখে এত অপরূপ ছিল, আজ প্রসাধনের এই বাহারের আড়ালে অপরিচয়ের এত কুশ্রীতা যেন প্রথম বিমূর্ত হ'ল।

—রক্, রক্।

চমকিত হ'ল ব্রজেশ। টের পায়নি, সুষমা পাশ থেকে কখন উঠে গেছেন। একটা উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ঘুরছেন চারপাশে। ডাক দিচ্ছেন, রক্—রক্…।

চারিদিকের ছোট বড় পাথরের মাঝখানে ছোট্ট এতটুকু পেকিনিজ তাঁর কোথায় হারিয়ে গেছে।

—রক্, রক্। ব্রজেশ নিজেও উঠে দাঁড়াল। তার কণ্ঠস্বরেও উদ্বেগ।

—রক্, রক্, রক্। সুষমার কণ্ঠস্বরে যেন কান্নার কাঁপন লেগেছে।

বেশীদূর যায়নি রক্। ডাক শুনতে পেয়েই বেরিয়ে এসেছে। ছোট ছোট পাথরের ফাঁক দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে। সুষমা দেখতে পাওয়া মাত্র অস্থির হলেন। উঁচু পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন নীচে। টলতে টলতে ছুটলেন পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে।

ব্রজেশ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে লক্ষ্য করছে। রকের ছুটে আসা, দেখতে পেয়েছে সেও।

সুষমা রক্‌কে দুহাতে তুলে নিয়ে মুখের ওপর চেপে ধরলেন। ভোরের নরম রোদ পড়েছে ওদের গায়ে। দূরে দাঁড়িয়ে ব্রজেশ বুঝতে পারলনা, পেকিনিজের গুচ্ছ গুচ্ছ লোম ডাঃ সুষমা সান্যালের অবাধ্য অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল।

•

লছ্‌মী আর তার বাচ্চা ফিরে গেল। ব্রজেশ নিজেই পাটনায় রেখে এল তাদের। ছুটি পায়নি। এমনিই চলে গেল। সুষমা ওকে ফরাসী পদ্ধতিতে ছুটি নেওয়া বোঝালেন। বললেন, একটা দিনের ত ব্যাপার চলে যাও। কুছ পরোয়া নেই।

গেঁয়ো মেয়ে লছ্‌মী যাবার আগে তাঁর কাছে রিণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেল। বেশ একটা আহ্লাদে গদ্‌গদ্ ভাব করে সুষমাকে বোঝাল, রিণাকে তার ভারি ভাল লেগেছে। সম্ভব হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেত। থাকত দুবোনের মত।

লছ্‌মীর উচ্ছ্বাস শুনে সুষমা প্রসন্নতার ভাণ করলেন। এ বললেন না, আবার এসো, আরও দুদিন থেকে গেলেই ত' পারতে, বা ওই ধরনের কোন সৌজন্যজ্ঞাপক কথা। ছেলেকে দু-একটা ওষুধ খাওয়াতে বললেন। লিখে দিলেন, শুধু মাত্র ভুলে যাবার জন্যই লছ্‌মী কাগজটা সঙ্গে রাখল।

ওরা যেকদিন ছিল রিণাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হয়েছিল। ওই কুৎসিত গেঁয়ো মেয়ে আর কাঁদুনে বাচ্চাটার মধ্যে কি পেয়েছিল রিণাই জানে। প্রায় অসাধ্য একটা সেতুবন্ধনের দায়িত্ব নেবে লছ্‌মী এমন দুরাশা নিশ্চয় স্থান পায়নি রিণার মনে। পঙ্গু পাটার কথা না হয় অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু লছ্‌মী কি ওর জন্ম রহস্যের হদিশ পাবে না। ওদের অন্তরঙ্গতার সূত্রে শক্ত একটা জট পাকিয়েছেন সুষমা। ওঁর বিবেচনায় এ জটের প্রয়োজন ছিল।

হাসপাতালের কামরায় বসে এই সব চিন্তা করেছিলেন সুষমা। কোয়ার্টারের

ঘরে মৌলবী সাহেব তখন দিদির কাছে ইসলাম ধর্মে মনোথিইজমের মহত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। ব্রজেশ ছিল না। দিদি আর রিণা একাগ্র হয়ে শুনছে তার কথা। সুষমা কতকগুলো নতুন পুরোণ জার্ণাল নিয়ে হাসপাতালের কামরায় বসেছিলেন।

সেদিনকার ভোরের কথা মনে পড়ল। ফেরার পথে কাঁচা মাল ব্রজেশ সারস্বত বড়.কঠিন অভিযোগ এনেছিল। বলেছিল, একটা কথা বুঝতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন, কুড়ি বছর আগে আপনি এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনার কি মনে হয় না, সে ভুল আপনি আজ আবার করলেন ?

—তুমি বলতে কি চাও ?

—রিণাকে আপনি কতখানি ভালবাসেন সে নিয়ে তর্ক আমি করব না। বলেছিলেন, জীবনে কিছু ফাঁকি আপনি স্বীকার করে নিতে রাজী আছেন। তাই মনে করি, আমাকে এ গল্প এত অকপটে শোনবার জাস্‌টিফিকেসন্ হয়না।

মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুষমা। কিছুক্ষণ করুণায় কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন ব্রজেশের চোখের দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, ব্রজেশ, তুমি একটা অপদার্থ। চেষ্টা কর, মানুষ হও।

ছুটির দরখাস্ত করাই ছিল। লছ্‌মীকে পৌছে একদিন পরই ফিরে এল ব্রজেশ। সুষমা তাকে দরখাস্তের জবাবটা দিলেন। সিভিল সার্জন ছুটি মঞ্জুর করেছেন। ব্রজেশ জানাল, একদিন তাকে হাতে পেয়ে মা বাবা ভয়ানক রাগারাগি করেছেন। বলেছেন, ছুটি যদি না পায় যেন ইস্তফা দিয়ে চলে আসে।

শুনে সুষমা কপট শঙ্কায় দুচোখ বিস্ফারিত করলেন। ব্রজেশ বুঝলনা তাঁর সে দৃষ্টিতে কৌতুকের চেয়ে বিদ্রূপ বেশী ছিল। ব্রজেশ সারস্বতের বাবা মা তাঁদের যোগ্য কথাই বলেছেন।

ছুটি পুরো এক সপ্তাহের। মাঝখানে আর তিনদিন বাকী আছে। ব্রজেশ না থাকলে কাজের চাপ বাড়বে। সুষমা তার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তারপর একটা দিন কেটে গেছে। সেদিন শনিবার। ব্রজেশ কাল চলে যাবে। এ কদিন একবারও আসেনি বাড়ীতে।

সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে ফিরলেন সুষমা। রিণার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরে আলো জ্বলছে। কেরোসিন কুপীর ফ্যানটাও চালিয়ে দিয়ে গেছে রুক্মী। রিণা চৌকির ওপর বসে সেতারের তারে এলোমেলো আঙুল বোলাচ্ছে।

সুষমা ঢুকতেই রিণা চোখ তুলে চাইল। সুষমা প্রশ্ন করলেন,—ব্রজেশ এসেছিল ?

—না, আসবে কি ? রিণার মুখে হাসি। সুষমা দেখলেন, সে হাসিতে কষ্টকৃত কৌতুক প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

—হাসছিস যে। মাছটার কি হল ?

—রুক্মিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আবার হাসল রিণা।

—কি হয়েছে ? এত হাসি।

—খুব মজা হয়েছে।

—রিণা !

সুষমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় বিচলিত হলনা রিণা, বলল, দেখবে, এই দেখ।

সুষমা দেখলেন চৌকির ওপর থেকে একখণ্ড কাগজ তুলে নিল রিণা। লীলায়িত ভঙ্গীমায় উড়িয়ে দিল সেটাকে। কেরোসিন কুপীর ফ্যানের হাওয়ায় কাগজটা কয়েক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াল। তারপর সুষমার পায়ের কাছে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

সুষমা কিছুক্ষণ রিণার দিকে চেয়ে রইলেন। এ কোন রিণা ?

সেতারের তারের ওপর এলোমেলো ভাবে আঙ্গুল চালাচ্ছে রিণা। হাসছে সেই সঙ্গে। হাসির গমকে অশ্লীল ছন্দ তুলেছে ঊর্দ্ধাঙ্গে। উচ্ছল হাসির সঙ্গে তারের ঝঙ্কারে উচ্ছৃঙ্খল শব্দ উঠছে ছোট ঘরটায়। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাগজের টুকরোটা তুলে নিলেন সুষমা। চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

বাঙলায় চিঠি লিখেছে ব্রজেশ সারস্বত। সুষমা পড়লেন।

রিণা,

আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। বউ আমার লছ্‌মির মতই একটা সাধারণ মেয়ে। পারবে তাকে তোমার মত করে দিতে ?

—ব্রজেশ।

রিণার বাচালতায় সমস্ত ঘর ঝন্‌ ঝন্‌ করছে। দেহের সমস্ত স্নায়ুতে অসহ্য চাপ পড়ছিল সুষমার।

—রিণা ! এত হাসি কিসের ?

—হাসবনা। উঃ। রিণা হাসতেই থাকল। হাসতে হাসতে বলল, বাবারে, কি ভীতু ডাক্তার তোমার। তোমায় জানায়নি। মাকে নয়, আমাকে

নয়—উনি চলেছেন বিয়ে করতে। ভয়ে নিজে আসেনি—না না, ভয়ে নয়, বোধহয় লজ্জায়। রুক্মিকে দিয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছে, আবার বাঙলায়। তুমি বলছ হাসব না। হাসবনা কোন দুঃখে? ও আবার কি বিয়ে করবে! হাসবনা—, হাসবনা—

সুষমা স্তব্ধ হয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। লক্ষ্য করছেন, রিণার চম্পাকলি আঙুলগুলো নিষ্ঠুরের মত সেতারের তারের ওপর আঘাত করছে। গমকে গমকে হাসি উপচে উঠছে রিণার। অসহ্য শব্দ উঠছে ঘরে। দুকানে হাত চাপা দিতে ইচ্ছে হল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন সুষমা, হঠাৎ মনে হল, এই মুহূর্তে এই বাচালতা বন্ধ করতে হবে। তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, রিণা, থামবে—

সুষমার কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিকতায় মুহূর্তে বেসামাল হল রিণা। একসঙ্গে তিনটে তার ছিঁড়ল সেতারের।

একি হল! সুষমার দিকে ফিরে তাকায়নি রিণা। সেতারের ছেঁড়া তারের ওপর তার বোবা দৃষ্টি আবদ্ধ। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

এই স্তব্ধতা, আর ছেঁড়া তারে আবদ্ধ রিণার ওই বোবা দৃষ্টি সুষমাকে যেন ঘর থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল। বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। হাসপাতালের অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন সুষমা। যেন নিজেকে গোপন করতে চান। দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। কানে তার শব্দ আসছে। আর চারিদিক থেকে সব প্রাণের স্পন্দন লুপ্ত হয়েছে।

অনেকরাত পর্যন্ত হাসপাতালের কামরায় বসে রইলেন সুষমা। ইন্‌ডোরে রুগী নেই। হাসপাতাল শূন্য। রাত গভীর হতে থাকল।

এগারোটা বাজল। আউটডোরের দেয়াল ঘড়ির প্রহর ঘোষিত হল। হাসপাতালের কামরাগুলোর অবরোধে সেই ধ্বনি-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত শুনলেন সুষমা।

বাইরে পালামৌর নিঝুম রাত। ঝিঁঝিঁর নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যতান শোনা যাচ্ছে। আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সুষমা। কৃষ্ণপক্ষের নিকষ কালো আঁধার ভেদ করে দৃষ্টি এগোলনা। শুধু গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকির লীলাচঞ্চল অঙ্গার

বিন্দু। একটি ছুটি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। বাতাস স্বচ্ছ, আর অন্ধকার এত নিবিড় বলে এই খদ্যোতদীপ্তি এত অস্বাভাবিক উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। পালামৌর বাইরে সুষমা এমন দেখেননি।

হাসপাতালের বারান্দায় স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন সুষমা। মনে আর কোথাও কোন চাঞ্চল্য অনুভব করছেন না। এই আঁধারে, এই স্তব্ধতায় সব তরঙ্গ শান্ত হয়েছে।

নিজেকে কেন্দ্র করে চারপাশে আঁধারের এই বিশালতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। তাঁর গায়ের রঙ পোশাকের শুভ্রতা এখন অদ্ভুত বৈশিষ্টময় হয়ে উঠেছে। একবার ভ্রম হল, তাঁকে ঘিরে এক ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই বিশ্বচরাচর বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। মনে হল, এই ঘনীভূত বিরাটের পায়ে মনের মহত্তম কামনাটুকুও আত্মদান করতে প্রস্তুত।

তারপর ক্রমে, মনে এক তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ জাগতে আরম্ভ করল। দিদি অনিমার বেদনা। দীঘার সেই তরুণ ডাক্তারের বেদনা। আর সবের ওপর, রিণার বেদনা। যেন সর্বতোভাবে সুষমাই দায়ী। অনেকের অনেক বেদনার ভার বহন করে এই আঁধারের ধর্মাধিকরণে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। নিকষ নীল চন্দ্রাতপ জুড়ে লক্ষ নক্ষত্রের স্বর্ণ দীপ্তি। সেই অসীমে ডুব দিলেন। দৃষ্টি শূন্যতার সীমা সন্ধান করছিল। যতদূর দৃশ্যমান তাও অতিক্রম করে অপরূপ কিছু আবিষ্কারের তৃষা।

সেই অপরূপ ধরা দিল। জ্যোতিষ্কের উর্দ্ধলোকে বিস্তীর্ণ ছায়াপথ। যেন দ্রবীভূত মহাপ্রাণ ওই সুদূরে ভাস্বর রজত ধারায় প্রবাহমান। সেই মহাসুন্দরের পানে নিস্পলক চেয়ে রইলেন সুষমা। নিজেকে নিয়ে এত তুচ্ছতাবোধ ইতিপূর্বে আর কখনও এমন সহজগ্রাহ্য মনে হয়নি তাঁর।

তারপর একসময় ওই পৃথিবীর বুকেই এক বিন্দু আলোর সন্ধান পেলেন সুষমা। দীপ জ্বলছে ব্রজেশ ডাক্তারের ঘরে। জানালা দিয়ে তার আলো দেখা যাচ্ছে। জেগে আছে ব্রজেশ।

সুষমা আবার হাসপাতালের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা শিশি বার করলেন। ব্রাণ্ডির শিশি। একটা ওষুধের গেলাসে ঢেলে প্রায় দেড় পেগ ব্রাণ্ডি খেলেন। ঠাণ্ডা জল খেলেন অনেকটা। হাসপাতালের সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বারান্দা থেকে মাঠে নেবে গেলেন।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ ধরে সুষমা হাঁটছেন। একটা মানুষ যেতে পারে এমনি সরু পথ। প্রতিটি পদক্ষেপ ঠিক পথের ওপর পড়ছে কিনা সুষমা তা' লক্ষ্য করছেন। এইভাবে ওই দেড়পেগ ব্রাণ্ডির প্রভুত্বকে উপেক্ষা করতে সচেষ্ট রইলেন। গিয়ে দাঁড়ালেন ব্রজেশ ডাক্তারের দীপালোকিত সেই জানালার সামনে।

টেবিলের সামনে নিষ্প্রাণ মূর্ত্তির মত বসে আছে ব্রজেশ। সামনে খাবার রেখে চলে গেছে চাকর। মাছের বাটিটা চিনতে পারলেন সুষমা। খায়নি কিছুই। হয়ত খাবেনা। সুষমা জানেন, মনের এমন অবস্থায় খেতে ওদের ভাল লাগেনা।

দুচোখ জুড়ে তন্দ্রা নেমে আসছে। মনে হল একটা অবলম্বন প্রয়োজন জানালার দুটো শিক নিরুদ্বেগে চেপে ধরলেন সুষমা। চোখ ফিরে যদি তাকায় ব্রজেশ ওঁকে সহজেই দেখতে পাবে।

এমনি সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিনের সন্ধ্যার সেই বিশ্রী ঘটনার পুণরাবৃত্তি হল। ঝরা পাতা আর রাঙা মাটির চূর্ণ ধূলো উড়িয়ে ঝড় এল হঠাৎ। সুষমাকে ঘিরেই বুঝি খামখেয়ালি ঘূর্ণী মাতাল ছন্দ তুলল। যেমন এসেছিল তেমনি অদৃশ্য হল হঠাৎ।

ঝড় এল আর ঝড় চলে গেল। চকিতে যেন বিপ্লব ঘটে গেল। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সুষমার মানসতন্ত্রে অভিনব এক সংবিধান গঠিত আর স্বীকৃত হল। কানে কানে যেন অমোঘ নির্দেশ জানিয়ে গেল ঝড়, নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটি ওই ব্রাহ্মণতনয়ের সঙ্গে আজ রাতেই একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া হওয়া চাই।

আশ্চর্য! ঝড় বয়ে গেছে, ব্রজেশ টের পায়নি। সেই আত্মগত ভাব, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা ছবির দিকে চেয়ে আছে। কার ছবি! রিণা কি ওকে কোন ছবি দিয়েছে? যে মুহূর্তে এই প্রশ্ন জেগেছে সুষমার মনে, ছবিটা টেবিল থেকে তুলে চোখের সামনে মেলে ধরল ব্রজেশ।

লণ্ঠনের পরিপূর্ণ আলো পড়েছে ছবিটার ওপর। পোস্টকার্ড সাইজের একটা পোট্রেট। নিমেষে প্রকট হল কার ছবি। রিণার নয়, এ ছবি তাঁর নিজের।

লোহার গরাদদুটো শক্ত মুঠিতে চেপে সুষমা দাঁড়িয়ে আছেন। সারা অঙ্গ দিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। মনে হল, ওই দেড় পেগ ব্রাণ্ডির অঙ্গার প্রবাহ সারা দেহের ধমনীতে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে। একি উত্তেজনা! সুষমা

কাঁপছেন। কপালে মুখে গলায় ঘন স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে। তবে কি! তবে কি! সমস্ত অন্তরাত্মা যেন আকুল হয়ে উঠেছে এই সংশয় থেকে উত্তীর্ণ হতে— পুরুষের ব্যতিক্রম ওই যে তরুণ, যাকে এতদিন শিবতুল্য বিবেচনা করে এসেছেন, সেও কি শেষাবধি নতজানু হয়ে সমর্পণ করেছে নিজেকে। মেলে দিয়েছে তার ভিক্ষার ঝুলি।

পরক্ষণেই এক আশ্চর্য করুণায় বিগলিত হতে আরম্ভ করল সুষমার মন। মনে হল, ওই তাপস ব্রাহ্মণ নৈরাশ্যের রিক্ততার বঞ্চনার বোঝা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। পল্লব মিত্রের বঞ্চনা, দীঘার সেই তরুণ ডাক্তারের বঞ্চনা, অনায়াসে আরও অনেকগুলো তরুণ মুখ বিধৃত হল কল্পনায়, তাদের সবাকার বেদনা। আজ হৃদয়ের নিভৃতে এই প্রথম এমন শূন্যতাবোধ জাগল।

দরজা ভেজান ছিল। চাকর চলে যাবার পর উঠে এসে খিল দেয়নি ব্রজেশ। পাল্লা খোলার শব্দে সচকিত হল। দেখল, সুষমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ছবিটা ব্রজেশ তখনও হাতে ধরে রয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এইভাবে সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে অনেকটা সময় কেটে গেল। এমন এক পরিস্থিতি যেন তাতে সম্ভাষণ বিনিময়ের প্রশ্ন ওঠেনা।

সুষমার তুহিন দৃষ্টি ব্রজেশকে নীরব থাকতে নির্দেশ দিল। লণ্ঠনের ময়লা আলো পড়েছে দীর্ঘ দেহবল্লরীতে। দরজার পাল্লা ভেজিয়ে সুষমা তার ওপর দেহভার রেখেছেন। তাঁর আর ব্রজেশের মাঝখানে জ্বলছে লণ্ঠনটা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছেন সুষমা। তাঁর দুচোখে সর্বনাশের আমন্ত্রণ পাঠ করল ব্রজেশ। মরণের পদধ্বনি শুনতে পেল তাঁর পদক্ষেপে! এতক্ষণে বুঝেছে, একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে এসেছেন সুষমা। তার সমস্ত বাস্তববোধের ঊর্দ্ধে অবিস্মরণীয় কিছু ঘটতে চলেছে। প্রায় বিহ্বল এমনি অবস্থায়, পলে পলে তারই প্রতীক্ষায় রইল ব্রজেশ। হৃৎপিণ্ডের গতি উদ্দাম হয়ে উঠছে তার। কি করবেন সুষমা! কি করবেন?

নিরানব্বুই প্রতিশত খাঁটি ব্রহ্মচারীর হতবুদ্ধি চেতনার সামনে নতুন এক দিগন্ত উন্মীলিত হল। সুষমা তাঁর অঙ্গ থেকে এক এক করে সব কটি আবরণ উন্মোচন করলেন। সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে মর্মর প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ব্রজেশ দেখল, সুষমার নির্মীলিত দুচোখে মায়ায় কুহকে আর্দ্র এক দুর্বার আমন্ত্রণ। তার দেহের সহস্র কোষে মরণের ডমরুধ্বনি বাজছে তখন।

আঁধার রাতের সবটুকু জ্যোতি সুষমাকে ঘিরেছে। স্বেদসিক্ত হেমতনু থেকে তরল বর্ণের মত আলো ঝরে পড়ছে।

মোহিনী সুষমা। তিলোত্তমা সুষমা। সেই কুমারী বক্ষ, ক্ষীণ কটি, স্ফীত জঘনার বিভ্রান্তকর সমন্বয়। বাইরের গহন আঁধারে ধ্বনিত সেই আদিম জিজ্ঞাসা। "স্ত্রাতোস্বাদা বিবৃত জঘনা: কো বিহাতুং সমর্থঃ"।

প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল ব্রজেশ, এ আপনি কি করছেন, আমি—, আমি যে আপনাকে দেবীর মত—।

পরমুহূর্তেই উন্মাদের মত বাইরের অন্ধকার মাঠে ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখতে পেলনা, বুঝতে পারল না, সুষমার হতচেতন দেহটা প্রায় সেই সঙ্গেই মেঝের ওপর ভেঙে লুটিয়ে পড়ল।

হাসপাতালের পাশে একটা গাছের গোড়ার ঘনতর অন্ধকারে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া হায়না। বিচিত্র দৃশ্য দেখছে হায়নাদুটো। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে ডাক্তার সুষমার অর্ধনগ্ন অচেতন দেহটাকে দুহাতে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ব্রজেশ সারস্বত।

তন্দ্রাহারা রিণাও এতরাতে দাঁড়িয়েছিল জানালার পাশে। কিছুক্ষণ ধরে হায়নাদুটোকে লক্ষ্য করছিল রিণা। তারপর যখন গাছের গোড়ার অন্ধকারে আর তাদের বোঝা গেল না, দৃষ্টি ফিরিয়ে ব্রজেশ আর সুষমাকে দেখতে পেল। অন্ধকারে এই বিচিত্র আকৃতি দেখে ভয় পেল সে। তারপর যখন ব্রজেশ ডাক্তার পায়ের জুতোর আঘাতে সদর দরজায় শব্দ তুলল, ক্রাচদুটোর সাহায্যে রিণাই এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে।

রিণার বোবা দৃষ্টির সামনে দিয়ে সুষমার অর্ধনগ্ন দেহটাকে বহন করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল ব্রজেশ। সন্তর্পণে পালং-এর ওপর শুইয়ে দিল সুষমাকে। যেমন এসেছিল তেমনি দৃঢ়তায় মাথা উঁচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক যাবার মুখে কঠিন নির্দেশ দিয়ে গেল, ওঁকে ঘুমোতে দাও।

শেষরাতে সুষমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কানে এল সেতারের সুর।

ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণ চোখ খুলে চেয়ে রইলেন। ক্রমে আবছা আবছা সব বোঝা যেতে লাগল। দেখলেন নিচে চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে

রিণা। সেতারটা শুইয়ে রেখেছে পাশে মাটির ওপর। শুয়ে শুয়ে তারগুলোর ওপর পরম স্নেহে আঙুল বোলাচ্ছে রিণা।

দীঘার সমুদ্রের কথা মনে পড়ল সুষমার। রিণার সেতারে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলেন।

এমনি কত তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যায়। রাত্রি শেষে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। মহুয়ার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি তিমির রাত্রিকে আলোকে অবগাহন করতে দেখেন সুষমা।

হাসপাতালে রুগীরা আসে। মদ্যপ রূপলাল আসে, স্বৈরিনী পচিয়া আসে, আসে বাতিকগ্রস্থ বুড়ি রুক্‌মিনি। মাঝেমাঝে এসে বসেন সর্বরোগাতীত আশ্চর্য মানুষ মৌলবীসাহেব। দাড়ী নেড়ে অমায়িক হেসে বলেন, বহন, যহাঁ জমানা রিওয়াজোঁ কা গুলামি করতা হ্যায়। করতা রহেগা। আপকা ফরেন্ যানা জরুরী থা।

ফরেন্ সুষমা যাননি। বাঁধা পড়েছেন লাতেহারের ছোট্ট এই সহরে। ইচ্ছে আছে নেতারহাটের পাহাড়চূড়ায় ছোট একটা বাড়ী করবেন। রিণা খুব সম্ভব এলাহাবাদ চলে যাবে মেয়েদের স্কুলে সেতারের মাষ্টারী করতে। সেতারে 'বিশারদ' পেয়েছে রিণা। আর দিদি! দিদিও এবার চলে যাবেন। টের পেয়েছেন সুষমা। বড় জোর আর একটা বছর। সুষমার প্রতি অন্তরভরা বিদ্বেষ নিয়ে এবার তাঁকে ওপারের যাত্রা করতে হবে।

ভোররাতে আর ঘুম আসেনি সুষমার। আজ অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। এখনও পথ প্রায় অন্ধকার। দুধারে কচিৎ কোথাও মাটির কুঁড়ে, খড়ের গোলা, ভাঙ্গা গরুর গাড়ী। সুষমা কিছুটা নিদ্রাচ্ছন্নের মত মহুয়ার সীমারেখার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কানে এখনও নিশান্তের সেই সুর ভাসছে। রিণার সেতারের সুর। দূরাগত কল্লোলধ্বনির মত ভেসে আসছে।

মহুয়ার সীমারেখায় গিয়ে থামলেন। চারধারে ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে।

গাছের নীচে দৃষ্টি ছড়ালেন সুষমা। গুটিকতক ফুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। মহুয়া ফুরিয়ে এসেছে।

পিচঢালা কালো পথের ওপর একটা মাত্র শ্বেতবিন্দু চোখে পড়ল সুষমার।

বড় অসহায় মনে হল যেন ফুলটাকে, পথের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটাকে কুড়োলেন। মুখের কাছে এনে ঘ্রাণ নিলেন। দুচোখ বুজে এল। অতটুকু ঘ্রাণেই নেশা ধরে গেল যেন।

পথের ধারে তাঁর প্রিয় ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন সুষমা। আজ হাতের মুঠোয় একটা মহুয়া ফুল আলতো করে ধরে আছেন। চোখ তুলে গাছের দিকে চাইলেন।

মহুয়ার পল্লবহীন শাখায় শাখায় আর একটি মুকুলিত বসন্তের সমাপ্তির ইঙ্গিত। প্রকৃতির শেষ বসন্তের দান তাঁর হাতের মুঠোর অবরোধে উষ্ণতার আশ্রয় পেয়েছে।

শাখায় শাখায় পরিক্রমা সেরে ক্লান্ত দৃষ্টি নেবে এল গাছের গোড়ায়। এতদূর এসেই হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

টের পাননি সুষমা। পালামৌর সেই দুটো বন্য শিশু কখন এসে দাঁড়িয়েছে গাছের গোড়ায়। হাতে ঝুড়ি। মহুয়া কুড়োতে এসেছে। দুজোড়া করুণ চোখে শঙ্কিত বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে সুষমার মুখের দিকে।

কি দেখছে ওরা! সুষমা বুঝতে পারেননি, আজ তিনি আবার কাঁদছেন। ওরা দেখতে পেয়েছে মেমডগদরের দুচোখে দু-বিন্দু অশ্রু। তাই অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছে। এতক্ষণে খেয়াল হল সুষমার, রক্ আজ সঙ্গে আসেনি। বাচ্চাদুটো তাই সাহস পেয়েছে কাছে আসার।

ঝাপ্সা চোখের দৃষ্টিতে সুষমা বাচ্চাদুটোর দিকে চেয়েছিলেন। আজ শুধু ব্যতিক্রমের দিন। হাতনেড়ে কাছে ডাকলেন তাদের। সুষমার চোখে আজ অশ্রু দেখেছে বাচ্চাদুটো। ওদের পরিচিত অশ্রু। আজ ওরা পারবে সুষমাকে বিশ্বাস করতে।

গুটি গুটি কাছে এগিয়ে এল। সুষমা ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন। মাথায় ওরা অনেক ছোট। উর্দ্ধপানে চেয়ে রয়েছে। সুষমা ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

হাতের মুঠো থেকে মহুয়াটা বার করলেন সুষমা। বাচ্চাদুটো উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করছে। মহুয়াটা সমান দুভাগে ভাগ করলেন। তারপর ডাঃ সুষমা সান্যাল অকৃত্রিম স্নেহে মহুয়ার দুটো খণ্ডিত অংশ বাচ্চাদুটোর নোংরা মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

একি হল! যেন সমস্ত কুবেরের ঐশ্বর্য্য ওদের সামনে তুলে দিয়েছেন সুষমা।

ভোরের নরম আলোয় ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। চকিতে পরস্পরের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। চাপা আনন্দের প্রকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটো বন্য মুখ। তারপর মহুয়ার টুকরো দুটো মুখে নিয়ে ছুট লাগাল দুজনে। সুষমা দেখতে থাকলেন দুটিতে হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল। ঝুড়িটা পড়ে রইল গাছতলায়।

একটা মহুয়ায় এত মধু সঞ্চিত ছিল সুষমা জানতেন না, কত মধু পায়ে দলেছেন তার হিসাব রাখেননি।

অরুণাচলের আবির উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। দুচোখে অশ্রু, মুখে অনির্বচনীয় প্রসন্নতা, সুষমা পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এত আলো, এত রঙ, গাছে গাছে পাখীর কাকলী, বনে বনান্তরে এই বসন্তশ্রী, আজও এ পৃথিবী এত সুন্দর।

এই মহাশান্তির সমুদ্রে বিন্দুবিন্দু বেদনা প্রতিনিয়ত মিলে মিশে একাকার হয়ে যচ্ছে। 'বিনাশম ব্যবস্যাস্য ন কশ্চিত কর্তুম অর্হতি'। আজ এই প্রথম উপলব্ধি করলেন সুষমা, এই চিরসুন্দরের ভাগ্যলেখায় প্রলয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

বেড়িয়ে ফিরলেন সুষমা। ফেরার পথে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। স্থানীয় এক পেট্রোল পাম্পের মালিকের জিপে চড়ে রাঁচি চলেছেন। ওখান থেকে ট্রেন ধরবেন আজমের শরীফের। সুষমা জানতে চাইলেন, কবে ফিরবেন? জবাব পেলেন, খুদা যব্ চাহা।

কোয়ার্টারে না গিয়ে প্রথমে হাসপাতালে গেলেন। ইনডোরে রুগী ছিল। দাই মেথর এরা কাজে এসে গেছে। সবাইকার দেখাশোনা খোঁজখবর করলেন। অভাব অভিযোগ শুনলেন। এইভাবে অনেকটা সময় কাটল।

ভোরের রোদ প্রখর হতে আরম্ভ করেছে। হাসপাতালের শান বাঁধান কুয়োর ধারে বাইরের মেয়ে পুরুষ জমেছে গোটা পাঁচেক। নোংরা জলজমার জায়গায় সতেজ সবুজ পুদিনার ঠাসবুনুনি।

সুষমার মনে পড়ল, এবার একবার লোক নামিয়ে সাফাই করাতে হবে কুয়োর তলা। আজ একটু পটাস ছড়ালে ভাল হয়। হাসপাতালের বুড়ো চাকরটাকে ডেকে সেইমত নির্দেশ দিলেন।

কোয়ার্টারে ফিরলেন সুষমা। চৌকির ওপর চুপ করে বসে আছে রিণা। সেতারটা পাশে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করান।

সুষমা ঢুকতেই চোখ তুলে তাকাল রিণা। বলল, এসেছ তুমি, দেখনা, মা কিছু খাচ্ছেন না।

—কেন ?

—কি জানি। কাল বিকেলে মৌলবী সাহেব কি ভাল আম এনে দিয়েছেন। দশেরি না কি যেন নাম। তোমাদের লক্ষ্ণৌ থেকেই তো কে ওঁকে পাঠিয়েছে। কেটে টুকরো করে দিলাম, কিছুতেই খাবেন না।

—খাবেন। দেখ তুই। গভীর প্রত্যয়ে কথাটা বললেন সুষমা। সংশয়ে ম্লান হাসল রিণা।

সুষমা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বিছানার ওপর একগাদা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন অনিমা। সামনে পড়ে রয়েছে দুখণ্ড উদ্বোধনের উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর নতুন কপি। একখণ্ড কোলের ওপর খোলা। রিণা ডাকে আনিয়েছে। পাশের টেবিলে একটা কাঁচের প্লেট। কয়েকটুকরো স্বর্ণকান্তি আম। দুটো মাছি উড়ছে।

—খাবেনা আম ?

—না।

—কেন ? বুড়ো মানুষ নিজে হাতে এনেছেন। সহজে পাওয়া যায় এ সময় !

—আমার জেদ !

—আজ জেদ করোনা। খেয়ে নাও। আমি বলছি।

—সুষি যা, বিরক্ত করিস না।

—আচ্ছা করবনা বিরক্ত। আমার একটা কথা শুনবে। খুব অদ্ভুত লাগবে তোমার।

আস্তে আস্তে বিছানার একপাশে এসে বসলেন সুষমা। এতটুকুতেই যথেষ্ট অবাক হয়েছেন অনিমা। একমাত্র ডাক্তারের কর্তব্যপালনের দায়িত্ব ভিন্ন সুষমা এ বিছানায় বসেন না।

সুষমা বলতে আরম্ভ করলেন, যেন অবোধ এক শিশুকে গল্প শুনিয়ে ভোলাচ্ছেন, এমনি ভাব, জান, আমি যেখানে বেড়াতে যাই, একটা মহুয়া গাছ

আছে। দুটো বাচ্চা রোজ এসে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। আমায় খুব ভয় পায়। কাছে আসে না। মহুয়ার ত সময় শেষ হতে চলল, আজ ওরা একটাও পায়নি। আমি পেয়েছিলাম, মাত্র একটা। মন ভাল ছিলনা আমার। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। ওদের কাছে ডাকলাম। ছোট্ট মহুয়াটা দুভাগে ভাগ করে তুলে দিলাম দুজনের মুখে। তোমায় কি বলব দিদি, জীবনে এত নির্মল আনন্দ কখনও কাউকে দিইনি। তোমার মনে নেই, তুমি আর পল্লবদা যেমন করতে। এতটুকু রিণাকে যেভাবে তুমি আর আমি ভাগ করে নিয়েছিলাম। কোথায় কি নষ্ট হয়েছে বোঝাবে আমায়। তোমার এই বেদ উপনিষৎ এতে ক্ষমা সহিষ্ণুতার বুঝি কোন স্থান নেই? তোমার কাছে যে অপরাধ আমি করেছি এই কুড়ি বছরে তা কি এতটুকুও লাঘব হয়নি? বল! আমি আজ আবার মান খুইয়ে তোমার বিচার চাইছি। বলনা। আর একবার চেষ্টা করতে পারিনা আমরা, সেই মাধুর্য্য ফিরিয়ে আনতে?

প্লেটের ওপর থেকে ততক্ষণে একখণ্ড আম তুলে নিয়েছেন সুষমা। অনিমার অবাক দুচোখের সামনে দুভাগে ভাগ করলেন সেটাকে। একখণ্ড নিজের মুখের সামনে তুলে ধরলেন, অন্যটা এগিয়ে দিলেন অনিমার মুখের সামনে।

দেয়ালে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চৌকির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে রিণা ততক্ষণে, মাঝখানে জানলা। একটা মাত্র সক্ষম পায়ের ওপর দেহভার ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিণা।

সুষমা একটুকরো আম কামড়ে ধরেছেন। অন্য টুকরোটা তখনও অনিমাব মুখের সামনে প্রসারিত।

উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছিল রিণা। দেখতে পেল মা আর মাসীর মাঝখানের বিশবছরের পুরোণ সেই প্রাচীরটা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে চূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

জানালার একটা অংশ আঁকড়ে ধরে রইল রিণা।

পাশের ঘরে হাসি কান্নার নির্ঝর ছুটেছে। একখণ্ড উপনিষদ সুষমা আর অনিমার আলিঙ্গনের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এতদিনের অপরাধের প্রাচীর দীর্ণ হয়ে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে।

অনিমা কাঁদছেন। সুষমা হাসছেন। দুজনেরই চোখে অশ্রু। এর মাঝে

যেন রিণার কোন ভূমিকা নেই। তবু এক অনির্বচনীয় পুলকে তার দুচোখ উপচে অশ্রু ভরে উঠেছে।

এমনি সময় রিণার ঘরের দোরগোড়ায় যেন কার এসে দাঁড়াবার শব্দ হল। ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল রিণা। হাতে পায়ে শক্তির যতটুকু অবশিষ্ট ছিল যেন মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলল। জানলা থেকে হাত ছেড়ে গেল। একটা মাত্র সক্ষম পা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না। সেতারটা ধরতে গেল। তারপর দরজার দিকে আশ্রয়ের সন্ধানে দুটো বাহু বাড়িয়ে দিল রিণা। গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরল তার। সেতারটা সেই সঙ্গে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। ভেঙ্গে টুকরো হল।

অনিমার বাঁধন ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে প'ড়ছিলেন সুষমা। নিমেষে মাঝের দরজা অতিক্রম করলেন। আর তারপর সেইখানেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে ব্রজেশ সারস্বত। রিণা একেবারে চৌকির ধারে। ব্রজেশ সারস্বতের বলিষ্ঠ দুবাহুর বন্ধনে রিণা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

একমুহূর্ত পূর্বে এ দুটো ঘরে এত শব্দ উঠেছিল, এখন সব স্তব্ধ হয়ে গেছে এমনি আরও কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ পরম বিতৃষ্ণায় চিলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন সুষমা :

—ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও ওকে—

কাঁচামাল ব্রজেশ সারস্বত এ কণ্ঠস্বর সইতে পারল না। সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দিল রিণাকে। চৌকি আর মেঝের মাঝামাঝি আছড়ে পড়ল রিণা।

আবার সেই স্তব্ধতা। মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে রিণা। দুহাত পিছিয়ে ব্রজেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের মত। সুষমা দুঘরের মাঝখানে। দিদি অনিমা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজা ধরে।

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে রিণা। রিণা আর তার ভাঙ্গা সেতার। পিঠটা থেকে থেকে থরথর করে কেঁপে উঠছে। অসহ্য যাতনায় সারা দেহটা সেই সঙ্গে কুঁকড়ে উঠতে চাইছে। গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বের হচ্ছে না। ভীষণ লেগেছে কোথাও।

কোথায় লেগেছে? ডাক্তার ব্রজেশ ভাবছে কোথায় লেগেছে? ডাক্তার সুষমা ভাবছেন কোথায় লেগেছে। মা অনিমা ভাবছেন কোথায় লেগেছে? সেই অবস্থায় দূর থেকেই কিছুক্ষণ বেদনার এই অনুসন্ধান চলল।

এ গল্পের এই শেষ। এমন সব গল্প এইভাবেই শেষ হয়। তার কারণ, সুষমা সেদিন ভোরে যে মহাশান্তির সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছিলেন, অতঃপর ওঁরা তিনজন নির্বিরোধ মতৈক্যে রিণার এই একবিন্দু বেদনার সত্বাধিকার সেই অসীমেই অর্পণ করলেন।

———

## ॥ প্রশন্-ক্লু ।

ইণ্টারভিউ আরম্ভ হল। টেবিলের এদিকে প্রার্থী আমি। অন্যদিকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ওয়াণ্টার ব্যালার্ড। মাঝখানে আমার এ্যাপ্‌লিকেশন টেসটিমোনিয়াল ইত্যাদি লম্বিত।

—সিট্ ডাউন ইয়ংম্যান। সৌজন্য প্রকাশ করলেন মিঃ ব্যালার্ড।

—থ্যাংকস্।

—হোয়াটস্ ইওর নেম্ ?

নেম! আমি তখনও বসিনি। বসা আর দাঁড়ানোর মাঝামাঝি অবস্থায় থমকে গেলাম।

মাত্র একজন প্রার্থী। মাত্র একটা আবেদন পত্র। সেই সঙ্গে এদের ইয়া মোটা ফর্ম। বাপের নাম, বুকের ছাতি ক'ইঞ্চি ফোলে, কবে কি যৌন রোগ হয়েছে, হেন বিবরণ নেই যা যথাযথ বর্ণিত নেই। তবে এমন বেয়াড়া প্রশ্ন কেন ? মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল—

—ইটস্ রিটন্ দেয়ার।

—দ্যাটস্ রাইট্। বাট ইটস্ ওনলি দ স্পেলিং। মে আই বি ডিলাইটেড্ টু নো দ প্রোনান্‌সিয়েশন্ এজ ওয়েল ?

—ওয়েল্, এবার আমি বসলাম, তর্ক না তুলে থাকতে পারলাম না, বললাম, এ্যাম এ্যাফরেড, ইট মে ডিফার-ইন ইওর এ্যাকসেণ্টস্ এণ্ড মাইন।

—ইট মে নট্। শুড আই ট্রাই।

—প্লিজ, ডু।

—শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য। এ্যাম আই কারেক্ট ! কি হে, অমন রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করে রইলে কেন ?

ফরিদাবাদের একটা মেশিনটুল ফ্যাক্টারিতে টুলরুম ইন্‌চার্জের চাকরী খুঁজতে গেছিলাম। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যালার্ডের মুখে আমার এমন শক্ত নামের বিশুদ্ধ বাঙলা উচ্চারণ শুনে আমি রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করেছিলাম। মিঃ ব্যালার্ডের জানা ছিল, মুদ্রাটা অতি বিস্ময়ের। পরে বুঝেছিলাম আমার মত

প্রবাসী বাঙালির মুখে বাঙলা উচ্চারণের শুদ্ধতা যাচাই করার জন্যই এমন প্রশ্ন করেছিলেন মিঃ ব্যালার্ড।

মাত্র তিনদিন ছুটি পেয়েছিলাম, শেষদিন রবিবার নিয়ে চারদিন ছুটি হাতে ছিল। তবে আমার ইচ্ছে ছিল ইন্টারভিউ দিয়ে একদিনেই দিল্লী ছাড়ব, আগ্রায় তাজ দেখার সখ বহুদিনের। এবারকার সুযোগ ছাড়া চলবে না।

মিঃ ব্যালার্ড আমার সে পরিকল্পনা ভেস্তে দিলেন।

এ গল্প মিঃ ব্যালার্ডকে নিয়ে। গোড়ায় বলে রাখা ভাল হবে এ গল্পে আমার কোন ভূমিকা নেই। থাকলেও সে বড়জোর শার্দুলের পিছু পিছু ফেউ-এর মত। মিঃ ব্যালার্ড শার্দুল আর আমি ফেউ। সেই সামান্য অধিকারে মূলগল্পের আগু-পিছু তুটি তুটি করে মোট চারটে ফালতু কথা জুড়ে দেবার লিবার্টি নিচ্ছি আমি। বোঝা যাঁরা বইবেন এই শাক আঁটি টুকুও কবুল করুন।

আমি এলাহাবাদের একটা হঠাৎ বেড়ে ওঠা ফ্যাক্টারীতে টুলরুম সুপারভাইজারের চাকরী করি। বর্ষার আগাছার মত এ ফ্যাক্টরীতে আমার বাড়বৃদ্ধিও বেখাপ্পা গোছের। তাই আমার আধিপত্য যত বাড়তে থেকেছে কারুর কারুর গাত্রদাহও বেড়েছে সেই অনুপাতে। সম্প্রতি উঁচুস্তরে কিছু ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়ায় আমার ওপর চাপ বাড়তে আরম্ভ করে। তাই বাধ্য হয়েছিলাম অন্যত্র অন্নের সন্ধান করতে।

আমাদের অফিসের গুটি পাঁচেক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে স্টেনো-টাইপিষ্টের কাজ করে। তাদের একজনের নাম মিস্ ক্লার্কসন। বয়স বছর আঠারো উনিশ হবে। মিস্ ক্লার্কসন হেড অফিসের অনেক ছেলে-বুড়োর স্বপন সঞ্চারিণী।

আমার দিনের কমকরে বারোঘণ্টা কাটে মেশিন আর মেকানিজম নিয়ে। আদিরসের সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্পৃশ্যতার। আর একটা এমন ব্যাপার আছে, এখানে যা উল্লেখ্য।

আমার তখন বছর দশেক বয়স। আমার এক খেলার সাথীর বড়ভাইকে রেলে কাটাপড়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছিলাম নিজের চোখের সামনেই। দৃশ্যটা আজও প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেদিন সেই শিশুমনে যে নারী বিদ্বেষ স্থান পেয়েছিল, আজ পর্যন্ত এমন কোন কারণ ঘটেনি যাতে তা বিন্দুমাত্র লাঘব হতে পারত। তাই এখানে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও, মিস্ ক্লার্কসনের মুখের সৌন্দর্য্য বা

দেহের গঠন নৈপুণ্যের বিশদ আলোচনা করে এতটুকু লিখছি, মেয়েটি সচরাচর চোখে পড়েনা এত রূপের অধিকারিণী।

ছুটির দিন কাজ বন্ধ থাকলে আমি সাইকেল নিয়ে সহরতলীর বাইরে, মানুষের ভীড় যেদিকে কম, সেদিকে ঘুরে বেড়াই। খেয়াল হলে হাইওয়ে ধরে পাড়ি দি দূরের দিকে।

সহরের উপকণ্ঠে সবচেয়ে ভাললাগে নিওয়া ঘাট। গঙ্গার ধারে প্রায় জনহীন মাঠঘাট। বর্ষার জলবাহী নালায় এমন অসমতল, যাতে চাষ বা বাসের অযোগ্য। তাছাড়া এ অঞ্চলটা ক্যান্টনমেণ্টের নিষেধ ক্ষেত্রের সীমানায় পড়ে। মিলিটারী ট্রেনিং-এর জন্য নির্দিষ্ট হলেও প্রায় পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে রাইফেল সুটিং-এর উঁচু উঁচু টিলা। বিচিত্র গঠন শেল্টার। গোটাকতক ছোট চালা ঘর রয়েছে। মাঠের মধ্যে ইতিউতি বাবলা অশ্বত্থের গাছ। পেছনে গঙ্গার গৈরিক প্রবাহ। তারপর ওপারের প্রশস্ত বালুচরে মৌসুমী ফলের চাষ। অল্পদূরে নদী উত্তর দিক থেকে মোড় ফিরে এদিকে ঘুরে আসা য় এখান থেকে আদিগন্ত বিস্তারে জাহ্নবীর শ্যাম অঞ্চল প্রসারিত দেখা যায়।

মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ একটা ঘর। সামনে এ্যাসবেসটাসের ছাতে ঢাকা বারান্দা। পাশ দিয়ে মেঠো পথ চলে গেছে গঙ্গার তীর পর্যন্ত।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। অন্ধকার নামতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গার পরপারে অস্তরাগের রঙ ম্লান হয়ে আসছে। এ পাশে আকাশের কোণে সঙ্কোচে কুণ্ঠিত একফালি শীর্ণ চাঁদ। উঠি কিনা উঠি ভাব। আমি মাঠের মধ্যে পায়েচলা পথ ধরে সাইকেল চেপে গঙ্গার তীরের দিকে এগোচ্ছিলাম।

ঘরটার কাছে এসে দেখলাম একটা ঝকঝকে স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আশেপাশে লোকজন চোখে পড়ল না। তারপর আর একটু এগোতেই দেখতে পেলাম তুটিকে। ঘরের সামনে বারান্দায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে। বয়স কম। অনুরাগের ফাগে মন রঙীন। আকাশের রঙ ফুরিয়ে এলেও সময়ের হুঁশ থাকেনা। একটু সাবধান করে দিলে ভাল হত, এদিকে লুটপাট ছিনতাই হয়না এমন নয়।

বেয়াড়া সাইকেলটাকে যথাসাধ্য সম্ভব নিঃশব্দে চালিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ওরা টের পেল না।

গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি।

এই মেডিটেশন্ আমার প্রিয়, যন্ত্রমুখর ওয়ার্কশপের বাইরে মানুষের কোলাহল ভাল লাগেনা। আমি আত্মকেন্দ্রিক এমন দুর্ণাম শুনি। শুনতে ভাল লাগে। তাছাড়া চাকরীর নিরাপত্তার দুশ্চিন্তায় ইদানিং সব সময় মন মেজাজ ভাল থাকেনা। বাবা রিটায়ার করার পর অনেক দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে। তবু মনের সহজাত বৈরাগ্যভাব মাঝে মাঝে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসে। দিনের আলোয় হোক বা রাতের অন্ধকারে, এইখানে বসে থাকতে থাকতে আবার একসময় মনে হয়, যে সংগ্রামে নেবেছি তার অন্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌছনই আমার মহত্তম ধর্ম, এইখানে নৈরাশ্যের বোঝা বা মনের সব বৈরীভাব নাবিয়ে রেখে গুটিগুটি আবার সেই রণাঙ্গনেই ফিরে যাই। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, অশান্ত মন তখন দুইই শান্ত হয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষটুকু দেখছিলাম। গঙ্গার গৈরিক তরঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ শত খণ্ডে চূর্ণিত। নদী যত পূবের দিকে বয়ে যাচ্ছে তার তরঙ্গশীর্ষ তত রঙ হারাচ্ছে। আকাশের রঙ শেষ হয়ে এলো, এবার ক্রমে সব তরঙ্গ সমান বিবর্ণ হবে। আমার ওঠার সময় হ'ল।

ফেরার পথে আবার ওদের দেখতে পেলাম। মাঠের মধ্য দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ছেলেটা ছুটছে পেছনে, স্কুটার দাঁড়িয়ে সেই ঘরের সামনেই, অনুনয় বিনয় চলছে একটা কিছু। আর নয়ত কপট মান অভিমানের পালা। তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাতেই মঙ্গল ওদের। বোঝাবে কে। মেয়েটা এবার ছুট লাগাল। আমি ততক্ষণে ওদের ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছি, বুঝতে পারছি, ক্রমে ভাবগতিক বদলাচ্ছে ওদের। মেয়েটা বারবার পালাতে চাইছে। ছেলেটা চেপে ধরেছে। কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটার হাবেভাবে ঘোর আপত্তি বোঝা যায়। ক্রমে ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে। এদিকে অন্ধকার নেবে এসেছে। মাঠের শেষে ব্রিজিং ট্রেনিং ক্যাম্পে, মিলিটারী ব্যারাকে আলো জ্বলে উঠেছে।

গঙ্গার সমান্তরাল যে পথ অল্প দূর গিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে আমি তার কাছাকাছি পৌছেছি। অন্ধকারে ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা সম্ভবতঃ যাবার সময় আমায় দেখতে পেয়ে থাকবে, তাই একটু পরেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার আর্তস্বর শুনতে পেলাম, প্রথমে 'আ' জাতীয় একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার, তারপরই শেভ্—, শেভ্মি বাঁচাও।

আমি চমকে উঠলাম। এ তো সেই স্বর—নখদন্তের করাল কবলে মুমূর্ষ শিকারের অন্তিম আর্তনাদ।

কিছু ভেবে দেখবার অবসর ছিল না। আপনা আপনি আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরল। আবার সেই স্বর, বাঁচাও—, বাঁচাও, অন্ধকারের মধ্যে শব্দ লক্ষ্য করে সাইকেল ছোটালাম।

মাঠের অন্ধকারে ধূলোবালি ঘাসের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে দু'জনে। ছেলেটা তার বর্বর পুরুষশক্তিতে কাবু করতে চাইছে মেয়েটাকে। মেয়েটা অবলার শেষ শক্তি নখদন্তের দুর্বল প্রতিরক্ষায় নিজেকে বাঁচাতে তৎপর।

কে আটকাবে ওই পশুটাকে? রিপু ওকে দুর্দ্দম করে তুলেছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মাটি থেকে লাফিয়ে উঠল। অন্ধকারে দুটো চোখ পাশবিক ক্ষুধায় ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। আমি প্রস্তুত হবারও সময় পেলাম না। ছেলেটা একটা বড় পাথর তুলে ছুড়ল আমার দিকে।

মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে মিলিটারী ব্যারাকের আলোগুলো সরে গেল। চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নেবে এলো।

সাইকেলটা নির্ভর করে দাঁড়িয়েছিলাম। একমাত্র সেটাকেই অস্ত্র বলে মনে হ'ল। মুহূর্তে শরীরের সব শক্তি একত্র করে সাইকেলটা দুহাতে মাথার ওপর তুলে ধরলাম। সেই অবস্থায় প্রায় অসাধ্য ক্ষিপ্রতায় ছুঁড়ে মারলাম।

আঘাতে তখনও বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছি। কি ঘটছে সঠিক বোঝার মত অবস্থা নয়। প্রায় হন্তের মত আর একবার সাইকেলটা কুড়িয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে শত্রুর সন্ধান করলাম।

দাঁড়িয়ে রইলাম সেইভাবেই। দেখতে পেলাম অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে চার হাতে পায়ে বুনো জন্তুর মত ছুটে পালাচ্ছে ছেলেটা। দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সাইকেলটা নাবিয়ে আর একবার সেটার ওপর নির্ভর করতে হ'ল আমায়। এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ফিরে তাকাবার সুযোগ হ'ল। সংক্ষিপ্ত স্কার্টের ছিন্ন অংশ চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে শুধু কেঁপে যাচ্ছে। ভয় উত্তেজনা আর হয়ত বা কিছুটা আত্মধিক্কার সব মিলিয়ে প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা। চিনতে পারলাম, আমাদের অফিসের মিস্ ক্লার্কসন।

মনে হ'ল অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কম্পমান একটা আলেয়াবহ্নি হঠাৎ তার সবটুকু জ্যোতি হারিয়েছে।

মিঃ ব্যালার্ডের সঙ্গে মিনিমম্ এ্যাকসেপ্‌টেবল্ স্যালারির বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বললাম, দেখুন্ যোগ্যতার অতিরিক্ত বা অপ্রাপ্য কিছু গ্রহণ করা আমি লজ্জাকর মনে করি। তার চেয়ে বরং কিছু কম পাওয়াই ভাল। আমার এলাহাবাদ থেকে পালাবার চেষ্টার এও এক কারণ। ব্যক্তিগত জীবনে এমনি এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। হ্যাট ফর্ম উইল টেল ইউ হোয়াট আই প্রেজেন্টলি আর্ণ, এণ্ড দেন, ইউ হ্যাভ ইওর ওন জাজ্‌মেণ্টস্। পে মি হোয়াট আই ট্রুলি ডিজার্ভ। বেটার অন দি মাইনাস্ সাইড হ্যান প্লাস.।

—আই সি, ইউ আর নট স্পিকিঙ্ লাইক এ ট্রু বেঙ্গলী। নো গ্রেট একস্‌পেকটেশনস্?

—নট মেনি, বি এ্যামিউজড্ টু লার্ণ। মাই এফরটস্ ডু নট নেসেসারিলি ফলো এন এ্যাকস্‌পেকটেশন্। বাঙ্গালীর প্রতি আপনার বিদ্রূপের প্রতিবাদ এক্ষেত্রে করতে পারলাম না। অস্বীকার করব না, তাদের প্রতি ক্ষুদ্রতম এফর্ট্ এর সঙ্গে একটা ইমিডিয়েট একস্‌পেকটেশন যুক্ত থাকে, আর অপূর্তি মাত্রেই লোকহাসান বিক্ষোভ, এসব সত্য। ফর হ্যাট ম্যাটার, আই ষ্টার্টেড মাই লাইফ ফ্রম এ স্ক্র্যাচ টু কাম আপটু হোয়ার আই এ্যাম টু-ডে। আরও উঠতে চাই হোয়াট কাউন্টস্ ইন মাই লাইফ ইজ হাউ টু গো এহেড, এণ্ড টু গো এহেড ফারদার। প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আশাভঙ্গ দেখেছি জীবনে, তবু থামিনি, যা পেয়েছি তা যেমন কারুর দয়ার দান নয়, যা পেলাম না তা যে আমরাই অর্জন করে নেবার অক্ষমতা, এমনি বিশ্বাস করে এসেছি।

লক্ষ্য করছিলাম, মিঃ ব্যালার্ড দুচোখ ভরা সপ্রশংস কৌতুক নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, অবাক করলে হে তুমি। কথাগুলো মন থেকে বলছ তো?

আদর্শের মিল না হলে মনের মিল হয় না। আমি মিঃ ব্যালার্ডের কাছে গিয়েছিলাম চাকরীর প্রত্যাশায়। ওঁর জীবন দর্শন গোড়া থেকেই আঁচ করার চেষ্টা করেছিলাম। হয়ত এ আমার শঠতা, নিজেকে সেইভাবেই উপস্থিত করেছিলাম তাঁর কাছে। তাই আমার মত একজন অল্পবয়স্ক নিম্নপদস্থের কাছে প্রশন্-ব্লু কাহিনীর এমন অকপট বিবৃতি সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

দশটা থেকে সাড়ে বারোটা টানা আড়াই ঘণ্টা' ইণ্টারভিউ হ'ল আমার। আগে থেকেই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন মিঃ ব্যালার্ড যাতে এর মাঝে তাঁকে একবারও ডিসটার্বর্ড হতে হ'ল না।

আলোচনা হচ্ছিল প্রেসটুল, জিগস্ এ্যাণ্ড ফিক্সচরস্ আর কিছু বিশেষ ধরনের প্রেস-এ্যাটাচমেণ্ট নিয়ে। আমি এ লাইনে ঢুকেছি তখন আমার বয়স আঠারো। আজ দশ বছর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। তাতে মৌলিক কিছু আছে।

সাড়ে বারোটার সময় মিঃ ব্যালার্ড বললেন, এবার আমাদের লাঞ্চ হবে। ইটস্ এ পিটি ইউ হ্যাভ নো এ্যারেঞ্জমেণ্টস ফর দ্যাট হিয়ার সো ফার। প্লিজ হেল্প ইওরসেল্ফ ইন দ্যাট ম্যাটার। এ্যাণ্ড দেন ইউ হ্যাভ টু এ্যাপিয়র ইন এ প্র্যাকটিকল ট্রায়াল। আই শ্যাল বি এ্যাকসপেকটিঙ ইউ হিয়ার এট ওয়ান থার্টি, রাইট।

লাঞ্চের হুটার হ'ল মিঃ ব্যালার্ড সেদিনের মেল ক্লিয়ার করতে তৎপর হলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম।

এখানে কাছে পিঠে কোন ভদ্রগোছের রেষ্টুরেণ্ট আছে কিনা খোঁজ নেবার উৎসাহ নেই আমার। কাল রাত থেকে পেট প্রায় খালি। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় পেটে পুরতে হবে।

ফ্যাক্টরীর বাইরে এসে দেখলাম ওয়ার্কারেরা লাঞ্চে বসে গেছে। কেউ পথের ধারে গাছের ছায়ায়, কেউ ফ্যাক্টরীর দেয়ালের আড়ালে, অল্পে তুষ্ট দু'তিনটি করে মানুষ জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়েছে। উৎকর্ণ স্থাণুবৎ গুটি চারেক কুকুর।

খাদ্য, তিনখানা হাতে গড়া রুটি, ব্যাসে একশো পঁচিশ মিলিমিটার, মোটায় দশ। সঙ্গে একখাবলা শুকনো আলুর শব্জি, পেঁয়াজ কিংবা দুটুকরো আচার। খামখেয়ালে হিসেব করে ফেললাম, প্রায় একশো কুড়ি ঘনসেণ্টিমিটার পদার্থে উদরপুর্তি হচ্ছে শ'খানেক কুশলী আধাকুশলী যন্ত্রবিদের। শুনেছি শিল্পে সেল্ফ-রিলায়েন্স আনার নাকি জোর প্রস্তুতি চলেছে। আমি দেখলাম, এ দৃশ্যে এলাহাবাদে, ফরিদাবাদে কোন বিভেদ নেই। শুধু তাই নয়, মাদ্রাজ, কলকাতা অমৃতসর সর্বত্র এই একই ছবি। যথার্থ ভাবে এই একশো কুড়ি ঘনসেণ্টিমিটারের ঐক্যই গোটা দেশটাকে মৈত্রীর বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

আমি আমার বরাদ্দ একশোকুড়ি ঘনসেণ্টিমিটারের সন্ধান পেলাম এক সিন্ধী

বুড়ির নিকৃষ্ট শ্রেণীর দোকানে। পথের ধারে নড়বড়ে বেঞ্চি বেছান আয়োজন। পেঁয়াজ ভিণ্ডির শজি, মুসুর ডাল, গরম সেঁকা রুটি আর মুফতে চাটনী-পেঁয়াজ।

সম্ভ্রম হানিকর কিছুই হচ্ছেনা এই প্রবোধ নিয়ে প্রায় আহারে বসার আয়োজন করছি, এমনি সময় দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল একটা শাদা ষ্টাণ্ডার্ডহেরাল্ড। জানালা দিয়ে হাত নেড়ে মিঃ ব্যালার্ড আমায় ডাকছেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়নি এমনি সপ্রতিভ ভাব নিয়ে উঠে গেলাম।

—তুমি! মানে এখানে?

—অগত্যা, দুহাত ঘুরিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলাম, আই ডোণ্ট মাইণ্ড, নট রিয়ালি।

গাড়ীর দরজা ততক্ষণে খুলে গেছে। মিঃ ব্যালার্ড হাত বাড়িয়ে আমায় ভেতরে টেনে নিলেন। ফার্ষ্ট গিয়ারের গর্জনে বুড়ীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ল। ফিরে এসে তাকে খাবারের দাম দিতে হবে।

গাড়ী ছুটেছে। পথের দুপাশে ফরিদাবাদের ইনডাসট্রিয়াল বেল্ট্। অধিকাংশই সদ্য গড়ে ওঠা বা নির্মীয়মাণ ফ্যাক্টরী আর তার সঙ্গে লাগোয়া সুদৃশ্য অফিস। রিসেপশন ইত্যাদি। দৃশ্যটা উচ্চাশাজনক। আগামীকালের শিল্পায়িত ভারতবর্ষের এ যেন একখানা কল্পিত মডেল।

আমার ভাব লক্ষ্য করে প্রসন্ন মন্তব্য করলেন মিঃ ব্যালার্ড, ইট ইজ এ ডিলাইট ট্ বিহোল্ড সামথিং বিঙ বিল্ট্। কি বল!

সাত আট মিনিটে মিঃ ব্যালার্ডের বাড়ী পৌছালাম। আড়ম্বরহীন একটা বাঙলো। পরে জানতে পেরেছিলাম, একটা মাত্র চাকর কাম বাবুর্চী ছাড়া এ বাড়ীতে বাস করেন অকৃতদার মিঃ ব্যালার্ড একা।

বাড়ীতে ঢুকতেই সবচেয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ড্রইং রুমের দেয়ালে টাঙানো খানছয় হাতে আঁকা ছবি। চারটে পেনসিল ওয়ার্ক, বাকি দুটো একরঙা ওয়াটার কালারের। সবকটা ছবিই পোর্ট্রেট জাতীয়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এদেশের ওদেশের মনীষীদের ছবি। আরও দেখলাম। তিনখানা সুদৃশ্য কাঁচের আলমারি ভরা বাংলা ইংরিজি দর্শনের বই।

লাঞ্চের পর ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে মিঃ ব্যালার্ড বললেন, দেখেছ, বিশ বছর আগে একজন মেশিন টুল ডিজাইনার এগুলো এঁকেছিল। এই আমি। সে শিল্পী বেচারা কিন্তু বেঘোরে মরেছে। বিশ্বাস হয়?

বিশ্বাস হবার কথা নয়। আমি দুচোখ ভরা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ছবিগুলোই দেখেছিলাম।

আজকাল আর এমন ছবি চোখে পড়ে না। চলতি যুগ ফাঁকির মধ্যে চটকের মহিমা চিনেছে। আগে যখন এমন ছিলনা, তখন অসামান্য প্রতিভা, গভীর নিষ্ঠা আর কঠিন অধ্যাবসায় মিশে এমন সূক্ষ্ম ফাইন আর্টের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। যে সূক্ষ্মতায় ছবিগুলো আঁকা, আমার মত সাধারণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে তার গভীরে যাওয়াও সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে মনে হ'ল, এর শিল্পী মারা যায়নি, একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে খুন হয়েছে।

পাশের বেডরুম থেকে ডাক দিলেন মিঃ ব্যালার্ড, হিরণ্ময় এদিকে এসো। দেখ আমার মা।

পর্দা তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ছবিটা দেখা যাচ্ছিল। আমি সেইদিকেই চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম। বিস্ময়ের যতটুকু বাকি ছিল এবার তাও পূর্ণ হ'ল।

দামী ফ্রেমে বাঁধান বিরাট পোর্ট্রেট। পেনসিল ওয়ার্ক। আমি হতবাক হয়ে দেখছিলাম।

ঘোমটা, চওড়াপাড় শাড়ী, টিপ, সিঁদুর, শাঁখা, আর এসবের ওপর অবিশ্বাস্য নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বাঙলার চিরন্তনী সেই সুকল্যাণী মাতৃমূর্তি।

—খুব অবাক হলে, নয়? নাম শুনবে। শ্রীমতী সুশীলা চট্টোপাধ্যায়। ভালবেসে বাবাকে বিয়ে করেছিলেন আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। ধর্মকুল সব ছেড়েছিলেন, ছাড়েননি শুধু একটা মাত্র জিনিষ—তাঁর প্রকৃতি। ছবিটা কেমন?

—বর্ণনা হয়না। অভিভূত মন্তব্য করলাম আমি।

—যাঁর ছবি তিনি?

আমি চুপ করে দেখছিলাম। মিঃ ব্যালার্ডের প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। ইচ্ছে হচ্ছিল ছবিটা একলা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখি।

—হিরণ্ময়, আমি তোমার কমেন্ট জানতে চেয়েছি।

—কি বলব বলুন। এমন মহিয়সী মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে কোন—

—মহিয়সী? ভাল বলেছ! ওই মহিয়সী মূর্তির মধ্যে যে বিষের সঞ্চয় আছে ছবিতে তা ফুটিয়ে তোলা হয়নি। সেটা শিল্পীর মহানুভবতা। যদি

বলি, জীবনে যাদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেছি ইনি তাদের অন্যতমা। তুমি হয়ত গলায় আঙুল দিয়ে যে অন্ন এইমাত্র গ্রহণ করলে, তুলে দিতে চাইবে?

—আপনি—মুখে আর কথা জোগাল না আমার।

—ডোণ্ট বি শকড্। শুনে রাখ, এত ভাল কাউকে বাসিনি জীবনে, এত ঘৃণাও কাউকে করিনি, এত ত্যাগও কারুর জন্য করিনি। ছবিটা এইখানে টাঙিয়ে রাখার বিশেষ তাৎপর্য আছে, চিন্তা করে দেখ। আচ্ছা, থাক সে কথা। এবার আমরা ফিরব। আমাদের নিয়মমত একটা ট্রায়াল তোমায় দিতে হবে।

—দেখুন আমায় কিন্তু আজকেই স্পেয়ার করে দিন, আপার ইণ্ডিয়া অনেক রাত্তিরে। আমি আটটা পর্যন্ত ট্রায়াল দিতে রাজি। তবে আজকেই ফিরে যেতে চাই।

—তার মানে? কল্-লেটারে জানান হয়নি, এট্ আওয়ার ডিসক্রিশন, তোমায় তিনদিন পর্যন্ত ডিটেন্ করা যেতে পারে?

—তা ছিল। তবে—

কি বোঝাব ওঁকে। তাজ দেখার শখে অনেকদিন জমিয়ে সঙ্গে কিছু টাকা এনেছি। এখানে ট্রায়াল দিতে সে টাকা যদি দিল্লীর কোন হোটেলে গুনে দিতে হয় আক্ষেপের আর অন্ত থাকবে না আমার। কথাটা মিঃ ব্যালার্ডকে বলাও যায় না।

—কি হে। অমন গুম মেরে গেলে কেন? তোমার আপত্তির কারণটা জানতে পারি কি?

—না, মানে—। ভাবছিলাম থাকব কোথায়?

—ওঃ কোথায় থাকবে। তা বেশতো, এখানে না সুবিধে হয়, গো টু দেল্লি, অশোকা, ওবেরয় অনেক পশ্. হোটেল পাবে। ট্যাক্সিতে মাত্র মিনিট কুড়ির পথ, আই ডোণ্ট সি এনি প্রবলেম।

—না না, তা বলছি না। আসলে, এ্যাম নট প্রিপেয়ারড্। ইন ফ্যাক্ট, আই উড রাণ শট অফ ফাণ্ড্। হোয়ার শুড আই পুট আপ?

—ডিড্ আই সে হিয়ার? এখানে; মাই গড্। তুমি কি হে—। হ্যাভ ইউ টু পে মি ফর ইওর বেড এণ্ড মিল্‌স। চাকরী তোমার ট্রায়াল দেখে দেওয়া হবে, মুখ দেখে নয়। তিন দিন, বুঝলে—থ্রি ডেজ। তোমার মমতাময়ী মা

বোনেরা যদি বিশেষ উতলা হন, এই মর্মে তার দিয়ে দাও—একজন বদলোকের খপ্পরে পড়েছ। ছুটি কদিনের ?

—ছুটি আছে।

—ফাইন। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে এত কথা হ'ল, অথচ আমার এই জানা হয়নি তুমি কোথায় এমপ্লয়েড্। তুমি হয়ত বলবে, ফর্মে সে সব লেখা আছে। আছে, আই এড্মিট। তবে বিশ্বাস কর, ও মহাভারত আমি সম্পূর্ণ পাঠ করে উঠতে পারিনি। আসলে সকালে ওই যে তুমি তর্ক তুললে, ইণ্টারমিটেণ্ট্ সারকুলার মোশনে ডুয়েল্ টাইম ভ্যারিয়েবল করা নিয়ে, তাইতেই সব চাপা পড়ল। সে যাক, তুমি আছ কোথায় ?

বললাম। লক্ষ্য করলাম, শোনামাত্র ওঁর মুখভাবে কি রকম একটা বেদনার্ত বিস্ময় ফুটে উঠল। আত্মমগ্ন হয়ে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা—তোমাদের ওখানে মানে অফিসে, একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে কাজ করে, চেনো ?

—ষ্টেনো-টাইপিষ্ট আছে চার পাঁচজন। নাম বলুন।

—নাম! জুলি—, না, ধর—ক্লার্কসন। মিস ক্লার্কসন।

—আছে। চেনেন আপনি ?

—তুমি নিশ্চয় চেনো। আসলে এখানে একজন ওকে একটা দামী প্রেজেন-টেশন পাঠাতে চান। ভাবছিলাম যদি তোমার অসুবিধে—।

—না না, নিশ্চয় নিয়ে যাব। তবে আমি চিনি মানে—, ওই আর কি—।

—ন্যাচুরালি। তুমি বাঙালীর সুসন্তান, আর ও একটা এ্যাংলো—গেট আপ্। সময় হয়ে গেছে। একমিনিট দেরী হলে নিজেকে অপরাধি বলে মনে হয় আমার। আজ দেরী হ'ল।

লাঞ্চের পর আমার ট্রায়ল। দীর্ঘদিন পর মিঃ ব্যালার্ড আবার আমায় মেশিনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন। এচ এম টির নতুন ভার্টিকল মিলিঙ্। আমাকে বানাতে হবে একটা জেনেভা ডায়াল। সকালে ইণ্টারমিটেণ্ট সারকুলার মোশনে ডুয়েল টাইম কমবেশী করা নিয়ে তর্ক হয়েছে। আমার বাপের পুণ্যি, ট্রেসার এ্যাটাচমেণ্ট ছাড়াই উনি আমাকে ক্রস্-ওভার ক্যাম বানাতে দেননি। দুর্গানাম জপে কাজে হাত দিলাম।

বিকেলে আবার গাড়ি চড়ে মিঃ ব্যালার্ডের বাড়ি ফিরলাম। মথুরা রোডের ধারে মাঠের মধ্যে বাড়ী। লোকালয় থেকে বেশ একটেরে। পথের দূরত্ব বাড়ী থেকে প্রায় একশো গজ।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। লোহার শিকের বেষ্টনীতে সযত্ন রক্ষিত লন। অল্প কিছু ফুলের কেয়ারি। গুটি দশেক পাতা-বাহারের টব। দুটো বোগন ভেলিয়ার ঝাড়।

লনে তিনটে ষ্টিলের গার্ডেন চেয়ার পাতা। মাঝখানে একটা সেণ্টার পিস্। দুতিনটে টেকনিকল জার্নালস্। দ্রুত চোখ বুলিয়ে ফেলে রাখা খান চারেক কোয়াসিঅফিসিয়াল চিঠিপত্তর। আর আছে আইস বাউল। হুইস্কি সোডার বোতল। আমরা দুজনে বসে আছি।

মিঃ ব্যালার্ড বললেন, সকাল থেকে তোমার ওই কথাটাই বারবার মনে পড়ছে। বড় সুন্দর বলেছ। টু গো এহেড। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ থেকে শ্লোক মনে পড়ছে—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম
পাপা নৃসদ্বরো জনাঃ ইন্দ্র ইচ্চরত সখা
চরৈবেতি চরৈবেতি।

মুখে কৌতূকময় হাসি, প্রশ্ন করলেন, মানে বোঝনা বোধহয় ?

—না, অপ্রতিভ হাসলাম, আপনি বলুন।

—'পরিশ্রান্ত ক্লান্ত যে জন থামে না তার জন্য ঐশ্বর্য্য নয়। অলস ব্যক্তি পাপী, ঈশ্বর গতিমানের মিত্র। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল'। সংক্ষেপে, তোমার ওই 'টু গো এহেড,' সে যেন আরও এফেক্‌টিভ, অর্থপূর্ণ। ভেবে দেখ। এত এড্, লোন, কোলাবোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং নো-হাউ-এর ভিক্ষাবৃত্তি—অল দিজ্ ডাজ্ নট সাজেস্ট্ প্রোগ্রেস। আর দশটা দেশ ঘুরে দেখে না এলে ধারণাই করা যায় না, ষাটকোটি মানুষের এতবড় একটা নেশন্ কি বিপুল ক্যালাসনেসের পাকে আবদ্ধ। সাতশো বছরে বিশ জেনারেশনের ক্রীতদাস আমরা, ব্যাঙের আধুলী আমাদের এই স্বাধীনতা পেয়েই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গড়ে তুললাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। প্রথম সারিতে এসে জুড়ে দাঁড়াল যত ফাষ্টজেনারেশন ডিপ্লোমাট। যেদিকে তাকাও,—এনি ওয়াক অফ লাইফ—, পলিটিকস্, এডুকেশন, টেকনোলজি, সোশাল সায়েন্স, দেখবে, একপাল সুডো-ইনটালেকচুয়াল মিলে প্রগতির নামে

বাধিয়ে তুলেছে অন্ধ প্রতিবন্ধকতা। একটা সিদ্ধান্ত নেই, নিষ্পত্তি নেই, ঝুঁকি নেই, নেই জীবনের অগ্রগতি নিয়ে কোন গবেষণা, আছে শুধু গদি সামলাবার সংগ্রাম, আর সেই 'পান্তিহাটে বেতো ঘোড়া চলছে টুকুর টুকুর'—যুগ যুগ ধরে মোহময় স্থিতি। কোন কুক্ষণে কবিগুরু লিখে গেছেন 'গতির উপর স্থিতিকে রাখিয়া প্রকৃতি আবহমান কাল আপনাকে প্রকাশমান রাখিয়াছে, আমাদের সমাজপতিরা তার কি সর্বনাশা ইণ্টারপ্রেটেশন্ করেছেন, তা সব ধিক্কারের অতীত। হঠাৎ আজ তোমার মুখে শুনলাম, টু গো এহেড্ এণ্ড টু গো এহেড ফারদার। এ্যামেজিং। অথচ স্মরণ করো 'মা ফলেষু কদাচন' ইত্যাদি সেই সব আপ্তবাক্য। চরৈবেতি চরৈবেতি, গুড্ উই এট অল এক্স্প্লোর এ নিউ ডকট্রাইন ফর লাইফ। তবু, যে ভাবে তুমি বলেছ, বড় ইমপ্রেসিভ্ মনে হয়েছে। মে বি, বিকজ অফ্ দি এলিমেণ্ট অফ্ সারপ্রাইজ্। কোন বাঙালীর মুখ থেকে এমন কথা শুনব আশা করিনি।

—আমি মনে প্রাণে বাঙালী।

—ওটা রোগ। সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের জার্ম-প্লাজম থেকে ওটা আমিও ইনহেরিট্ করেছি। তবু আমার মুখ থেকেই শোন, ওই যে হিটলারের 'দয়েসল্যাণ্ড দয়েসল্যাণ্ড উবার অললে', তেমনি বাঙালীর শ্রেষ্ঠতাবোধের অহমিকায় আমি অন্ধ নই। জাতটা সদ্গুণ সম্পন্ন, এটা গৌরবের বিষয়, তবে সমান মাত্রায় অপদার্থ, এটা অধিক গ্লানিকর। বাঙালী মায়ের গর্ভজাত, আমার এ পরিচয়টা আমার কাছে গৌরবের না লজ্জার, তোমায় আমি বলে বোঝাতে পারব না।

মিঃ ব্যালার্ডের মন্তব্যে আমি খুব একটা আহত হলাম এমন নয়। কারণ দুটো। প্রথমতঃ বরাবর বাঙলার বাইরে বাস করেছি, বাঙালী সম্বন্ধে নানান কথা শুনে এসেছি। গা সওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, বুঝতে পারছিলাম, বাঙালী সম্বন্ধে মিঃ ব্যালার্ডের ধারণা যথেষ্ট বিদ্বেষদুষ্ট। কেন এমন হয়েছে জানবার কৌতূহল জাগছিল, মনে মনে স্থির করেছিলাম ওঁকে দিয়ে অনেক কথা বলাতে হবে। একটু ট্যাক্টফুল এ্যাপ্রোচ দরকার।

বললাম, কথা হচ্ছিল, এফ্‌ট আর এ্যাচিভমেণ্টের চুলচেরা ডেবিট-ক্রেডিট না করে এগিয়ে যাওয়ার। জীবন সম্বন্ধে এমন দৃষ্টিভঙ্গি সর্বৈব ইষ্ট নাও হতে পারে। তাছাড়া এমন নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে স্বীকার্য হলেও, একটা গোটা জাতের সার্বিক উন্নতির সোজা ফরমুলা হতে পারে না। আপনার বিশ্বাস—

—এবার তুমি যথার্থ বাঙালীর মত কথা বলেছ। সেই বর্ণাঢ্য এ্যানটাগনিজম্— চম্বক আছে, সিদ্ধান্ত নেই। তবে, যেহেতু আমরা জাত তার্কিক, বলতে পারো, পণ্ডিতে শিখিয়েছেন, এন্ ইন্‌ডিভিজুয়াল গ্রোজ নট ইউনিডাইরেকশনলি, বাট বাই এ কন্‌টিনিউইঙ অসিলেশ্‌ন্ বিটুইন্ টু পোল্‌স। বা স্মরণ করো হোয়াইটহেডের দেওয়া প্রগ্রেসের সেই সুগোল পরিভাষা, টু ক্রিয়েট চেঞ্জ এমিড্ অর্ডার, এ্যাণ্ড অর্ডার এমিড চেঞ্জ। তাছাড়া আছে প্রগ্রেসের স্পাইরাল থিওরি, এবং ওই জাতের অনেক বাকবিতণ্ডা। দেখ, এসব এ্যাকাডেমিশিয়ানদের কচ্‌কচি, এতে তর্ক হবে, কাজ হবে না। তবে তোমার আমার আউটলুকে তফাৎ আছে। লেট্ মি এক্‌সপ্লেন্ ছাট্। মূলকথা এই, ভাল হতে, সজ্জন চরিত্রবান সোনাছেলে হতে আমি জন্মাইনি। জন্মেছি সার্থক হতে। দুর্যোধনের সেই সুখী নহি জয়ী আমি'; অতটা প্যারোকিয়ল্ না হলেও, ওরই কাছাকাছি। আই এ্যাম গিফটেড্ উইথ সামথিং লাইক ফরটিফাইভ্ আউন্স অফ্ হাইলি কনভলিউটেড্ গ্রে-ম্যাটার। জীবনে যতদূর সম্ভব সার্থক হওয়াই আমার মহত্তম ধর্ম। সেই হ'ল আমার আলটিমেট্ এ্যাবসলিউট সুপ্রীম রিয়ালিটি। মেটাফিজিকল বা ইনটালেকচুয়াল সার্থকতা নয়, স্থূল বস্তুবাদের উর্দ্ধে সৃজনধর্মী সার্থকতা,— সেই হ'ল আমার এ্যাসপিরেশন্। টু একসেল্ ইন ক্রিয়েটিভ্ এ্যাচিভমেণ্টস্।

—প্রথম দুটোকে রেপুডিয়েট—

যেন আমার কথা কানেই যায়নি, মিঃ ব্যালার্ড বলতে থাকলেন, আগে বিচার করা যাক, এভোলিউশন-এর যথার্থ সংজ্ঞা কি। আমি বুঝেছি এই, প্রকৃতির মাঝে বিধাতা অকৃপণ হাতে ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে রেখেছেন। সর্বত্র, মোর অর লেস্ কনসিস্‌টেণ্টলি। এমনি সব ন্যাচুরাল রিসোর্সেসকে ক্রমান্বয়ে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর উন্নত থেকে উন্নততর সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা, টু রিশেপ ম্যাটার ইনটু ইটস্ ফাইনার ফর্মস, সেই হ'ল প্রগতি, এভোলিউশন। যারা তা যতবেশী করতে পেরেছে, তারা তত সমৃদ্ধ, অন্যকথায় প্রগতিশীল। আমরা তো আবার টেকনিক্‌কে বলেছি শিল্প, চতুঃষষ্টিকলার বিশিষ্ট অঙ্গ বলে ধরতে পারি। তবে সাংস্কৃতিক সিভিণ্ড' এ যাঁরা কুলীন শ্রেণীর, যেমন কিনা ঘটি-না-ডোবা তাল-পুকুর-সর্বস্ব বাঙালী, তাঁরা এমন বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবকে অশুচিও স্বীকরণের অযোগ্য বিবেচনা করবেন, এই আমার শোক। আমি কিছু কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়ে চাই, যারা আশ্চর্য প্রতিভাবান হবে, জড় পদার্থের এই রূপান্তরণে। আয়ত্তের মধ্যে যা পাবে

তাই দিয়েই গড়ে তুলবে কল্যাণকর কিছু। সায়নেক্‌টিক্ থিওরি কি বোঝ? কথাটা গ্রীক ওরিজিনের। ব্যবহারিক অর্থে, ডেভেলাপমেন্ট্ অফ দি ক্রিয়েটিভ্ ফ্যাকালটি। আমাদের দেশে কথাটা উপহাসের মত শোনায়। এর জন্যে চাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক এনভায়রণ্‌মেন্ট। জন্মাবধি চেতনায়, স্বভাবে, মানুষের সহজাত স্বাধীন উচ্চাশায় ইনডিউস্ করতে হবে এই বোধ, জাগিয়ে তুলতে হবে সৃজনশীলতার সব ভারচুগুলো। গড়ার জন্য গড়, গড়ার জন্য ভাঙ্গ, অবসোলেন্স্‌কে নসটালজিয়া'র কুলুপ চাবিতে বেঁধনা, ত্বরান্বিত কর ইন্‌ভিনসিবিলিটি অফ দি নিউ-কে। কি আশ্চর্য্য। আমি এমন লম্বা একটা ডিসকোর্স দিয়ে গেলাম, আর তুমি রে রে করে উঠলে না? স্কোপ, মোটিভেশন্, এ্যানটিসিডেন্ট প্রোবাবিলিটি—?

আপনি বলুন। শুনতে ভাল লাগছিল। আমি সমর্থনসূচক হাসলাম।

—এমনিভাবে বড় হয় জাপানী, জার্মান—আমার বিবেচনায় পৃথিবীর দু'টো শ্রেষ্ঠ জাত। আর বাঙালী কি শেখে? পাঁচ পুরুষ আগে ফরমুলেট করা সোশাল আর মরাল এথিকস্, নসটালজিক্ ঐতিহ্যপ্রীতি, আর যতটুকু চাই তার প্রত্যাশায় দু'হাত বাড়িয়ে দেহি দেহি—এফেমিনেট্ সঙ্ঘবদ্ধ বিক্ষোভ। তাই এই জাতটাকে ঘৃণা করি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাল—সেই ভাল, যত দুঃস্থ, যত ক্লিষ্ট, যত অভিযোগ কাতর, ভিন্নভাবে দেখতে গেলে যত কর্মবিমুখ অনুভূতিপ্রবণ অপদার্থ, সেই ভাল হয়ে থাকার ন্যক্কারজনক মোটিভ্ নিয়ে এমন দূর্লভ মানবজন্মটার—বিধাতার আশীষ পঁয়তাল্লিশ আউন্স অমন হাইলি কনভলিউটেড গ্রে-ম্যাটারের জঘন্য অপচয় করছে, আর ক্ষীণকণ্ঠে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে সে ক্লিষ্ট, সে বঞ্চিত, এক্সপ্লয়টেড্। তুমি হাসছ?

—হ্যাঁ, আপনার এক্‌জাজারেশন আমায় হাসাল। বাঙালী সম্বন্ধে আপনার ধারণায় অথেনটিসিটি থাকলেও, বড় বিদ্বেষদুষ্ট। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আপনি আপনার মার কাছ থেকে প্রণয়ঘটিত কোন আঘাত পেয়ে থাকবেন অল্প বয়সে। আপনার বিদ্বেষ তারই প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে, পরে সঙ্গত কারণে বাড়তে থেকেছে। মনে হয়, আমার অনুমান ভুল নয়।

এবার অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না মিঃ ব্যালার্ড। করবদ্ধ হুইস্কির গেলাস, দূরে মথুরা-রোডের দিকে তাকিয়ে আছেন।

লনে আলো নেই। বাড়ীর বারান্দায় ফ্লুরসেন্ট আলো, আর মথুরারোডের

মারকারি ভেপার ল্যাম্পের আলোর মাঝখানে অন্ধকারে বসে আছি আমরা। ঠাণ্ডা ঘাসে একটা দুটো মশা উড়ছে।

একটুকরো বরফ তুলে গেলাসে ছাড়লেন মিঃ ব্যালার্ড। গেলাসটা নাড়িয়ে সেটাকে হুইস্কিতে পাক খাওয়ালেন। তারপর একবার মুখে তুলে চুমুক না দিয়েই নাবিয়ে রাখলেন।

বললেন, স্বভাবে তুমি স্পষ্টবক্তা আর সত্যান্বেষী কথাটা তোমার এ্যাপরেজল্ রিপোর্টে আমি লিখব। আর একটা ইনসেনটিভ্ তোমার প্রাপ্য। একটা গল্প।

এক চুমুকে অনেকটা হুইস্কি খেলেন মিঃ ব্যালার্ড।

দূরে মথুরা রোডের বুকের ওপর দিয়ে ভারবাহী ট্রাক যাচ্ছে। ফরিদাবাদের যন্ত্রসঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন সুরটা এখন ক্লান্ত। ক্রমে হয় আরও ক্লান্ত হবে আর নয় রাতের স্তব্ধতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শব্দ আরও তীক্ষ্ণ শোনাবে। অন্ধকার যত গভীর হচ্ছে রাস্তার মারকারি ভেপার ল্যাম্পের আলোগুলো তত উজ্জ্বল হচ্ছে। আমাদের দুজনের মাঝখানে হঠাৎ মৌনতা এসে জমাট বেঁধেছে।

দুদিন এইভাবে বসেছিলাম আমরা, দু-সন্ধ্যায়। তার মাঝে মিঃ ব্যালার্ডের মুখে প্রশন্-ব্লুর, এই গল্প শুনলাম।

মিঃ ব্যালার্ড আবার বলতে আরম্ভ করলেন, তুমি এমন কিছু ভুল বলনি। বুঝতে পারি, আমার অনেক ধারণা জন্ম নিয়েছে ওই প্রতিক্রিয়ার রসায়নে। এটা বুঝেছি বলেই আর একটা সদগুণ পেয়েছি। সেটা ইনট্রসপেকশন্, আত্মবিশ্লেষণের। পেডাগজিষ্টরা যে শক্ত কথাটা বলেছেন, 'এ্যাপারসেপ্শন অফ প্রেজেনটেশন মাস্', বা ধর অন্যভাবে মার্কসিস্ট দর্শনে যাকে 'ডায়ালেকটিক্ নেগেশন্ বলা হয়েছে, আমার জীবনে তার প্রভাব কিছু কম নয়। এমন হয়েছে, আমার দীর্ঘদিনের ধারণা হঠাৎ একদিন নূতন রিভিলেশন-এর মুখোমুখি হয়েছে, মনে আত্মগ্লানির সৃষ্টি করেছে তখন আবার আমি নূতন করে বিচার করেছি, বদলেছি। প্রাণসৃষ্টির একেবারে আদিপর্বে কি ঘটেছিল জান?

—বলুন।

—এ্যামিনো এ্যাসিড থেকে প্রাণের সৃষ্টি। প্রাণের তালিকায় সম্ভবতঃ কুড়ি ধরনের এ্যামিনো এ্যাসিড আছে। বিষ্ণুর নাভিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মা এমনি কিছু এ্যামিনো এ্যাসিড নিয়ে, বিশেষ টেম্পারেচর প্রেসর ইত্যাদির

যোগাযোগে গড়ে ফেললেন যে বস্তু, আজকের জীববিজ্ঞানী তাকে বলেন প্রোটোপ্লাজম্। প্রাণ আর জড় পদার্থের সেই হ'ল সেতুবন্ধন। এরপর আছে, নিউক্লিয়েশন অফ সেল, যা ক্রমে আরও জটিলতর রূপ পেয়ে অন্তে প্রাণ সৃষ্টি করল। তবে গোড়ার কথা হ'ল, জীবের প্রোটোপ্লাজম রইল নগ্ন নধর রূপ নিয়ে, আর উদ্ভিদ তার চারপাশে গড়ে তুলল এক কঠিন খোল। ফলে শুধুমাত্র জীব প্রোটোপ্লাজম্-এর পক্ষেই সম্ভব হ'ল, ফাইনার অরগনস্, যেমন কিনা, সেন্‌শেসন, ভলান্টারি মুভমেণ্ট, আর সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্‌শন এই জৈবিক রীতিগুলো ডেভেলপ্ করা। উদ্ভিদের শক্তখোল এগুলো সম্ভব হতে দিল না। থিওরিটা আংশিক মিথ্যা, পরে আমাদের জগদীশ বোস তা প্রমাণ করেছেন। তবে রিসেপ্‌টিভিটির এই হ'ল সবচেয়ে প্রিমিটিভ সাফল্য, এ্যান এ্যাবসলিউটলি ইররেফিউটেবল্ নর্ম অফ লাইফ ওয়াজ সেট ফোর্থ। তারপর থেকে সংস্কৃতি সিভিলাইজেশন্ এই ধর্মেই শতদলের মত পাপড়ি মেলেছে। স্থিতির সুরক্ষার কঠিন বহিরাবরণে আত্মসমর্পণ করে নিরঙ্কুশ জড়তা খোঁজেনি। আর আজ দেখ, এ যুগের বাঙালী—?

দেখলাম অনীহায় মুখবিকৃতি হ'ল মিঃ ব্যালার্ডের। বললেন, বলতে পার, গত পঞ্চাশবছরে বাঙালী তার জাতীয় জীবনে কোন্ নূতন আদর্শটা গ্রহণ করেছে? তার বন্ধ্যা সংস্কৃতি নিছক টিকে থাকার দায়ে বৃহত্তর বৃত্ত থেকে কোন পুষ্টি কোন সঞ্জীবনী সুধাটা আহরণ করেছে? একদিকে এই শোচনীয় ক্লীবত্ব আর অন্যদিকে—, আমাদের ট্রেডেই ধর, মাত্র একশো বছরের ইতিহাস, ম্যানুয়ল স্কীল থেকে উঠল অটোমেশনে, তারপর নিউমরিকল কণ্ট্রোল, টেপ-প্রোগ্রামিং, ডিজিটল্-রিড্-আউট্ আরও দেখ, কনভেনশনল মেটল্ কাটিং ছেড়ে স্পার্ক-এরোশন, ই-ডি-এম, প্লাজমা—বিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ঢেউ এসেই যাচ্ছে। আড়ালে অনেক ব্যর্থতা, বহু ক্ষয়ক্ষতি, তবে সবকিছুর শেষ ফল তো জীবনের এই বিবর্তিত সম্ভ্রান্ততর প্রতিচ্ছবি। এর মূলে আছে ওই জীবন তৃষা, দ্যাট লাষ্ট ফর লাইফ্, যাকে তুমি বলেছ 'টু গো এহেড্', আমি বলেছি জড়পদার্থ রূপান্তরণের প্রবণতা। কিন্তু বাঙালী তো ছুটোর কিছুই শিখল না! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যর্থতা বিক্ষোভ আর অন্তর্জ্বালা নিয়ে সে হ'ল স্থবির। প্রবঞ্চক পৃথিবীর রুদ্ধ ভাঁড়ারের সামনে মেলে ধরল তার ভিক্ষাপাত্র। দুর্দান্ত ভিখারী রক্তচক্ষে দাবী জানাল, আমার অর্জিত পুণ্যফলের যতটুকু থেকে আমি বঞ্চিত তোমার ওই স্ফীত সঞ্চয়

থেকে তার ক্ষতিপূরণ কর। না হলে, এই আমি থামলাম। তোমার প্রগতির রথচক্র আমার পাঁজর গুঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারবেনা।

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, সমাজের যাঁরা ক্রিটিক তাঁরা চর্চা করেন করাপশনের। বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মাঝখানে কর্মিডেবল্ ফাঁকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বারবার প্যানিক জাগান। গত শতাব্দীর ইতিহাস উজ্জ্বল করা সাম্যবাদী বিপ্লবগুলোর নির্যাস থেকে গড়ে তোলেন সমাজ শোধনের সম্ভাব্য ডগ্‌মা। ভেবে দেখ, হয় সব, শুধু ওই 'টু গো এহেড্' ছাড়া। সন্দেহ কি, ভুল ভ্রান্তি করাপশন আর সম্ভাব্য সবরকম বিষ আজ সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য করে তুলেছে। তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, ব্যর্থতা এই লেশনটুকুও দিয়ে গেল না, এভরি ইভল্ উড হ্যাভ ষ্টপড্, হ্যাড উই হ্যাভ দ 'গো' ইন আস ওয়ান্স। আর তারপর, সেই শুভারম্ভ থেকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধি— সেও অকল্পনীয় হ'ত না। তাতো বাঙালী বুঝল না, আজ সমাজের যতপ্রকার সম্ভব 'কু'য়ের ফাঁসে জড়িয়ে সর্বগ্রাসী ডিকে'র দিন গুনছে। আশ্চর্য এই, তবু চৈতন্য হয়নি। তবু চায়, তার উত্তরসূরীকে শিখিয়ে যাবে পরম্পরার সমতা রক্ষার সেই উষর নীতি। ঐতিহ্যের পূতিগন্ধময় শবদেহটার উত্তরাধিকার ভিন্ন আর কিছু দিয়ে যাবার থাকবে না।

—ব্যর্থ জাতির তালিকায় একমাত্র নামতো বাঙালীর নয়। তাছাড়া জার্মান বা জাপানীর সমকক্ষতার যোগ্যতা আছে কিনা সেটাও বিচার্য।

—সমকক্ষতার প্রশ্নতো আমি তুলিনি। তুমি তুললে। অফ্‌কোর্স, আই ডু নট ডিসপিউট্ রেলেভেন্স অফ দ ইস্যু। তবে আমার মত যদি জানতে চেয়ে থাকো তবে একটু দর্শনের তত্ত্বকথা শুনতে হবে। জার্মান দার্শনিক নীৎসের একটা থিওরী আছে। সর্বকালের চিন্তাশীল মানুষকে তিনি ভাগ করেছেন দু'শ্রেণীতে। এ্যাপোলোনিয়ন ইনটালেক্ট্ আর ডায়নোশিয়ন ইনটিউশন—এই দুই যাতের কৌলিন্যের পরিচয়। জার্মান জাপানী প্রথম শ্রেণীর, আদি ও অকৃত্রিম। এটা ওয়াণ্টার ব্যালার্ডের থিওরী, বাঙালীও ওই একই শ্রেণীর, তবে ঘরের শত্রু বিভীষণের মত প্রথমের সব গুণ আত্মসাৎ করে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় দলে। এমন যদি না হ'ত বাঙালীকে নিয়ে শিরঃপীড়া ঘটাবার আমার কোন কারণ ছিল না।

গল্পে একথা গুলো লেখার আগে কয়েকজন বিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনা

করেছি। জরিপ করার চেষ্টা করেছি, সিদ্ধান্ত গুলোর প্রসার বা গভীরতা কতটা। তৃণ স্তূপে অঙ্গার খণ্ড ছাড়লে যে ফল হয়, অর্থাৎ পুঞ্জীভূত ধূম, তাছাড়া আর কোন ফল হয়নি।

মিঃ ব্যালার্ড সোসিওলজির গবেষক নন, সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেননি। তবু বাঙালীর অপরিপূর্ণতা ওঁর দিবারাত্রের ক্ষোভ। ঘৃণাবিতৃষ্ণার যতটুকু বহিঃপ্রকাশ, বুঝতে পারছিলাম, অন্তরে শুভচিন্তার ফল্গুধারা তার চেয়ে অনেক খরস্রোতা। তা না হলে একজন মেশিনটুল ডিজাইনারকে একদিকে বেদান্তদর্শন থেকে আরম্ভ করে, স্কেপ্‌টিক্ নিহিলিজম, ইকোলজি, সায়নেকটিস্ এসব ছাড়িয়ে অন্য দিকে জেনেটিকস্, মলিকিউলার বায়োলজি অফ ক্রোমোসোম্‌স ইত্যাদির এই বিপুল পরিধির পরিক্রমা করতে হ'ত না। পরিকল্পনা গড়তে হ'ত না আদর্শবাদী বাঙালীর সঙ্গে স্থূল বস্তুবাদী পাঞ্জাবীর জেনেটিক্ মিউটেশন্ ঘটিয়ে এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করার। তাদের নিয়ে গড়ে তোলার এক অভিনব 'অগোনিয়া-দ্বীপ', যেমন তাঁর স্বজাতি ইংরেজকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন উইলিয়ম ম্যাকডুগাল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরে যেতে হবে আমায়, ক্রমে এই ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সেণ্টারপিসের ওপর হুইস্কির বোতলটা অবহেলিত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি আমার গেলাসে এতক্ষণে ছোট দুটো চুমুক দিয়েছি। মিঃ ব্যালার্ড চতুর্থবার বরফের কিউব তুলে নিজের গেলাসে ছাড়লেন।

আমি বললাম, বাঙালী সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কিছু কিছু বুঝছি। আমার ইনসেন্‌টিভ সম্বন্ধে কিন্তু আমি বেশী কনসারনড্। আপনি গল্প বলুন।

—আমার গল্প এই মনোভাব থেকে ইনসেপারেবল—বা যদি বেণীবদ্ধ বলি, আরও ভাল হয়। যদি এ বোঝ, গল্প বুঝবে। না হলে সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে দু'দশটা গাল আমায় দিতে পার। ওটা আমার প্রাপ্য! এই পঙ্ক তিলক আমার গৌরব—সাধ করে কপালে পরেছি।

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে, এ গল্পের কাঁচামাল যদি কোন সুসাহিত্যিকের হাতে পড়ত, তিনি হয়ত মাত্র দুটো দিনের দুটো ঘটনা নিয়ে একটা রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প লিখতেন। আমি যে একে এতটা সম্প্রসারিত করছি তার কারণ গল্প লেখার থেকে বড় উদ্দেশ্য আমার মিঃ ব্যালার্ডকে চিত্রিত করা। নিন্দুকে বলতে পারেন, বিশল্যকরণী বেছে আনার এলেম নেই, তাই এই গন্ধমাদন।

মা সুশীলা কি ভাবে একজন ইংরেজের পরিণীতা হলেন সে কাহিনী আমি

জানতে পারিনি। জানতে পেরেছিলাম, তিনি ধর্মকুল সব ছেড়েছিলেন, ছাড়েননি তাঁর প্রকৃতি। বাঙালীর অপরিণামদর্শী সেই স্নেহান্ধ মাতৃপ্রকৃতি, যা মিঃ ব্যালার্ডের মতে, আজকের কম্‌পিটিটিভ্‌ পৃথিবীতে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ে থাকার মুখ্য কারণ! কথাটা নূতন নয়। সাতকোটি সন্তানকে মুগ্ধা জননী যে মানুষ না করে নিছক বাঙালী করে রেখেছেন, এ উইলিয়ম ওয়ালটার ব্যালার্ডের কোন অভিনব সিদ্ধান্ত নয়।

সুশীলা ছিলেন সেই শ্রেণীর যাঁরা বিত্তবৈভব ঐশ্বর্য ইত্যাদিকে সততার পাশাপাশি স্থান দিতে পারেন না। বাইবেল বাক্যের উল্লেখ হয়েছিল, সূচীছিদ্র দিয়ে উট গলে যেতে পারে, ধনী কখনও ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না। মিঃ ব্যালার্ড এই প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে গিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সে হ'ল বাঙালীর মধ্যবিত্ত প্রীতি। এবং সেই ধর্মে প্রভাবিত এমন এক সমাজ ব্যবস্থা, যাতে উন্মেষিত জ্ঞানবুদ্ধি চেতনালব্ধ বাঙালী তরুণ তার ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর হতাশায় উপলব্ধি করে, সে কতবড় কাঁচামাল।

বলেছিলেন, সিনেমায়, নাটকে—সাহিত্যে, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে, ট্রামে, বাসে, রকে, চায়ের দোকানে সর্বত্র দেখতে পাবে, যে সমস্যায় বাঙালী দুর্গত শুধুমাত্র তারই চর্বিত চর্বণ। পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সমকালীন সমস্যার রূপ গুরুত্ব গতি প্রকৃতি নিয়ে এ্যাকাডেমিক্ গবেষণা হচ্ছে। ছবি আঁকা হচ্ছে যুগযন্ত্রণার। এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, পারসেপশন থেকে জীবনের ভিন্নতর ইমেজগুলোই লুপ্ত হয়ে গেছে। অর হ্যাজবিন মেড্‌ টু ম্যানিফেস্ট্‌ এজ্‌ সামথিং টু এনভি, টু বি লুকড্‌ এট্‌ উইথ কনটেমপট্‌—এ্যাণ্ড নট টু পোজেস্‌। চিন্তার বিষয়, উন্মেযোন্মুখ চেতনাকে এই ভাবধারা কি ভাবে মোহাবিষ্ট করে বন্ধ্যা করে তুলছে। যাকে আমরা মধ্যবিত্ততা বলে মনে করি, জীবন যাত্রার সেই মান, যা সমৃদ্ধ দেশগুলোর চোখে অকল্পনীয় দারিদ্র, সে এমন কোন আপতিক সমস্যা নয়, যার থেকে আমরা কখনও উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। দারিদ্র আমাদের সেই শ্যামসমান ফ্যাসিনেশন, যাকে আমরা করে রেখেছি আমাদের সংহতির আধার ভূমি, কৃষ্টির ধারক আর পোষক।

পিতা ডগ্‌লস ব্যালার্ড প্রৌঢ়ত্বের দোড় গোড়ায় এসে হঠাৎ স্ত্রী সুশীলার এই আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। লোকান্তরে ঈশ্বর চরণে ঠাঁই পাবার সাধনায় ক্রমে জীবন নির্বাহের সব উদ্যম ছেড়ে ঘোর বস্তুবাদ বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন।

এর আশুফল এই হ'ল, আই. এস্-সি পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার সব আশা জলাঞ্জলী দিয়ে মেধাবী ওয়াল্টার কারখানায় ঢুকল নগণ্য কাটার গ্রাইণ্ডার-এর শিক্ষানবীশ হয়ে।

কুড়ি বছরের অপরিণত তরুণ ওয়াল্টার। কাটার গ্রাউণ্ডার অপারেটর, বুকভরা স্বপ্ন—শিল্পী হ'বে। বিধাতা প্রতিভা দিয়েছিলেন, উদ্যম দিয়েছিলেন, দেননি সার্থকতার কোন সুযোগ। বড় গভীর যাতনা। সূচাগ্র পরিমাণ, তবে সমধিক তীক্ষ্ণ।

উদ্যম হারায়নি ওয়াল্টার। যতটুকু সুযোগ পায় ছবি আঁকে। সামর্থ্যে কুলায় না। তাই ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। যেচে ভাব করে ড্রইং অফিসের ড্রাফট্সম্যানদের সঙ্গে। সেখান থেকে জোটে বাড়তি ঝাড়তি কাগজ পেনসিল রবার চাইনীজ ইংকের দাক্ষিণ্য। বিনিময়ে ছবি এঁকে দেয়! পোট্রেটের হাত বড় পটু। পঁচিশ বছর আগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দাদামশাইকে চল্লিশ বছর পুরনো গ্রুপফটো থেকে যেন জ্যান্ত তুলে এনে সামনে রেখে দেয়। পারিশ্রমিক শুকনো সাধুবাদ। খাতির বাড়ে।

ছোট ফ্যাক্টারী। ঘটনা বিশ বছর আগের। লেবর ল'য়ের এত কড়াকড়ি ছিলনা। খোশামোদ তদ্বির করে পাকাপাকি নাইট ডিউটি করিয়ে নিল। ইউনিভারসিটি জয়েন করল ওয়াল্টার। পাশ করল বি. এস্-সি। এই দু'বছরে মেশিন অপারেটর থেকে হয়েছে মনিটর, মনিটর থেকে চার্জহ্যাণ্ড। এবার সায়ান্স গ্রাজুয়েট হওয়ায় আবার পদোন্নতি হ'ল। মেনটেনেন্স সুপারভাইজার হয়ে গেল ওয়াল্টার।

ওদিকে পিতা রিটায়ার করেছেন। ওয়াল্টারের পর দুটো বোন। তাদের বিয়ে আর সংসারের পুরো দায় এসে পড়ল ঘাড়ে। সাধ্যমত নিষ্ঠায় সে ভার বয়ে চলেছিল ওয়াল্টার। সংসারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়িয়ে চলেছিল ওভারটাইমের মাত্রা। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে কাজে চলে যায়। ফেরে, তখন রাত গভীর। তবু রাত জেগে ছবি আঁকে। রবিবারে ছুটির দিনে এমারজেন্সি মেনটেনেন্স না থাকলে কম করে আঠারো ঘণ্টা কাটায় তুলি পেনসিল নিয়ে। ক্যান্টিনে চা সস্তা। ঘুম পেলে সবাই ঘুমায়, ওয়াল্টার চা খায়।

সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নয়। এটা পরিবারের গৌরব। মা বাবার বিশ্বাস, অভাব অনটনের কাঁটাতারেই সততা সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রসঙ্গতঃ মিঃ ব্যালার্ডের মন্তব্য, কোন ক্লিনিক্যাল ল্যাবে ফেটাস দেখেছ; ভ্রূণের রকমারি বিকৃতি। ফরমালিনের জারে বছরের পর বছর কেমন আনডিকমপোজড থাকে। এ হ'ল তেমনি জীবন দর্শন। অপরিপূর্ণতাকে রক্ষণশীলতার জারক রাস প্রিসার্ভ করে কেমন চমৎকার একজিবিট্ তৈরী হয়েছে। দেখে মোহিত হচ্ছে বিশ্বজন।

আজ মিঃ ব্যালার্ডকে নিয়ে গল্প লিখতে বসে অসংখ্য সংস্কারে ক্ষতবিক্ষত, পাণ্ডুলিপিটার পাতাগুলো বারবার পালটে দেখতে হচ্ছে আমায়। মেকানিকস্, জেনেটিকস্ দর্শন বহুচর্চিত বাঙালীর জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ, ইংরিজি বাঙলা মিলিয়ে গুরুপাক-এই যা তৈরী হচ্ছে তা কতদূর পরিবেশন যোগ্য এই দ্বিধায় কলম এগোতে চাইছে না।

বস্তুতঃ, বর্তমানে আমরা দুজনেই বাঙালীর সমকালীন সমস্যা থেকে দূরে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবন যাপন করছি। সেদিন মিঃ ব্যালার্ডকে খুঁচিয়ে তোলার জন্যই বাজে একটা উপমা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম বিকিনি প'রে ফেনিল হাঁটুজলে যারা প্রমোদ বিলাসে মত্ত, সমুদ্রের গভীরতায় তাদের আগ্রহ বা জ্ঞান কতটুকু ?

প্রশ্নটা বিদ্রূপে শাণিত। হয়ত আজকের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যালার্ডকে এ প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু বিশ বছর আগে যে তরুণ ওয়াল্টার মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাইকেলে হাওয়া ভরবার দুটো পয়সা খুঁজে পেতনা বাক্সের তলা হাতড়েও, তাকে এ প্রশ্ন করা যায় না।

আমার এ গল্প তাকে নিয়েই।

বেপরোয়া ওভারটাইম, রাতের পর রাত জেগে ছবি আঁকা, সংসারের দৈন্যের সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে যুঝে যাওয়া, এইভাবেই চলছিল। গতানুগতিক হলেও, জীবনের ছন্দ ছিল সহজ।

এরপর ঝড় উঠল, ভুল করল ওয়াল্টার। তার জীবনের মহত্তম ভুল। ভালবেসে ফেলল একজনকে। সময়ে বুঝতে পারেনি, রেলে কাটা ছিন্নমুণ্ডে বোবা চোখ দেখেনি ছেলেবেলায়, না হ'লে, এমন একটা গর্হিত অপকর্ম করে ফেলে জীবনকে এত দুর্বিসহ করে তুলত না।

মেয়েটি তাদের পরিবারের অপরিচিতা ছিলনা। গলদ ছিল এই—সে ধনী কন্যা।

এ প্রেম মা সুশীলার সমর্থন পেল না।

শুধু এইতেই শেষ হয়নি। এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে একটা কুৎসিত কলহের সৃষ্টি হয়। ছেলেকে শত্রুপক্ষের হাত থেকে উদ্ধার করতে সুশীলা যে অস্ত্র বেছে নেন সে হ'ল তাঁর রসনা। যুদ্ধে জয় তাঁরই হয়। তবে জিতে যা উদ্ধার করলেন সে তাঁরই অস্ত্রে বিধ্বস্ত এক ভ্রষ্টশ্রী দেশ। তখন তার ওপর পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিজের ক্ষতিপূরণের আর কোন সম্ভাবনা ছিলনা।

—দেখ হিরণ্ময়, আমি প্রিভান্সেস ডিসক্লোজ করতে বসিনি, মেরিনার সঙ্গে আমার এ্যাফেয়ার মনে হয়না খুব একটা গভীর হয়েছিল, এমন ঘটনা বহু ঘটেছে। মেরিনার মোহ এতবড় ছিলনা যা ভুলতে আজ আমায় এই বিচ্ছিন্নতার আয়োজন করতে হয়েছে। আমি আমার সমস্ত বোধশক্তি একত্র করে এই কথাটা বুঝতে পারিনা, আমার মা, যিনি ভালবাসার জন্য সব ছাড়লেন, আর একটা ভালবাসার ক্ষেত্রে কিভাবে এমন সঙ্কীর্ণমনা হয়ে পড়লেন।

চুপ করেছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। আমি নীরব শ্রোতা। আমার কোন মন্তব্যে ওঁর ভাবনা ব্যাহত না হয় সেজন্য সতর্ক ছিলাম। উনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

—দেখ, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সহবাস—কো-একজিসটেন্সের সবচেয়ে ভাইটাল নর্ম হ'ল ট্রাষ্ট—আস্থা। লাভ্, এফেক্‌শন, এসব জন্ম নেয় র‍্যাশনল্ নয় ইমোশনল্ গ্রাউণ্ডে। তাই সৃষ্টি হয় যত সহজে, নষ্ট হয় তত সহজে। ট্রাষ্ট্ ইজ্ নট্ এ্যাজ এফেমেরল এ্যাজ দ্যাট। তখন আমার বয়স অল্প, সংসারের স্বার্থে জীবনের সব মোহ, এমন কি বিধিদত্ত আমার অমন শিল্প প্রতিভা, তাও ত্যাগ করেছিলাম। মানুষের অসাধ্য শ্রম করেছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। সেই বয়সের অনুভূতিপ্রবণ মন বহু অপমান বহু লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। ক্রীতদাসের মত নিরুত্তর থেকেছি। তবু প্রয়োজনে মার এক তিল আস্থা আমি পেলাম না। যা পেয়েছিলাম সে ছিল তাঁর ক্লীব মমতা, বাৎসল্য—যা আমার আর মেরিনার এই এ্যাফেয়ারের কষ্ঠি পাথরে যাচাই হতেই মিথ্যে হয়ে গেল। মাকে কথা দিয়েছিলাম, মেরিনা আমাদের সংসারের স্বার্থের সামনে এসে দাঁড়াতে না পারে, সে দায়িত্ব আমার। তাতে ফল হয়নি। তারপর ঝগড়ার কথা বললাম, বলতে রুচিতে বাধে এমনি জঘন্য এক ঘটনা। লজ্জা, গ্লানি, ক্ষোভ

আর কিছুটা বা আশাভঙ্গের বৈরাগ্য, সেদিন আমাকে পাথর করে তুলেছিল। মার চোখে সেটা একটা রক্তমাংসে গড়া মেয়ের বিরহে আমার কাতরতা, এরচেয়ে বেশী মর্যাদা পেল না। সেই অনাস্থার বিষ সেদিন থেকে বহন করছি। সম্ভবত তারই প্রতিক্রীয়ার ফল, স্নেহ মমতা অনুরাগ এই সব সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়েছিলাম। আজও বাদ দিয়েই চলেছি। যাকে ঘনিষ্ঠ বলে জীবনে স্বীকৃতি দি, দেখি সে আস্থার কতটা যোগ্য, নিজেকেও তার আস্থার উপযুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করি। তোমার কাছ থেকেও এমনি আশা করব। হিরণ্ময়, তুমি শুনছ না ?

আমি সত্যিই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ক্ষমা চাইলাম মিঃ ব্যালার্ডের কাছ থেকে।

ভাবছিলাম, মা সুশীলা মারা গেছেন দীর্ঘদিন। ওয়াল্টার এখনও জীবিত। আরও অনেকগুলো বছর বাঁচতে হবে তাকে। মেরিনার ব্যাপার নিয়ে মা আর ছেলের মধ্যে যে বিরোধ তার বিচার হবে কোন এথিকস্ দিয়ে। জীবনের প্রান্তে দাড়িয়ে মা একথাটা কেন বোঝেননি তাঁর সুখদুঃখ স্বল্পায়ু। ছেলের সামনে পড়ে রইল দুস্তর জীবন, আর সেই পিঞ্জরিত ক্ষোভ যা তার সব ভবিষ্যত সম্ভাবনার মূলে এ্যাসিড কোরোশনের মত ক্ষয়ের চোরা রূপ নেবে। এই চিন্তার সূত্র ধরে শিশুপাঠ্য বইয়ে পড়া কাজী সাহেবের বিচার কাহিনী মনে পড়ল।

একই শিশুর মাতৃত্বের দাবী নিয়ে ন্যায়াধিকরণে উপস্থিত দুই নারী। সত্যান্বেষে ব্যর্থ কাজী শিশুকে দুখণ্ডে বিভক্ত করে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করার বিধান দিলে একনারী শিউরে উঠে তার দাবী প্রত্যাহার করে।

এই দুই কাহিনীর নীতিগত বৈষম্যের কথা চিন্তা করতে করতেই বললাম, আমার বিশ্বাস আপনার মা অনুতপ্ত। তাঁর বিচারে আপনি যতদূর ডিসট্রেসড্ তাতে তাঁর আত্মা—

—ওঃ না না, অসহিষ্ণুর মত স্বর উচ্চ করলেন মি ব্যালার্ড, বললেন, না হিরণ্ময়, বিশেষ দুটো মানুষের আনন্দ বেদনার প্রশ্ন এ নয়। আমায় এত ছোট বিবেচনা কোরোনা—

—না না, মানে আমি শুধু—

—দেখ, হাত তুলে আমায় থামালেন মিঃ ব্যালার্ড, আবার বেশ সংযতভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, দেখ, আমার আর মেরিনার ব্যাপার বিশ বছর পুরানো।

দুটো অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে প্রকৃতির যে অমোঘ নিয়মে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেই সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রেমকে, আমাদের দেশের সর্বরকম প্রেমের ধুয়োধরা সোশাল্ আর মরাল্ এথিকস্ আজ বিশ বছর পরেও স্বীকৃতি দেয়নি। আর যেখানে এ স্বাধীনতা অবাধ, আমি নিজে দেখে এসেছি সেখানে এর কুফল। সে যৌন বিকৃতি আমি সমর্থন করি না। দেখ, যেমন একটা মেগনেট, যেমন মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রের পরিক্রমা, যেমন এ্যাটমে সমসংখ্যক ইলেকট্রন আর প্রোটন, তেমনি অনুশাসনে চালিত এই নিখিল প্রপঞ্চের যাবতীয় সিসটেম যাকে আমরা পরিপূর্ণ সার্থক বলে জেনে এসেছি। এই হল 'ল অফ পোলারিটি'। সমাজের ক্ষেত্রে তেমনি এক পোলারিটি—হেরিডিটি আর ভ্যারিয়েশন্। পরম্পরা আর বিবর্তন। চল্লিশ বছর আগে হেরিডিটির নিয়ম ভঙ্গ করে ভ্যারিয়েশনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন মা—বাবাকে বিয়ে করে। একজন বিধর্মীর ঔরসে আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন। বুঝতেই পারছ, আমার জন্মের বৈধতা প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু এসবের জন্য মাকে কোনদিন অশ্রদ্ধা তো আমি করিনি। আমার শিক্ষা রুচি বিবেকবোধের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি বলেই তো মা সহ্য করতে পারলেন না। আমার ক্ষেত্রেও এই পরম্পরা থেকে বিবর্তনের দিকে ঝোঁকা। তার ফলেই সম্ভব হয়েছিল তাঁর অমন রিএক্শানিষ্ট একসট্রিমিষ্টি আচরণ। ওর কুরুচির চরম নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এই আমার জ্বালা—ওঁর কদর্য অনাস্থা, দি রিটার্ন অফ অল হোয়াট আই হ্যাভ টু ফোরগো ফর হার'—দ্যাট, দ্যাট রুথলেস্ ডিসট্রাষ্ট্।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভেতরের উত্তেজনা দমন করলেন। আবার বলতে আরম্ভ করলেন, তাই বলছিলাম, দুটো মানুষের আনন্দ বেদনার উর্দ্ধে আর একটু ব্যাপক চিন্তা কর। আমরা মনে প্রাণে বাঙালী, দুজনেই জাহির করেছি। এমন সব বাঙালীই করে। অন্য জাতেও করে—করাটা স্বাভাবিক। তবে বাঙালীর মত এমন অন্ধ আত্মম্ভরিতা আর কোন জাতে দেখিনি। ওনলি দিস ব্লাইণ্ড এ্যাকট্ অফ সেল্ফ-লাভ হ্যাজ মেড্ আস সো আনলাভেবল টুডে। ঠিক যেন একটা মস্ত কালো স্ক্রীনের এক পোঁচ লালের ওপর চোখ দুটো চেপে ধরে সবটাকে লালে লাল দেখা। দুদশ পা পিছিয়ে এলেই দেখতে পাব কালোর প্রসারটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত এলারমিঙ্। এতবড় আত্মপ্রেমিক জাতটাকে টেনে দশপা পিছিয়ে এনে কালোর পরিধির মুখোমুখী দাঁড় করাই এ আমার সাধ্যের বাইরে। তাই এই হাজার

মাইল দূরে নিষ্ফল চিন্তার জোট পাকানো ছাড়া আর কি করণীয় আছে বল। ভয় হয়, যুগের এই ক্রান্তি মুহূর্তে যদি এগিয়ে যেতে না পারি, হয়ত তোমার আমার মৃত্তিকা খণ্ডও হাজার দুই বছর পর প্রত্নতাত্ত্বিকের মাইক্রোসকোপের তলায় স্থান পাবে। যেমন হয়েছে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো। সারভাইজালিজম্-এর কটা নূন্যতম রীতিকেও কি আমরা স্বীকার করে নিতে পারব না!

ফরিদাবাদের মেশিন-টুল ফ্যাক্টরীতে মিঃ ব্যালার্ড সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমে একটা এ্যাপরেন্টস স্কুল খুলেছেন। সেখানে, ওঁর নিজের ভাষায়, গুটিবারো মেটিকুলাস্‌লি টেস্টেড্ ছেলে কাজ শেখে। উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে সাতজন অর্থাৎ শতকরা আটান্ন জন বাঙালী। একজন বেতন ভোগী ইনস্ট্রাকটার যদিও আছে, ইস্কুলের এড্‌মিনিসট্রেশন মিঃ ব্যালার্ড নিজেই দেখেন। ছেলেগুলোর প্রতি তার অদ্ভুত ব্যবহার দুদিনে লক্ষ্য করেছিলাম। সে যেমন রূঢ় তেমনি সংবেদনশীল। আমায় বললেন, জার্মানে একটা প্রোভার্ব আছে। 'দার তয়ফেল উইল অলেস জাইন, মুরনিখট্ আইন লেহরলিঙ। শয়তান সব হতে রাজি, একমাত্র শিক্ষানবীশ ছাড়া। বোঝ, ওখানে কেমন ট্রেনিং হয়। আমিও এদের মানুষ করব। সত্যিকারের মানুষ। বিবেকানন্দের স্বপ্নের মানুষ। মেন উইথ রিলায়েবল ব্যাকবোনস্! আই উইস আই কুড্ রিপ্লেস দোজ দে আর বর্ণ উইথ বাই ফোরজিঙ্ সাম ফ্রম রিয়েল হাই টেনসাইল ক্রোমভ্যানাডিয়ম ষ্টিল।

মিঃ ব্যালার্ডের উপার্জন মাসে তিন হাজারের ওপর! সাত বছর ইউরোপে চাকরী করে অনেক সঞ্চয় করে থাকবেন। তবে কনটিনজেন্সি রিজার্ভ বাবদ হাজার কুড়ি টাকার একটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ছাড়া ওঁর উপার্জনের শতকরা ষাটভাগ খরচ হয় দেশে আর বিদেশে গোটা দশেক বাঙালী ছেলেকে বিবেকানন্দের স্বপ্নের মানুষ গড়তে। ক্রোমভ্যানাডিয়াম ষ্টিলের মত মজবুত মেরুদণ্ড গড়েছেন মিঃ ব্যালার্ড।

গল্পে ফেরা যাক্। বছর কুড়ি পঁচিশ আগে মিঃ ব্যালার্ডের নিজের মেরুদণ্ডও বোধ করি একটা সাধারণ বাঙালী ছেলের সাধারণ অস্থির মেরুদণ্ডের মতই কমজোর ছিল। তাই মা সুশীলার মন বা মান রাখতে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, মেরিনাকে ছাড়তে হবে।

ছেড়েছিলেন। এর পরের যে ঘটনা অব্যবহিত, আর মূলতঃ আমার মত

নারীবিদ্বেষীর অনুমান সিদ্ধ, সে হল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আদর্শ প্রেমের সব অশ্রু গদগদ প্রতিশ্রুতি ভুলে মেরিনা কণ্ঠলগ্না হল অন্য এক প্রণয় প্রার্থীর। আর বিশ বছর বাদে ফরিদাবাদে গিয়ে আমি দেখে এলাম প্রিয় লাঞ্ছিত একটা মানুষকে। যা উনি প্রকাশ করতে বিমুখ— সে ওঁর চেতনার কেন্দ্রে বিদ্ধ এককণা বালুকাবিন্দু—মেরিনার স্মৃতি। তার উচ্ছেদ সাধনে মা সুশীলার নির্মম সার্জারী ব্যর্থ প্রয়াসে তার চারপাশে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে মাত্র।

বেলোয়ারী স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। ওয়াল্টার ব্যালার্ড ডুব দিল তার যন্ত্রজগতে। এতদিন কিছু ফিরে পাবার প্রত্যাশা রাখত। এবার সেটুকুও ত্যাগ করল। এবার শুধু আত্ম প্রবঞ্চনা, বা তার অনিবার্য বিনাশ থেকে উত্তীর্ণ হবার মরণপণ চেষ্টা। প্রিভেন্টিভ হোক বা এমারজেন্সি মেনটেনেন্স, অচল মেশিনকে চালু করার দায় বিস্মৃতির পূর্ণ সুযোগ দিল। মাত্র তিনটে সেমিষ্টারে এ. এম. আই. ই ক্লিয়ার করল ওয়াল্টার।

ছবি আঁকাটা ছাড়ল। ন'মাসে ছ'মাসে ফরমাইসি এক আধটা আঁকে। খুঁটিয়ে বিচার করে, উৎকর্ষের মান ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বেড়েছে। তখন হঠাৎ মনে হয়েছে, তার মুমূর্ষ শিল্পসত্বা ডাক দিচ্ছে এক নিষিদ্ধ বৃত্তের দিকে। পালিয়ে বেঁচেছে ওয়াল্টার। লেদ শেপার গ্রাইণ্ডারের ভীড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছে।

মিঃ ব্যালার্ড বললেন, শেষ ছবি আঁকে মেরিনার বিয়ের প্রীতি উপহার দিতে। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা ছিলেন। খুব ভোরে সাজি হাতে বেরিয়ে যেতেন। এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে জবা ফুল পেড়ে এনে প্রভু যিশুর পূজো করতেন। যিশু আর কালী—মনোথিজম আর প্যানথিজমের মাঝে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছেন তখন তিনি। কোন পারে যাবেন তা স্থির করার মত বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে তখন। একটা কথা মনে পড়ছে। মহাজ্ঞানী হারবার্ট্ স্পেন্সার বলে গেছেন, ষ্টুমফ্ জিনিগে কোনেন্ নিখট্ ভুগেন হাফ্ট্ জাইন। অবোধ কখনও সৎগুণ সম্পন্ন হতে পারে না। বোধশক্তি হারিয়ে বাবা সত্বঃ রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাতীত হতে পেরেছিলেন কিনা আমি বলতে পারব না। সে যাই হোক, ছবি আঁকা আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। নূতন করে তুলি রঙ কিনতে হ'ল। একদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, বড় বড় পেরেক দিয়ে কারা যেন বাবাকে বাঙলাদেশের একটা বিরাট মানচিত্রের ওপর পুঁতে দিচ্ছে। মা একসাজি ফুল বেলপাতা নিয়ে পরম ধৈর্যে পাশে দাঁড়িয়ে। ওদের কাজ সারা হলেই বাবাকে পূজো করবেন। পাশে

আমি রয়েছি, নাবালক। বিকৃত চিন্তায় উৎপন্ন স্বপ্ন বুঝতেই পারছ। সেই থেকেই বোধহয় ছবিটার আইডিয়া পেয়েছিলাম।

—কি এঁকেছিলেন ?

—ক্রুসিফায়েড জেসাস। আমার পোট্রেটের হাত বড় ভাল ছিল। যিশুর মুখটা হয়েছিল বাবার মতন। ছবিটার একটু বর্ণনা দি। অন্ধকারে যেন একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটু হেলে পড়া। আলো পড়ছে একপাশ থেকে। অন্য পাশটা অন্ধকার। ব্যাকগ্রাউণ্ড অন্ধকার। আর পুরো ফোর গ্রাউণ্ড জুড়ে একটা স্পাইডার নেট। ছবিটা সেই জালের মধ্যে দিয়েই দৃশ্যমান। মাঝখানে, ক্লোজ আপে একটা মাকড়সার গ্রাসে একটা মুমূর্ষ পতঙ্গ। বিরাট বড় ছবি। প্রায় এই সেণ্টার পিসটার মাপের। অতবড় ছবিটা শুধু সিংগল কালার, ঘন প্রশ্‌ন-ব্লুতে এঁকেছিলাম। প্রশ্‌ন-ব্লু হ'ল প্রশিক্ বা হায়ড্রোসায়নিক এ্যাসিডে-এর রঙ। মারাত্মক বিষ। এমন বিষ যা দেবাদিদেবও কণ্ঠের নীচে নাবতে দিতে পারেন নি। ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ এক শিল্পীর সেই ছিল সমাপিকা। তুমি যার ছবি দেখে বলেছিলে বর্ণনা হয় না। আই রেট দ্যাট এজ্ দ সেকেণ্ড বেষ্ট অফ মাই লাইফ, দো ইট কামস নো হোয়ার নিয়র দ ওয়ান অফ জেসাস্। দ্যাট ওয়াজ ইমম্যাকুলেট্—দ মাষ্টার পিস অফ মাই লাইফ।

—তারপর !

—ছবিটার কোথাও নাম লিখিনি। প্রীতি উপহার বলে যে পাঠাচ্ছি তাও লেখা ছিল না সঙ্গে। প্রশ্‌ন-ব্লুর ঘন নীলে অনেক কথা লেখা ছিল। আলাদা করে কিছু লিখতে হয়নি।

—ওঁর কাছে নিশ্চয় এ্যাসেট্ হয়ে থাকবে !

—না। ছবিটা মেরিনার হাতে পৌঁছতে পারেনি। ওর মা ছবিটা কনফিস্‌কেট করেছিলেন। মেয়ে জানতে পারার আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রশ্‌ন-ব্লুর প্রভু যিশু মেরিনার দাম্পত্য জীবনে সুখের অন্তরায় হতে পারতেন। হয়ত এমনি শঙ্কায় এই কাজ করে থাকবেন মেরিনার মা। আর নয়, মেয়ের মনের পুরনো ক্ষতটা সেই শুভলগ্নে আবার যাতে আহত না হয়, ছবিটা লুকিয়ে ফেলার এই ছিল কারণ।

ওয়াল্টারের মাষ্টার পিস মেরিনা পেলনা। অবরোধ থেকে করুণাঘন আশীষ পাঠিয়ে থাকবেন যিশু। ওয়াল্টারের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা তাতে যুক্ত ছিল।

আমি যে দুদিনের ঘটনা দিয়ে এই গল্পের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের কথা লিখছি, তার প্রথম ঘটনা বলা হ'ল। মেরিনার বিয়েতে ওয়াল্টার তার জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি উপহার পাঠায়। তবে সেটা মেরিনার হাতে পৌছতে পারে নি। ছবিটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। এই দুদিনের মাঝে সময়ের ব্যবধান কুড়ি বছরের।

এই কুড়ি বছরে পৃথিবী অনেক বদলেছে। সাত বছর ইউরোপে ছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। পৃথিবীর সব কটা শিল্প সমৃদ্ধ দেশ ঘুরে দেখেছেন। হাতে কলমে কাজ করেছেন সে সব দেশের টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে।

যত সে সব দেশের ঐশ্বর্য দেখেছেন, ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাঙলার দৈন্যের সঙ্গে একাত্মবোধ গভীরতর হয়েছে তাঁর। ভারত স্বাধীন হবার পাঁচবছর পর পশ্চিম বাঙলায় কাজ করার সুযোগ পেলেন মিঃ ব্যালার্ড। কলকাতার এক বাঙালী শিল্পপতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্যারিসের এক ইনডাস্ট্রিয়াল এক্‌জিবিশনে। তাঁর পরিকল্পিত নূতন ফ্যাক্টরীকে সুপ্রতিষ্ঠ করার দায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন মিঃ ব্যালার্ড।

একটা বছরও ঘুরল না। আবার জার্মানীতে ফিরে গেলেন মিঃ ব্যালার্ড। এই এক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা বাঙালী জাতের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। সে আর এক কাহিনী। সমাজের উচ্চস্তরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিছু শিক্ষিত বাঙালীর ধিক্কারজনক সে ইতিবৃত্ত জুড়ে এ কাহিনীকে আরও মসীলিপ্ত করার কোন অর্থ হয় না।

আরও কিছু বছর কাটাল। তারপর যখন স্পেশাল পারপজ্‌ মেশিন্‌ টুলে ফরিদাবাদের এই ফ্যাক্টরী জার্মানীতে মিঃ ব্যালার্ডের ফ্যাক্টরীর সঙ্গে কোলাবোরেশনে যুক্ত হ'ল, তাঁকেই চিফ্‌ ইঞ্জিনীয়র করে পাঠান হ'ল ভারতে।

এদিকে মেরিনার বিয়ের পর তার বাপের বাড়ীতে নানান দুর্বিপাক আসতে আরম্ভ করে। মেরিনার একমাত্র বড়ভাই বাপমায়ের সঙ্গে সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করে বিলেতে সেট্‌ল করে। মেরিনার বাবা দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হন। শেষ জীবনে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলেন। মাথার ওপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের ছত্র সরে যাওয়ায় অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'ল। অত্যধিক পানাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে না রোগ, না ব্যবসা কিছুই সামলে উঠতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর মেরিনার মা সংসারে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ স্বাধীন

হওয়ায় আত্মীয়-স্বজনরা অধিকাংশই হোমে ফিরে যান। স্বামীর চিকিৎসার পেছনে যৎসামান্য যা সঞ্চয় ছিল সবই ব্যয় হয়ে গেল। সুখের দিনে অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ছিলেন বলে দুর্দ্দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়াল না। এই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলেই একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

মিঃ ব্যালার্ড তখন ফরিদাবাদে নূতন বাড়ী করেছেন। হঠাৎ একদিন ছোট একটা চিঠি পেলেন মেরিনার কাছ থেকে। পুরনো ভালবাসার দোহাই, তিনি যেন অসহায়া বৃদ্ধাকে একটু দেখেন। লিখেছিল, ওয়াল্টারকে এক্সপ্লয়েট্ করার অধিকার এখনও তার আছে।

চিঠিতে কাজ হয়েছিল। মিঃ ব্যালার্ড নিজে সাধ্যসাধনা করে মেরিনার মাকে ফরিদাবাদে নিয়ে আসেন। তাঁর একার সংসারে কর্ত্রীর আসন দেন। ক্রমে দুজনের সম্পর্কটা মা আর ছেলের মত হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনের যে ঘটনা এ গল্পের পরিপূরক, এ গেল তার ভূমিকা।

মিঃ ব্যালার্ডের বাড়ীর বেসমেণ্টে একটা গুদাম ঘর আছে। কিছু বাক্স পেঁটরা আর তামাম দুনিয়া ঘুরে জোগাড় করা নানান যন্ত্রপাতি মডেল যা বর্তমানে কাজে না এলেও তাঁর সেন্টিমেণ্টাল এ্যাটাচেমেণ্ট হারায় নি—সেই ঘরে সুরক্ষিত আছে।

বাড়ী চূণকাম হচ্ছিল। গুদাম ঘরের সব জিনিষপত্তর বাইরে বার করা হয়েছিল। মেরিনার মা দিল্লী গিয়েছিলেন কিছু কেনাকাটা করতে। ফ্যাক্টরীর এক ড্রাইভার মিঃ ব্যালার্ডের গাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। কথা ছিল সে রাতে তিনি দিল্লীতে এক বান্ধবীর বাড়ীতেই কাটাবেন। ওঁকে পৌঁছে ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে ফিরে আসবে, আবার পরদিন সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে, এমনি ব্যবস্থা হয়েছিল।

চূণকামের জন্য বাড়ীর অবস্থা খুব অগোছাল। ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে বারান্দায় বসেছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। খানসামা কফি দিয়ে গেছে।

মেরিনার মার নির্দেশ ছিল, জিনিষপত্তর সব বাইরে বার করে ঘর চূণকাম হ'বে। ভালভাবে ধোয়া পোঁছার পর ঘর সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে জিনিষপত্তর সব ঝাড়পোঁছ করে তবেই ঘরে তোলা হ'বে।

সেদিন সন্ধ্যার পর সে সবের আর সময় ছিল না। কফি শেষ করে মিঃ ব্যালার্ড

ধূলিমলিন সম্পদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভেতরের উঠানে সব ছত্রাকার পড়ে রয়েছে। ওদিকে আকাশে মেঘ জমেছে। অসময়ে বৃষ্টি আসতে পারে।

যা পুরাতন, কালের ক্ষতে শ্রীহীন, তাকে আড়ালে রাখতে হয়। পরিচ্ছন্ন স্থান করে দিতে হয় নূতনের। এদেশের দর্শনতত্ত্বে পঞ্চাশোর্ধে বাণপ্রস্থের নির্দেশ আছে। এমন আরও অনেক আপ্তবাক্য এযুগে অমান্য হয়। তবে তাতে বিধি নিষেধের আনুগত্য হানি হয় এমন বলা যায় না।

এই চিন্তায় কৌতুকবোধ করছিলেন। গত অতীতের সঙ্গে আজকের ক্লিষ্ট প্রাণের কাঁচা সুতোর বাঁধন এমন অবিচ্ছেদ্য হ'ল কি ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সেদিনের সেই বুড়োর কথা মনে পড়ল।

মস্ত এক লোহার বার এসেছে ফ্যাক্টরীতে। দশ ইঞ্চি মোটা, আর লম্বায় প্রায় বারো ফিট। ফ্যাক্টরীতে মাল ইন্ করার আগে কাবাড়ি ধরে ফেলল প্রায় ইঞ্চি দশেক লোহা বাড়তি যাচ্ছে। দশ ইঞ্চি ব্যাসের দশ ইঞ্চি লম্বা লোহা মুফ্‌তে ছেড়ে দেওয়ার মত কাঁচা কলজে রাখলে কাবাড়ির কারবার চলে না। লোহার বার এসে পড়ে রইল মেন গেটের অদূরে। দশ ইঞ্চি কাটা যাবে।

কাবাড়ি লাগাল এক সত্তোর বছরের শীর্ণকায় বুড়ো আর তার ন' বছরের ততোধিক শীর্ণ নাতিকে এই লোহা কাটার কাজে। তারা একটা সাধারণ হ্যাক-স'র দুদিক ধরে ছুতোর মিস্ত্রীর মত কাটতে আরম্ভ করল সেই লোহা। একথাবলা জল ঢালে আর দশ হাত হ্যাক-স চালায়। মাথার ওপর দিন ভোরের রোদ, এক বৃদ্ধ আর এক বাচ্চা একটা বার ইঞ্চির হাতিয়ার নিয়ে এই সংগ্রামে লেগে রইল। পাঁচদিন পর দেখা গেল অর্ধেকও কাটা যায়নি।

লাঞ্চে বাড়ী যাচ্ছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। বুড়োর পাশে গাড়ী দাঁড় করালেন। বুড়ো চোখ তুলে চাইল।

—কট্ জায়গা? মিঃ ব্যালার্ডের প্রশ্নে অনুকম্পা প্রচ্ছন্ন ছিল।

চোখে রোদ পড়ছিল বুড়োর। বাঁ হাতের কটা শীর্ণ আঙুল দিয়ে চোখের ওপর ছাউনী তুলল। ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিলম্বিত জবাব দিল, হুজুর, দিন কট্ যাই।

আজও সেই বৃদ্ধকে শ্রদ্ধায় স্মরণে আনেন মিঃ ব্যালার্ড। ও যা বলতে চেয়েছিল তার যুক্তিনিষ্ঠ ভাবার্থ কি দাঁড়ায়? নিহিলিষ্টিক কনটেন্‌টেড্‌নেস্। সব কথার শেষ কথা, সব আগুনের শেষ আগুন, চিতার আগুনের ওপর সর্বসন্তাপহারী

গঙ্গা। এতবড় দেশটার জীবন দর্শনের সংক্ষিপ্ততম ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিয়েছিল বুড়ো তাঁকে। সেদিন আর একবার ভেবে অবাক হলেন, একদিকে এত বিক্ষোভ, এত দেহি দেহি, আর অন্যদিকে, সেখানে সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে উদ্যম ছাড়া আর অন্যথা নেই, সেখানে বঞ্চনার সঙ্গে এমন নির্বিরোধ আপোষ, এমন কি ভাবে সম্ভব ?

অনেকদিনের উপেক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। এমনি সময় জরুরী তলব এল ফ্যাক্টরী থেকে।

এমারজেন্সি কেস্। বি-শিফ্‌টে বড় এ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে।

যেমন অবস্থায় ছিলেন বেরিয়ে পড়লেন।

ফিরতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল। ইতিমধ্যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আহতকে হাসপাতালে পৌছন, এ্যাক্‌সিডেন্টের তদন্ত করে রিপোর্ট তৈরী করা, আহতের বাড়ীর লোককে খবর পাঠান, ইত্যাদি সেরে বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরছিলেন।

দেখলেন বাড়ীর বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার মেরিনার মাকে পৌছে ফিরে এসে থাকবে। খানসামাকে চাবি দিয়ে বাড়ী গেছে হয়ত।

বাড়ী ঢুকে দেখলেন মেরিনার মা নিজেও ফিরে এসেছেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় খানসামা একলা হাতে বাইরের সব জিনিসপত্তর ওপরে তুলেছে। বারান্দায় এখন সে সব স্তূপাকার। মেরিনার মা একটা খোলা বাক্সের মধ্যে কিছু দেখছেন।

কি দেখছেন। হঠাৎ একটা শীতল স্রোত দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে যেন অসাড় করে ফেলল। আর একপাও এগোতে পারলেন না মিঃ ব্যালার্ড।

মেরিনার মা ততক্ষণ বাক্সের মধ্যে থেকে একটা কাগজের রোল বার করে মেলে ধরেছেন। কাগজটার ওপর একবার দৃষ্টি দিয়েই ফিরে তাকিয়েছেন মিঃ ব্যালার্ডের দিকে।

আবার নিস্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত। প্রত্যাশিত বিস্ফোরণের সঙ্কেতে থমথম করতে থাকল।

কাগজখানা হাতে পেয়ে বিশ বছরের হৃত অহমিকা রূঢ়তা যেন সব ফিরে পেলেন মেরিনার মা। অল্পদূরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে মিঃ ব্যালার্ড। বৃদ্ধার দুই লোলচক্ষু থেকে ঘৃণা বিতৃষ্ণা উপচে পড়ছে।

ক্ষমা নেই। দুজনের মাঝখানের নিরুত্তাপ স্তব্ধতা হঠাৎ দীর্ণ হ'ল বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ ধিক্কারে, সো, ইউ আর দ থিফ্? ইউ— ।

—হ্যাঁ, হিরন্ময়। আমিই চোর। আজ যত অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি বিশ বছর আগে তা ছিলাম না। একই রাতে জীবনের দুটো প্রিয়তম পোজেশনের স্বত্ব বদল হয়ে যাবে, এতটা সহ্য হয়নি। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কিনা জানিনা, আমি ভোর রাতে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে নিজে ছবিটা উদ্ধার করে এনেছিলাম। আমার ছোটবোনের গোয়েন্দাগিরির ফল, জানতে পেরেছিলাম মেরিনার মা ছবিটা কোন নোংরায় লুকিয়েছিলেন। আমি নিজেও অনেকগুলো বছর ছবিটা নোংরার মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। ভাগ্যে চোর অপবাদ ছিল, তাই অমন ভাবে ধরা পড়ে গেলাম। মেরিনার মার এ্যাবিউজ এ বাড়ীর কামরাগুলোয় আজও ইকোর মত ভেসে বেড়ায়। আমি শুনি।

মেরিনার মা মারা গেছেন। সংসারে মিঃ ব্যালার্ড আজ একা। বোনেরা বিলেতে স্বামীর ঘর করছে। মামার বাড়ীর তরফে কারুর সঙ্গে কোন হৃদ্যতা নেই, বলাই বাহুল্য। অন্যান্য আর সব আত্মীয়েরা হোমে ফিরে গেছেন। ঘনিষ্ঠ বলতে আর কেউ নেই।

এই যে আজ উনি এভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, এই অর্থ এই নয়, মেরিনা এই শুন্যতায় ব্যাপ্ত। অর্থ এও নয়, সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের রুথলেস্ ডিসট্রাষ্ট জীবনে আজও প্রশান্তি আসতে দেয়নি। যতদূর আমি বুঝেছি, অর্থ এই, ওঁর নিজের অতীত—বিশ বছরের তরুণ ওয়াল্টারের কাছে উনি যেন অঙ্গীকার বদ্ধ। সে যেন এক প্রতীক স্বরূপ। বাঙালীর সমকালীন যুবমানসের যাতনাকে ওয়াল্টারের মধ্যে সমষ্টিবদ্ধ করেছেন। সেই শূন্যতাপূর্তির যে প্রয়াস ওঁর তার সামনে অন্তরায় হোক এমন কোন পরিস্থিতিই যাতে না সৃষ্টি হয়, সেই স্বাধীনতাকে এইভাবে আয়ত্তে রেখেছেন। ফল এই হয়েছে আমায় অবিশ্বাসী মন সন্দেহ করেছে, পোলারিটির ধর্ম এখানে ঠিক কাজ করেনি। একদিকে জন্মসূত্রে বর্তানো নাড়ীর টান, অন্যদিকে প্রত্যাখ্যাত হিতৈষার বিষজ্বালা, এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির তাড়নায় অমন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষ আর যাই হোন স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা আমি এখানে অনেক সংক্ষেপ করলাম। ভুলতে পারবনা, শেষের দিকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, যদি

জানতে চাও আজ আমার সবচেয়ে প্রিয় কি জবাব দেব, ব্যাঘাতবিহীন চিন্তা। তাই একা রয়েছি। এই বিচ্ছিন্নতায় আনসাঙ্, আন্ল্যামেনটেড মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলাম। মোক্ষ মুক্তি নির্বাণ নয়, প্রশ্ন-ব্লু-এর বিষে নীল এমনি শত সহস্র জীবন চাই। বিনিময়ে প্রতিবার কম করে একটা তরুণকে হাত ধরে হতাশার অন্ধকার থেকে বুকভরা আশার আলোয় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাব—শুধু এই কাম্য।

মিঃ ব্যালার্ডের এই উক্তি গল্পে লেখার আগে পুলকে সংশয়ে জড়িত দীর্ঘ চিন্তা করতে হয়েছে আমায়।

একি ফিলিয়ন্থ্রফির কোন মনোগ্রাহী ডগ্মা, না স্বতঃ ইষ্ট বিধিবুদ্ধি দিয়ে বোঝা জ্ঞানের চতুর্থস্তরে উপলব্ধ সেই সত্য—পূর্ণপ্রজ্ঞা, পূর্ণশীল পূর্ণপ্রশান্তির আনন্দানুভূতি ?

বাঙালীর দোষগুণের আলোচনা স্বভাবতই নকশালবাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল। আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মিঃ ব্যালার্ড বরাবর এই দিকটা এড়িয়ে চলছিলেন। তার কারণ কিছুটা বুঝেছিলাম। বাঙালী সম্বন্ধে ওঁর মূল ধারণা গড়ে উঠেছিল বছর ত্রিশ আগে। তারপর তার সমীক্ষার কোন সুযোগ আসেনি। কলকাতায় যে একবছর ছিলেন, বাহান্ন তিপ্পান্ন সালে, দিনে কম করে আঠারো ঘণ্টা প্লান্ট্ ইনস্টলেশনে কাটিয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ পাননি বাঙালীর সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে। তারপর গভীর ঘৃণা নিয়ে হঠাৎই একদিন জার্মানী ফিরে গেলেন। বাঙালী সম্বন্ধে পুরানো ধারণা গভীরতর হয়েছিল, রূপ বদলায়নি। সম্প্রতি নকশালবাদ সেই ধারণার গোড়া ধরে শক্ত ঝাঁকুনি লাগিয়েছে।

কৌশলে আমি মিঃ ব্যালার্ডকে এই প্রসঙ্গে টেনে আনলাম। জানতে চাইলাম, এ বিষয়ে উনি কি মত পোষণ করেন।

বক্তব্য গুছিয়ে নিতে খানিকটা সময় নিলেন মিঃ ব্যালার্ড। বললেন, সিক্সটি নাইনের মে মাসে জার্মানীতে ছিলাম। কণ্ডাকটেড্ টুরে ইষ্ট বার্লিন দেখেছি সেই প্রথম। যদিও সেকেণ্ড ওয়ারে আমি ছিলাম গেপিংগেনে। ওদিকে ইষ্টবার্লিনে এখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ। আর এদিকে, ওয়েষ্টে, কুরফুরষ্টাইন্ডাম ইত্যাদি এলাকায়, মানুষের গড়ে তোলার অপরাজেয় শক্তির নিদর্শন। একসপোর্ট

প্রোমোশনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে সেবার দেশ ছেড়েছিলাম, আমার রাউণ্ড দ ওয়ারল্ড টুর ছিল। স্টেটস্, কানাডা, জাপান হয়ে ফিরেছিলাম। জাপানের 'টোয়োকোগয়ো' অটোর খ্যাতি শুনে থাকবে। এরা সম্ভবতঃ 'নিশান'-এর সাবসিডি। ওদের রোটারি ওয়ানকল ইঞ্জিনওয়ালা একটা মাজদা হাতে পেয়েছিলাম। টোকিও ওসাকা হাইওয়েতে বারতিনেক ড্রাইভ করেছি। য়াকোহামা নাগোয়া কোয়োটা সর্বত্র দেখেছি সর্বনাশের ধ্বংসস্তূপ ছাপিয়ে মানুষের দুর্বার গতি সৃজনশীলতা। তুমি ভাবছ, এসব তোমার প্রশ্নের জবাব নয়। আসলে তোমার প্রশ্ন আমার মনেও বারবার জেগেছে, বিশেষ করে সেই সব মুহূর্তে। নকশালবাদের শুভাশুভ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্দেহ কি, ফ্রাসট্রেশন আছে? দুর্বিসহ ফ্রাসট্রেশন। নতুন করে গড়ে তোলারও সময় এসেছে। কিন্তু এই কি তার প্রস্তুতি? এই ইনডিসক্রিমিনেট সংহার? ফ্রাসট্রেশন মে এসেনশিয়ালি বি. এ. প্রিরিকুইজিট্ ফর ক্রিয়েশন, বাট নেভার, নেভার দি টুল। গড়ে তোলার কারিগরী কুশলতা অর্জন করার আগেই যারা ধ্বংসের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তারা সহানুভূতির যোগ্য হতে পারে, তাই বলে কি সমর্থনেরও?

—কিন্তু এ চিন্তার তো এই ইতি নয়। ট্র্যাজেডি এই, আমরা যারা চেষ্টা করলে কিছু করতে পারি, সবাই এমনি এসকেপিষ্ট্।

কথাটা ভুল বলিনি। নকশালবাদের সমাধান বা শেষ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করার মত যথেষ্ট ষ্টাডি আমি করিনি হিরণ্ময়। তবে যা কিছু ঘটছে, তার মূলে কি কারণ সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি। দেখ, নিষ্ফলা এ্যাকাডেমিক বলে প্রতিবাদ কোর না। যদি আমার থিওরী সত্যি হয়, তবে তার সূত্র ধরে কিছু কনস্ট্রাকটিভ্ কাজ করা যেতে পারে। তোমায় বলেছিলাম পোলারিটির কথা। তেমনি আর এক পোলারিটি ম্যাটার আর কনসাসনেস। এক্ষেত্রে ব্যালান্স অবশ্য গাণিতিক প্লাস মাইনাস ইকুয়েট্ করার মধ্যে নয়। কনসাসনেস —চেতনা, হয়ত এই ঠিক প্রতিশব্দ। তবে ম্যাটার, অর্থাৎ যাকে আমরা জড়পদার্থ বলে জানি, বা জৈন দর্শনে যাকে পুদ্গল্ বলা হয়েছে তা নয়। ম্যাটারের সেই অর্থ এখানে নিতে হবে যা সৃজনশীল মানুষের উদ্যম ক্রমে তার ফাইনার ফর্মস'এ রূপান্তরিত হচ্ছে। দর্শনে যে ব্যাখ্যাই হোক, ইফ্ ইউ প্রোজেক্ট ইট অন টু সোশিওলজি, এই নকশালবাদের একটা দীর্ঘসূত্রী সংজ্ঞা তৈরী হয়।

বুদ্ধিজীবি বাঙালী গোষ্ঠির ক্ষেত্রে এই ম্যাটার আর কনসাস্নেসের মধ্যে ঘটেছে চরম অসমতা। দায়ী কি? আমি বলব, ভাষা—আরও যথার্থভাবে, বাঙলা ভাষার সম্মোহক উৎকর্ষতা। আজ পশ্চিমবঙ্গে যে নৈরাজ্য তা শুধু এই অসমতার ম্যানিফেস্টেশন্। দ প্রিপন্‌ডারেন্স অব কনসাস্নেস্ ওভার ম্যাটার। এ যুক্তি আরও সহজগ্রাহ্য মনে হবে, যদি এই সত্যের পরিপূরক হিসেবে এ্যামেরিকার হিপিইজম-এর বিকাশকে স্বীকার কর—যা যথার্থই এ্যাফ্লুয়েন্সের বিষক্রীয়া। গত তিন চারটে জেনারেশনে বাঙালী ক্রমান্বয়ে এই অসমতাকে বাড়াতে থেকেছে—নির্বেদ কাব্যচর্চ্চায়। আর, আজ যারা নকশালপন্থী, ম্যাটার শূন্যতায় দানবাকার কনসাসনেসের বোঝা বুকে নিয়ে খাবি খাচ্ছে, তারা হ'ল সমাজের শত্রু। কি করবে ওরা? ক্যান ইউ ইম্যাজিন; এ বার্ড উইথ ষ্ট্রংগ উইংগস টু ফ্লাই ইন ভ্যাকুয়াম। ওদের সেই দশা।

ত্বটো সক্ষম পক্ষ সঞ্চালন করে বায়ুশূন্যতায় উড়ে যেতে চেষ্টা করছে যে বিহঙ্গ, মিঃ ব্যালার্ড আমায় তার মর্ম্মান্তিক পণ্ডশ্রমের দৃশ্য কল্পনা করতে বলেছিলেন। এখন এতদূর লেখার পর মনে হচ্ছে এ গল্পে সেই ছবিই আঁকা রইল। কাহিনী না হয়ে এ যদি চিত্রকলা হত, আর আমি হতাম তরুণ ওয়াল্টারের মত দক্ষ শিল্পী, তাহলে পাখীর মুখটা মিঃ ব্যালার্ডের মুখের মত আঁকতাম। আমার এ কথাটা যদি নিছক নৈরাশ্যবাদীর বিদ্রূপ বলে লাঞ্ছিত হয়, বুঝব, কাজ হয়েছে।

গল্পের শেষে পৌঁছে মিঃ ব্যালার্ড বললেন, আমার মার প্রতি আমার যে মনোভাব আমি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি, তার আর একটা দিক আছে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কিনা জানিনা, যত বুড়ো হচ্ছি ওঁর কথা স্মরণ করতে গেলেই মনের গভীরে একটা সূক্ষ্ম কৃতজ্ঞতা বোধ জাগতে আরম্ভ করে। ভাবি, এই যে আজ আমি লক্ষ্যে উপনীত, দৈন্য অভাব অতিক্রান্ত, মনে করি আমার প্রতিষ্ঠা আমার দৃষ্টিভঙ্গী আমায় দশজনের থেকে বিশিষ্ট করেছে, সংকীর্ণতা থেকে এনে দাঁড় করিয়েছে মহতী বিস্তারে, এর জন্যে অপরিশোধ্য ঋণ আছে কোথাও। সে ঋণ আমার মার কাছে। ওঁর দেওয়া বিষজ্বালা প্রপাল্‌সন্—বলতে পার, ইন্ধনের কাজ করেছে। তার দাহিকা শক্তি স্থিতি থেকে উৎক্ষিপ্ত করে এনে ফেলেছে গতির আবর্তে, থামতে দেয়নি। যদি এমন না হত, সেক্ষেত্রে আমার

সম্ভাব্য আমি, বর্তমানের এই আমির চোখে সবচেয়ে বড় ঘৃণার পাত্র হত। তার চেয়ে শিল্পী ওয়াল্টারের মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করতাম আমি।

এর পর কিছুক্ষণ চুপ করেছিলাম দুজনে। তারপর আমিই জানতে চাইলাম, আপনি আমাদের অফিসের মিস্ ক্লার্কসনের জন্য কোন প্রেজেনটেশনের কথা—

—হ্যাঁ। আছেন একজন, মিস্ মিত্রা। তিনিই পাঠাতে চান। তোমাকেত তাঁর কথাই বলা হলনা।

—বাঙালী ?

—বাঙালী ক্রিশ্চান। শুনে তুমি এ্যামিউজড্ হবে, ইনি একসময় আমার বাকদত্তা ছিলেন।

—রিয়্যালি !

—হুঁ। আমাদের এক নিকট আত্মীয় বাঙালী ক্রিশ্চান্ ছিলেন। মিস্ মিত্রা বলতে গেলে তাঁদেরই বাড়ীতে প্রতিপালিত। মা একে বেছে রেখেছিলেন আমার জন্য—ওঁর স্পেসিফিকেশনের মত পুত্রবধূ হবার তালিম দিচ্ছিলেন। ইটস্ এ পিটি। মেরিনাকে নিয়ে ওই কুরুকাণ্ড ঘটার পর সেদিন ওকেও আমায় রিফিউজ করতে হয়েছিল, হয়ত বলে দিতে হবেনা। তার পরিণামও দেখ, কেমন অদ্ভুত। ভদ্রমহিলা বলা উচিৎ, উনি আজ সত্যিকারের মানুষ হতে পেরেছেন। আবার রিপিট করছি, নিছক ভাল নয়—সার্থক। ইনডিড এ ভেরি একমপ্লিসড্ লেডী। ভেরি ওয়েল স্পোকেন। দিল্লী ইউনিভারসিটি থেকে ডকটরেট করেছেন। ওখানেই এখন রিডার। জানইত, আমাদের মানে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যায় এত কমে যাবার ফলে পরস্পরের ওপর ডিপেনডেন্সি কত বেড়ে গেছে। বছর দুই আগে মিস্ মিত্রাকে একটা স্টাডি টুরের ব্যাপারে আমি খুব সাহায্য করেছিলাম। সিন্স দেন উই স্টার্টেড ডেভেলাপিঙ্ সাম ইন্‌টিমেসি এগেন। মাইণ্ড ইউ নাথিং কমপ্যাসানেট্—বড়জোর ইনটালেকচুয়াল কমপেনিয়নশিপ বলতে পার। প্রেজেনটেশন্‌টা ওঁর কাছ থেকেই নিতে হবে, প্রোভাইডেড সি হ্যাজ ম্যানেজড্ টু একুয়র ইট্। ওঁর সঙ্গে আলাপ কোরো, ভালো লাগবে।

রবিবার। মিঃ ব্যালার্ডের ছুটি। আজ বিকেলে জনতা ধরে এলাহাবাদে

ফিরে যাব আমি। আগ্রার তাজ দেখা হলনা। কাল ঘণ্টাখানেক দেরীতে ডিউটি জয়েন করতে পারব।

ভোর নটাতেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ ব্যালার্ড। আমি দিল্লীতে প্রথমবার এসেছি। সারাদিন আমরা দিল্লী ঘুরব এই ছিল প্ল্যান। টেলিফোনে মিস্ মিত্রার সঙ্গে কথা হয়েছিল। উনিও থাকবেন। প্রথমে আমরা তাঁর বাড়ী গেলাম। আমাদের বাইরে কোন রেঁস্তোরায় লাঞ্চ নেবার কথা ছিল। তবে দেখলাম আমরা পৌঁছাতেই বাড়ীর চাকরকে দুটো টিফিনকেরিয়ার গাড়ীতে তুলে দেবার নির্দেশ দিলেন মিস্ মিত্রা। উনি নিজেও তৈরী ছিলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা সারাদিন একসঙ্গে ঘুরলাম। কুতুবের পাশে কুইনস-এ খাওয়া দাওয়া হ'ল। নানান পদের সঙ্গে ফিশ-ফ্রাই ছিল। মিঃ ব্যালার্ড নির্মীলিত নেত্রে প্রায় সবকটি চর্বণ করলেন। বোঝা গেল মাছের ব্যাপারে উনি ভাগাভাগি বোঝেন না। খেতে খেতে তিনবার মিস্ মিত্রাকে বোঝালেন, মা সুশীলা সমপরিমাণ টম্যাটো আর ইলিশমাছের মুড়ো দিয়ে 'মৌলি' নামের যে পদটা রাঁধতেন তেমন সুখাদ্য ভূভারতে তিনি আর খাননি।

আমি নিজে মিশুকে ধরনের না হলেও মিস্ মিত্রার সঙ্গে আমারও অনায়াসে ভাব জমে গেল। বাস্তবিক, অদ্ভুত চরিত্র। সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের ভাল আর ওয়াল্টার ব্যালার্ডের সার্থক যুগপৎ একটা মানুষের মধ্যে কি ভাবে পূর্ণতা পেয়েছে দেখে অবাক হলাম।

বিকেল চারটে নাগাদ আমায় ওল্ড দিল্লী ষ্টেশনে নাবিয়ে দিলেন মিঃ ব্যালার্ড। মিস্ মিত্রাও আমার সঙ্গে নাবলেন। আমার রিজার্ভেশন ছিল না। মিঃ ব্যালার্ড আমায় বললেন, তুমি টিকিট কেটে জায়গা রাখগে। আমি এখুনি ফিরব। গাড়ী ছাড়বে কটায়?

সময় বললাম। মিঃ ব্যালার্ড গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

হাতে তখনও ঘণ্টাখানেক সময়। গাড়ী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামরা গুলো ফাঁকা। আমরা দুজনে একটায় উঠে বসে অনেক দিনের অন্তরঙ্গের মত গল্প জুড়ে দিলাম।

আমরা ওঠার আগেই একটা সতের আঠারো বছরের হিপি ছেলে আমাদের

কামরায় উঠেছিল। আশ্চর্য এই—না সে বার্থের ওপর উঠেছে, না বসেছে বেঞ্চে। বেঞ্চের তলায় স্লিপিং ব্যাগটা ছড়িয়ে দিব্বি বিছানা পেতেছে। বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিজের জীর্ণ দেহটা ঢুকিয়েছে তার তলায়। দাড়ি, গোঁফ, রুদ্রাক্ষ, নামাবলি এসব তো আছেই, হাতে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর 'মাই একস্‌পেরিমেণ্টস্‌ উইথ্‌ ট্রুথ'। বইটা পড়ছে গভীর মনোযোগে। আর্‌ প্রতি পনেরো মিনিটে ভাড়ের চা কিনে খাচ্ছে. ওই গর্ত থেকে বেরোন আর ঢোকার প্রায় অসাধ্য কসরৎ কবুল করেও। যা কারুর চোখে পড়ছেনা সে হ'ল ওর এয়ার-ব্যাগের মধ্যে সংরক্ষিত এক তাড়া এ্যামেরিকান এক্সপ্রেসের ট্রাভেলার্স চেক। আর গাঁজার কলকে, ম্যারিজুয়ানার পুরিয়া।

মিস্‌ মিত্রা প্লাটফর্মের ঠেলাগাড়ী থেকে চা কিনে খাওয়ালেন। জানতে চাইলেন, ফুচ্‌কা খাবে ?

আমি খুব হাসলাম। উনি নিছক আমোদ দিতে প্রশ্নটা করেন নি, স্টেশনে ফুচ্‌কা পাওয়া যায় না। তাই খাওয়া হ'ল না। না হলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একজন ডি, লিট, ফুচকা খাচ্ছেন, দিল্লীতে এ দৃশ্য অকল্পনীয় নয়।

—আপনি নাকি একটা প্রেজেনটেশন পাঠাতে চান এলাহাবাদে ? তার কি হ'ল। জানতে চাইলাম আমি।

সেই থেকেই মিস্‌ ক্লাকসনের কথা উঠল। মিস্‌ মিত্রা বললেন, আর বোলোনা ভাই। সেটা একটা বাতিল ফ্যাশনের গয়না। ঠিকমত পালিশ হচ্ছেনা, তাই পাঠান গেল না।

ফস্‌ করে বলে ফেললাম, ওটা কি মিঃ ব্যালার্ডের মা আপনাকে—। ক্ষমা চাইছি। এ আমার অন্যায় কৌতূহল।

—না না, তাতে কি হয়েছে ? কিন্তু—, আরে বাহ্‌! তোমার তো ভারী বুদ্ধি। বুঝলে কি করে ?

কি উপলক্ষে এই প্রেজেনটেশন, এর পর জানা গেল। মিস্‌ মিত্রা বললেন, আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। পাত্র সম্পর্কে আমার ভাইপো বলতে পার। ছেলেবেলায় আমি যাদের বাড়ী মানুষ হয়েছি তাদের বাড়ীর ছেলে।

—কেমন দেখতে বলুন তো আপনার ভাইপো। লম্বা জুলফি ? হাতে খয়রে খয়রে দাগ ? স্কুটার চড়ে।

—হ্যাঁ তাইতো। চেনো নাকি ?

—আমি চিনিনা। তবে বিয়েটা হবে কিনা বলতে পারিনা।

—যাঃ সব ঠিক। কি বাজে কথা বলো।

—বিয়ের কনে এখন হাসপাতালে। আমি আসার তুদিন আগে একটা বিশ্রী এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল। ইনজুরি খুব সিরিয়স।

—সে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আধখানা মুখ কেটে ছড়ে মাংস উঠে গেছে। বাঁ হাতের সবকটা আঙুল—, বোধ হয় রিবস্ তু'একটা, এক্সরে রিপোর্টে আরও জানা যাবে। নাকে লেগেছিল। অত্যাধিক ব্লিডিং হবার ফলে আমি চলে আসা পর্যন্ত জ্ঞান হয়নি। তুদিন যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে। আপাততঃ প্রাণের ভয় যদিও আর নেই, বিয়ের কনে আর হয়ত হতে পারবে না।

—উঃ কি বলছ তুমি ? কি হয়েছিল ? ও যে—,

—শুনে আপনার আরও খারাপ লাগবে, আপনার ভাইপোই এর জন্য দায়ী। কিছুটা আমি নিজেও।

মিস্ মিত্রা ততক্ষণে আমার তুটো হাতই চেপে ধরেছেন। তুচোখে উদ্বেগ থৈ থৈ করছে। স্বর প্রায় রুদ্ধ। বললেন, বল তুমি সব কথা : আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বলতে হ'ল। এই গল্পের আগুপিছু তুটি তুটি করে মোট চারটে ফালতু কথা বলার যে লিবার্টি নিয়েছি আমি, তার শেষ তুটো কথা বলার সুযোগ এসেছে এবার।

মিস্ মিত্রার ভাইপো নিওয়া ঘাটের সেই ছেলেটা। তার ভূমিকা গল্পের এই অংশে খলনায়কের। আর আমার ঠিক নায়কের না হলেও, বলা চলে নায়কোচিত।

বিয়ের ঠিকঠাক কতদূর হয়েছিল জানিনা। তবে সেদিনকার সেই লজ্জাকর ঘটনার পর ছেলেটা মিস্ ক্লার্কসনের শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

বিপদে পড়লাম আমি। ছেলেটা তবু মিস্ ক্লার্কসনের পিছু ছাড়েনি। আমার বিড়ম্বনা হ'ল এই, মিস্ ক্লার্কসন আমাকেই তার রক্ষাকর্ত্তা সাব্যস্ত করে ফেলল। তার যে ভয়ের কারণ ছিল না এমন নয়, তবে আমি বাঙালীর সুসন্তান, একটা সাধারণ অস্থির মেরুদণ্ড নিয়ে অমন ফুটফুটে ফিরিঙ্গী মেয়ের

সুরক্ষার দায়িত্ব নিই কোন সাহসে। আবার অসহায়ের মত যে নির্ভর করতে চাইছে তাকে ঝেড়ে ফেলাও সহজ নয়।

আর একটা যোগাযোগের ফলে ব্যাপারটার আর একটু শেকড় ছড়াল। ইলেকট্রিক গীটারে আমার একটু হাত আছে। অফিসের বাৎসরিক ফাংশনে বাজিয়েছি। মিস্ ক্লার্কসন আবার গীটারের শিক্ষানবীশ্। এর সুযোগ নিয়ে ও আমার সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল আমি তাতে সাড়া দিতে পারলাম না।

ওয়ার্কশপের মধ্যে কাঁচের তৈরী আমার একটা ছোট কেবিন আছে। টেলিফোন আছে। কিছুদিনের মধ্যে মিস্ ক্লার্কসন রিসেপশনিষ্ট হয়ে পি, বি, এক্স'এ এসে গেল। আর আমার সাধ্য কি ওকে এড়াই। সারাদিনে বিশবার টেলিফোন মিলিয়ে হয় মিস্ মিত্রার ভাইপোর দুর্ব্যবহারের নালিশ, নয় আমার নির্লিপ্ততার কৈফিয়ৎ দাবী। গোদের ওপর বিষফোড়া গীটারের গৎ। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল, মিস্ ক্লার্কসন ভাবলো, আমার সামনে তার পূর্বরাগই বীতরাগের কারণ হয়ে রয়েছে। যেহেতু খোলাখুলি আলোচনার কুণ্ঠা প্রবল ছিল, আমার মনোভাব সম্বন্ধে ওর ধারণা সম্পূর্ণই ওর নিজের অনুমান সিদ্ধ হয়ে রইল। আমি যে ওর দৈহিক শুচিতায় অবিশ্বাসী ইঙ্গিতে এমন সন্দেহও জানাতে ছাড়ল না মিস্ ক্লার্কসন।

এর আর উপায় কি? ও আমার দিক থেকে কোন আঘাত না পায় আমি শুধু এর জন্যে সতর্ক রইলাম।

কলকাতা থেকে আমার আত্মীয়েরা এসেছিলেন। সবাইকার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙলা বই। ভীড়ের মধ্যে অবাঙালী অনেক। মিস্ ক্লার্কসনকেও দেখলাম একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে। আমি ওকে দেখেই ইষ্টনাম জপতে আরম্ভ করেছি। ভয় আমার নিন্দা, অপবাদ ইত্যাদির নয়। ভয় অশান্তির। আমাদের পরিচয় নিয়ে মিছিমিছি নোংরা চর্চা হোক, এটা আমি এড়াতে চাই।

যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হ'ল। মিস্ ক্লার্কসন আমাকে দেখেই চোখমুখ উজ্জ্বল করে এগিয়ে এলো। নিজের উচ্ছাস গোপন করার প্রয়োজন বুঝল না। দেখল না সঙ্গে কারা রয়েছে। আমার হাত ধরে 'হ্যালো' করলো। পরিচয় করিয়ে দিল বান্ধবীর সঙ্গে! রুষ্ট অভিযোগ জানাল 'মে-কুইন' ফাংশনে তার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমার না গিয়ে শিষ্টাচার জ্ঞানহীন আচরণের।

দেখলাম, আমি সবাইকার লক্ষ্যের পাত্র হয়ে উঠেছি। অনেকের মুখভাবে কষ্টকৃত উপেক্ষা প্রচ্ছন্ন। বোঝা গেল, অমন রূপসী ফিরিঙ্গী মেয়ের আমার প্রতি এই প্রিয় সম্ভাষণ এমন খাঁটি বাঙালী পরিবেশে বেখাপ্পা লাগছে।

ওদিকে বিরক্তিতে আমার আত্মীয়দের মুখগুলো কালচে হয়ে গেছে। মান আর রইল না বুঝি, এমন ভাব। ওঁদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে অসহিষ্ণু প্রকৃতির তিনি আর থাকতে পারলেন না। আমায় কছে ডেকে তিক্তস্বরে বললেন, কি হচ্ছে কি? ভাব করার আর মেয়ে পেলে না। এতগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গে, সে হুঁস আছে!

সঙ্গে সঙ্গে মিস্ ক্লার্কসনের বান্ধবী তার কানে মুখ দিয়ে কিছু বলল। ভাষা না বুঝলেও ভৎর্সনার ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করে থাকবে সে নিজেও। মিস্ ক্লার্কসনের রাঙা মুখ নিমেষে নীল হ'ল। দাঁতের মাঝে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

সিনেমা কি হ'ল আমি দেখলাম না। তিনঘণ্টা সামনের পর্দা জুড়ে মিস্ ক্লার্কসনের বেদনায় নীল মুখটা ভেসে রইল।

বাইরে এসে তাকেই খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম হল থেকে নেমে দ্রুত রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। আমিও ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে অন্য বাঙালী মেয়েটি নেই। কাছে গিয়ে পেছন থেকে ওর কাঁধটা স্পর্শ করলাম আমি। মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখল মিস্ ক্লার্কসন। আমিও তার চোখদুটো দেখলাম। সেই মুহূর্তে ভাবলেশহীন। হয়ত যাতনায় বোবা হয়ে রয়েছে। ততক্ষণে আরও কিছুটা এগিয়ে গেছি আমরা।

এমনি সময় ঘটনাটা ঘটল। ক্ষমা চাইব এই ভেবে আমি ওর একটা হাত ধরেছিলাম। ভীড় থেকে সরে এসেছিলাম দু'জনেই। হঠাৎ সামনে একটা স্কুটারের শব্দ উঠলো। আমরা দু'জনেই চোখ তুলে চাইলাম। ঠিক আমাদের সামনেই সেই ছেলেটা—মিস্ মিত্রার ভাইপো! সবে স্কুটারে ষ্টার্ট দিয়ে এ্যাকসিলেটর উঁচু করেছে। পাশবিক আক্রোশ নিয়ে চেয়ে আছে আমাদের দিকেই।

হঠাৎ ভয় পেল বলেই বোধহয়, মিস্ ক্লার্কসন চমকে উঠে আমায় আঁকড়ে ধরল। ছেলেটা আমাদের লক্ষ্য করছে। পেছনে পরিচিত, অপরিচিত অনেক বাঙালী। আমরা এই অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে ছেলেটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি।

মিস ক্লার্কসনকে উদ্দেশ্য করে দাঁতে দাঁত পিষে ছেলেটা হঠাৎ বলল, ইউ—, বিচ্। স্কুটার ছেড়ে দিল।

আর সেই মুহূর্তে উল্কার মত আমার পাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল মিস্ ক্লার্কসন। হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। স্কুটার তখন পুরো স্পিড্ নিয়েছে।

এর দুদিন পর ফরিদাবাদে আমার ইন্টারভিউ। হাসপাতালে গেছিলাম। মিস্ ক্লার্কসনের মা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেয়ের পাশে চুপ করে বসে ছিলেন। আমার সঙ্গে কারুর কোন কথা হয়নি।

জানলার বাইরে চেয়েছিলেন মিস্ মিত্রা। শুধু এ্যাক্সিডেন্টের কথা নয়, নিওয়া ঘাটের সেই ঘটনার কথাও তাঁকে বলতে হয়েছিল আমায়। ওঁর মুখে কোন কথা নেই। প্লাটফর্মের ভীড় বাড়ছে। আমাদের কামরার যাত্রী সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মিস্ মিত্রা। এক সময় প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, বেচারি। কি হবে ওর? মিঃ ব্যালার্ডকে তুমি এ বিষয়ে কিছু বলেছ?

—না। এড়িয়ে গেছি। পাছে এই কাহিনী শোনাতে হয়।

—বুঝতে পারছি। ভালই করেছ। আমি অনুরোধ করছি, বোল' না। মিসেস্ মেথিউজ্ তখন বেঁচে, জুলি মিঃ ব্যালার্ডের কাছে এসে থেকে ছিল কিছুদিন। এ্যান্টনী, মানে আমার ভাইপো, সেও তখন দিল্লীতে। আমিই এক কুক্ষণে ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। মিঃ ব্যালার্ডকে মুখ দেখাব কি ভাবে তাই ভাবছি, জানতে তো একদিন উনি পারবেনই। জুলিকে এত স্নেহ করেন—শুনলে কত আঘাত পাবেন কে জানে। আচ্ছা—, জুলির সম্বন্ধে তোমার ফিলিংগস্, কিন্তু বোঝা—।

—মিঃ ব্যালার্ড আসছেন। ট্রেন ছাড়ারও সময় হ'ল। আপনি এবার নাবুন। নেবে গেলেন মিস্ মিত্রা। আমিও উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। প্লাটফর্মের প্রান্ত থেকে গার্ড সাহেবের হুইসিল শোনা গেল।

মিঃ ব্যালার্ড এসেই বললেন, থ্যাঙ্ক হেভেন্স্, তোমায় ধরতে পেরেছি। আমি তো ভাবছিলাম ট্রেন মিস করব।

—ইউ হ্যাভ এ র‍্যাশ ড্রাইভ, আই ক্যান সি, অভিযোগ জানালেন মিস্ মিত্রা, ডাক্তারের বারণ আছে, আপনি ভুলে যান।

মুখের ঘাম পোঁছার জন্যে রুমাল বার করছিলেন মিঃ ব্যালার্ড। অপরাধীর মত হাসলেন।

মিঃ ব্যালার্ডের হাতে একটা কাগজের রোল। অন্য একটা মোটা কাগজে মোড়া রয়েছে। সেলো-টেপ দিয়ে জোড়া রয়েছে দু'তিন জায়গায়। এত তাড়াহুড়োতেও মন্দ প্যাকিং করেন নি। কাগজের রোলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা সাবধানে নিয়ে যাবে। ওর সঙ্গে একটা নোট রইল। তোমাদের অফিসের সেই মিস্ ক্লার্কসন, —তাকে দেবে। মিস্ মিত্রারটা তৈরী হয়ে ওঠেনি এখনও। এটা তার বিকল্প ব্যবস্থা, বুঝতেই পারছ। পোষ্টে পাঠাতে ভরসা হত না। এবার আমি নিশ্চিন্ত। মেয়েটির বিয়ের কোর্টশিপ চলছে। এটা আমার তাকে 'বৌভাতের' প্রেজেনটেশন। তোমায় কথা দিচ্ছি, এবার আর চুরি করে ফিরিয়ে আনব না।

—আপনি বাড়ী গিয়ে ছবিটা নিয়ে এলেন ?

—হ্যাঁ ভাই। লেট ডিসিশন বলতে পার। ভাল কথা, তোমার এ্যাপয়েন্টমেণ্টের কথা এরা দিন সাতেকের মধ্যেই জানাবে। উইশ ইউ বেষ্ট অফ ব্রিটিশ লাক্।

গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি বললাম, আমার কিন্তু জানা হ'ল না মিস্ ক্লার্কসন আপনার কে ?

মুখে হাসি, মিঃ ব্যালার্ড নিরুত্তর। জবাব দিলেন মিস্ মিত্রা, কেন তোমার তো ভারি বুদ্ধি। বুঝতে পারনি ? ও মেরিনার মেয়ে।

দিল্লী ষ্টেশনের লোকারণ্য প্লাটফর্মের ওপর মিঃ ব্যালার্ড আর মিস মিত্রা হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাচ্ছেন। আমি ছবির রোলটা তুলে নাড়তে থাকলাম। ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি বহু সাধারণ মানুষের ভীড়ে দুটো বিশিষ্ট চরিত্র। এক মৃত শিল্পীর দেহ বহন করছেন একজন মেশিনটুল ডিজাইনার—উইলিয়াম ওয়াণ্টার ব্যালার্ড। আর তাঁর প্রাক্তন বাকদত্তা, বর্তমানের ইনটালেকচুয়াল কমপেনিয়ন, ভালো আর সার্থকের আশ্চর্য সমন্বয়—মিস্ মিত্রা। একজন সুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্যা অজ্ঞাতকুলশীলা। অন্যজন তাঁরই প্রমাণিতব্য অবৈধ সন্তান, বাঙালী বিদ্বেষ আর হিতৈষার গৃহযুদ্ধে রণক্লান্ত সৈনিক।

ক্রমে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন দু'জনে। আমি দরজার মুখে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ছবিটা স্যুটকেশের মধ্যে পুরে, নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম।

ছবিটা কোন কাজে আসবে না। জুলি ক্লার্কসনের ক্ষতবিক্ষত মুখটা বধূবেশে কল্পনা করতে গিয়ে মর্মাহত হলাম আমি। ওয়াল্টারের মাষ্টার পিস্—আমার স্যুটকেশের মধ্যে একটা গুরুভার হয়ে রইল।

এতক্ষণে আর একবার আমাদের সহযাত্রী হিপি ছেলেটার দিকে চোখ পড়ল আমার। পাঁচজনের পায়ের ফাঁকে অসহ্য গরমের মধ্যে বসে পেকে গেঁজে যাওয়া আম খাচ্ছে কুবের নন্দন। চোখে মুখে অপার্থিব তৃপ্তি।

বাইরের দিকে ফিরে তাকালাম। গাড়ী যমুনার ব্রীজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, নদীর বুক জুড়ে শুধু বালি। জনের বিশীর্ণ জলরেখা যদি কোথাও থাকেও চোখে পড়ল না।

হঠাৎ মনে হ'ল, এমনি নিঃতরুপাদপ মরুর বিস্তারই বুঝি জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। আদি অন্ত জুড়ে রুক্ষতার অপ্রতিদ্বন্দ্ব পরাক্রম। এর মাঝে কোথাও এক বিন্দু সজল স্পর্শ থাকলেও চোখে পড়ে না। হাজার দুই বছর আগে, মধ্য প্রাচ্যের কোন বধ্যভূমিতে কয়েক বিন্দু শোণিত ঝরেছিল। তৃষিত মৃত্তিকা তার সবটুকু শোষণ করেছে। আমার স্যুটকেশের মধ্যে তার এককণা বাষ্প বিন্দুও স্থান পায়নি।

শেষ শোণিত ঝরতে দেখেছি জুলি ক্লার্কসনের ম্যাডোনা—তুল্য মুখ থেকে। মিস্ মিত্রাকে বলার সুযোগ পেলাম না, সে শোণিতে আমার অন্তর সিক্ত হয়নি! ওঁকে বোঝান সম্ভব হত না, মণ্টুদার ছিন্ন মুণ্ডে দুটো বোবা চোখের নিষেধাজ্ঞা আমার জীবনে গভীরতর প্রভাব রেখে গেছে। হেরিডিটি আর ভ্যারিয়েশনের পোলারিটি দিয়ে এ মনস্তত্বের ব্যাখ্যা হয় না।

তবু জীবন তো এখনও গতিশীল। ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তচক্ষুর খাম খেয়ালে আর পয়েন্টের কর্কশ প্রতিবন্ধে হোঁচট খেতে খেতে জনতা এক্সপ্রেসের থার্ড-ক্লাস কামরাগুলো খুব সম্ভবতঃ আমাদের আলটিমেট্ এ্যাবসলিউট্ সুপ্রীম্ রিয়ালিটির দিকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

## ॥ জঞ্জাল ॥

এ গল্পের ভূমিকা বলতে আমি উপস্থিত করছি একটা পড়ে পাওয়া কবিতা। কবির নাম, শেখর ইসমাইল। কবিতাটা সেক্স নির্ভর, আর আমার মতে, দুর্ধর্ষ আধুনিক। গল্পের সঙ্গে কি ভাবে সম্পৃক্ত তা জানা যাবে যথা স্থানে আবার এর প্রসঙ্গ এলে। কবিতাটা এই রকম—

এ কবিতা আমার,
জন্ম নিয়েছে—
দুরাশা বিকৃতির ঔরসজাত
ক্লীব চিন্তার জরায়ুতে।

প্রত্যক্ষ দেখেছি—
আরশোলা উচ্চিংড়ে গোত্রের
নিকৃষ্ট কীটের মত,
কোমোডের নাপাক জলে
আছি ভাসমান।

পশ্চাতের দুটো পা
সম্মুখের দীর্ঘায়িত শুঁড়—
এখনো সজীব।
কচিৎ উৎক্ষিপ্ত উত্তোলিত,
ঘোষণা করে 'জীবন-অবিনশ্বর'।

যেমন শুনেছি আপ্তবাক্য—
'রিডিকুলাস থেকে সাবলাইম—
মাত্র একপদ', তেমনি—
জীবন থেকে মৃত্যুর মাঝে,

কটি পলে অর্জিত
এ কাব্য আমার।
এই তার নিলাজ বিবৃতি।

দেখেছি—
স্বাস্থ্যবতী কিশোরীর,
শঙ্কায় শিহরিত প্রথম ঋতুস্রাব,
তার প্রোটিনপুষ্ট জঘণার
মোহন চিকণ শ্যাম
আশ্চর্য্য সুন্দর।

নতুবা পরক্ষণেই—
মস্তান কিশোরের রক্তাপ্লুত কর,
চকিতে ধুয়ে ফেলা
অপরাধের শেষতম স্বাক্ষর।

চঞ্চল শিশুকে বেঁধে রেখে
তরুণী মায়ের ঠোঁটে জিভে
স্পষ্ট সেই আদিম আওয়াজ
সি—সি—সি
সুকুমার লিঙ্গটি প্রাণোচ্ছল ছন্দে
বারেক উত্থিত আনত,
পরক্ষণে প্রস্রাবে পুত—
নাপাক কোমোড।

আবার দেখেছি—
গত যৌবনার রতি বিলাস
কুশলী ব্রা'র বাঁধনে
একত্রীভূত শিথিল মেদ।

তার বেশরম আত্মনিবেদন
অপাপবিদ্ধ বেকার তরুণের
অপটু মৈথুন—
ক্ষিপ্রতার শেষ।

লেখার মধ্যে অনেক কাটাকুটি। শেষ অংশটা প'ড়ে উঠতে পারিনি। আমি যেখানে শেষ করেছি তারপরেও আরও খানিকটা ছিল। কেউ এসে শেকল টেনে দেবে, আর তারপর কিছুটা স্বচ্ছ জলের তরঙ্গভঙ্গে বহুদর্শী উচ্চিংড়ের বিলাপ—এই রকম কিছু।

লণ্ডনের ওয়েষ্ট—হ্যাম্পসটেড্ অঞ্চলে হপ্তায় চার পাউণ্ড অর্থাৎ মাসে তিনশো টাকা ভাড়ায় বারো বাই বারো ফিট্ ঘরে পেয়িং-গেষ্ট হ'য়ে রয়েছি কিছুদিন। এবার যেতে হবে স্কট্ল্যাণ্ডের শীতপ্রধান ডাণ্ডি সহরে। ফিণ্ডলে রোড আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে বেকারলু লাইন ধরে পিকাডেলি সারকাস, তারপর পিকাডেলি লাইন ধরে কিংসক্রসের সেণ্ট প্যানক্রাস ষ্টেশন। তারপর সেখান থেকে সারফেস ট্রেন—আমার নার্ভাস প্রকৃতির ল্যাণ্ডলেডি আমায় পাখি পড়া করে এই মত নির্দেশ দিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করিয়ে দিলেন।

কিংসক্রস ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। জোর কদমে ছোটা ইণ্টার-সিটি নয়, লণ্ডন থেকে এডিনবারা পর্যন্ত প্রায় সব ষ্টেশনেই থামতে থামতে যাবে। প্লাটফর্মের মাইকে শেষ ঘোষণা শোনা যাচ্ছে—পিটারবারা, ডান্কাসটর, ইয়র্ক, ডারলিঙটন, নিউক্যাসল্—ইত্যাদি। এডিনবারায় ট্রেন বদল রাত প্রায় আড়াইটাতে। ডাণ্ডি পৌছব কাল ভোর ছটা নাগাদ।

আমি একটা নো-স্মোকিঙ্ দেখে বসেছিলাম। ইংলণ্ডের সব ট্রেনেই এই সুবিধাটা আছে। যাদের তামাকে অরুচি তাদের আলাদা কামরা। আমার কুপেতে তাই আমি ছাড়া অন্য কোণে সৌম্যদর্শন একবৃদ্ধ। আর ঠিক আমার সামনেই এক ভীষণদর্শনা বুড়ী। বুড়ীকে দেখছিলাম। স্কচ্ কি ওয়েলশ্ বোঝবার মত জ্ঞান আমার হয়নি, তবে সাজসজ্জা দেখলে বোঝা যায়, বুড়ী টাকার কুমীর সবই ঠিক আছে বুড়ীর, শুধু মাথাটা ছাড়া। হিষ্টিরিয়া গ্রস্থ বোধ হয়। নো-স্মোকিঙ্-এ বসে একটার পর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে যাচ্ছে। আর অনর্গল

অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে কুৎসিত ককনিতে। মুখ থেকে সমানে থুথু ছিটিয়ে বেরুচ্ছে। ট্রাভল করছে একা—ওকে সামলাবে সঙ্গে এমন কেউ নেই।

দু-একবার লক্ষ্য করেছি, কোণে-বসা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের শূন্য দৃষ্টি হাতের ম্যাগাজিনে স্থির। পড়ছেন না। বুড়ীর দিকে একবারও ফিরে তাকান নি, না আমার মত একটা কালো চামড়ার দিকে।

অন্যের বিষয় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকাই এখানে সুরুচির লক্ষণ। বাসে টিউবে ট্রেনে যত ম্যাগাজিন বিক্রী হয়, তার শতকরা ত্রিশ ভাগও পড়া হয় না। পরিশীলিত দৃষ্টিকে কালো অক্ষরে আটকে রাখার জন্যই কেনা হয় কাগজগুলো।

ট্রেন ছাড়লো। দেশে প্রিয়বিচ্ছেদের যে কটা ছবি দেখেছি স্মরণে আনার চেষ্টা করলাম। এখানে দেখছি আর এক ছবি। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে প্রিয়া, প্লাটফর্মে প্রিয়বর—বিসদৃশ্য চুম্বানিলিঙ্গন আর শেষ হতে চাইছে না। এমনি সব কামরাতেই একটি দুটি। আমাকে বোঝানো হ'য়েছে, দেখতে দেখতে সবই ক্রমে গা সওয়া হ'য়ে যাবে।

ট্রেন ষ্টেশন ছাড়লো। প্রিয় বিরহে কাতর টিন-এজাররা এবার লম্বা সিগারেটে আগুন দিয়ে নিকোটিন-ছাঁকা ধোঁয়া লাঙ্গস-এর ভেতর অনেক নীচ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর নয় খুলে বসেছে জেমস্ হেড্‌লী চেজ্-এর কোন সেক্স—থ্রিলার। ট্রেনের কামরাগুলো শীত নিয়ন্ত্রিত। তবু এই মার্চ মাসে কোটের ওপর ম্যাকিনটোস চাপিয়েও শীতে কাঁপছি আমি।

এখন আর কিছু করবার নেই। বসে বসে ঘুমতে ঘুমতে, ঢুলতে ঢুলতে, এডিনবারা পৌঁছব।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ নাবলেন পরের ষ্টেশন পিটারবারাতেই। হাতের ম্যাগাজিনটা অবিলম্বে প্লাটফর্মের লিটর-এ গুঁজে দিলেন। বুড়ী হঠাৎ মুখবন্ধ করেছে। অন্য কেউ উঠল না।

গ্রানথাম্ ষ্টেশনে উঠল দুটো ছোকরা স্টুডেণ্ট। আমার মত একটা কালোচামড়া দেখে তৎক্ষণাৎ নেবে অন্য কামরায় চলে গেল। কারণটা আমি না হ'য়ে নো-স্মোকিঙ্ হতে পারে—এই অনুমানকে আমি প্রশ্রয় দিলাম। ওদের তড়িঘড়ি নেবে যেতে দেখে বুড়ীও হঠাৎ হুড়মড় করে নেবে পড়ল। ট্রেন ছেড়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গেই। কামরায় এবার আমি একা। বিচিত্র কিছু নয়; ইংল্যাণ্ডে

দুপুরের দিকে সম্পূর্ণ ট্রেনে একা আমি সুইডেন থেকে লণ্ডনে ফিরেছি। আহা, তখন আমার সে কি মেজাজ।

এখানকার প্রতি ষ্টেশনেই কয়েন অপারেটেড্ মেশিন আছে। চা, কফি, কেক, বর্ণভিটা, এমন কি বিয়ার, যার যাতে রুচি, ডায়াল ঠিক মত সেট করে ছেঁদার মধ্যে ছ'পেনি গুঁজে দিলেই স্বয়ংক্রিয় বেয়ারা কৌরণ সেটাকে সার্ভ করে দেবে। কিংসক্রস্ ষ্টেশনে ছ'পেনির কফি খেয়েছি কাগজের পাত্রে—তখন সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি। এবার সারারাত হরিমটর। এডিনবারায় ট্রেন বদলের মাঝে আবার কফি খাব।

এবার শরীর গরম হয়ে উঠেছে। ঘুমও পাচ্ছে। ম্যাক'টা খুলে ফেলে পা-দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিলাম। ডানকাসটার পেরিয়ে যেতেই ঘুম এসে গেল।

এডিনবারায় কফির সঙ্গে হ্যাম্বারজার খেলাম। গো বরাহের বাদবিচার করব এত ভাল চরিত্র আমার নয়।* ভট্চায বামুনের ছেলে আমি, অথচ সরষের মটনির সঙ্গে ওয়েল-ডান ষ্টেক্-এর কথা ভাবলে রসনা সিক্ত হয়।

রাত তখন আড়াইটে। অথচ ষ্টেশন গুলজার। হঠাৎ মনে পড়ল, আজ রবিবার—না, তাত নয়, আড়াই ঘণ্টা হ'ল রবিবার শেষ হয়ে গেছে। শনি রবি দুটো দিন উইক-এণ্ড-এর ছুটি গেছে। ভোর থেকে আবার স্কুল, কলেজ, কাছারি, কারখানা অফিস তো আছেই। সাপ্তাহিক স্ফূর্তিসেরে এবার সবাই কাজে ফিরছে।

আমার কামরায় এবার আমি ছাড়াও তিনজন যাত্রী। ট্রেন প্রায় ছাড়ছাড়। এমন সময় দেখা গেল বিরাট দুটো সুটকেশ নিয়ে বেসামাল অবস্থায় ছুটে আসছে দুটো ছেলেমেয়ে। মেয়েটা ভারতীয়, কিম্বা পাকিস্তানী। ছেলেটা এদেশের। হয়ত আইরিশ। আমাদের কামরাতেই এসে উঠল মেয়েটি।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। ব্রিটিশ চরিত্রের নির্লিপ্ত শালীনতা পাবো কোথায়। হা করে ভারতীয় কিশোরী আর আইরিশ তরুণের পার্টিঙ-কিস্ দেখছি। তারিফ করা চলে—কত ফ্রি ওরা। আমার বিয়ে হয়নি, তবু মনে হয় আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারে দুপুর রাতেও বরকনে এত নিঃসঙ্কোচে এসব করে না।

প্রেম, প্রণয়, কাম ইত্যাদি ফিলিঙসগুলোর বহিঃপ্রকাশে জড়তা নামক একটা কিছুর সামান্য ভূমিকা থাকা ভালো,—এতে ওরা বিশ্বাসী নয়।

প্লাটফর্মের মাইকে বামাস্বরে ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি—ডানফারলিন,

কিরক্যাল্ডি, কুপার, ডাণ্ডি—ইত্যাদি। শুনতে পেলাম না, এ ট্রেন হয়ত তারপরেও এবুর্ব্রথ্,, মন্ট্রেজ হ'য়ে মাছের হাট এবারডিন্ পর্য্যন্ত যাবে, বলতে গেলে হিমের দেশ স্কটল্যাণ্ডের সেই হ'ল সীমারেখা।

রাত সাড়ে তিনটে। আজ মার্চ মাসের দু'তারিখ। ইকুয়েটরের ছাপান্ন ডিগ্রী উত্তরে এই মাঝ রাতেই আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। এখানে ভূপ্রকৃতি সামার সল্‌সটিস্ অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়ণের শেষভাগে এসে পৌছেছে। দিনে সতেরো ঘণ্টা দিনের আলো। সূর্য ডোবে রাত আটটায়। ওঠে ভোর চারটেয়। 'ছোটদিন' বাইশে জুন নাগাদ সব চেয়ে বড় দিন হবে—ভোর সাড়ে তিনটে থেকে নিয়ে রাত সাড়ে ন'টা অব্দি।

রেল লাইনের দুদিকে সুন্দরী স্কটল্যাণ্ড। শুনেছি স্কচ্‌রা মনে করে ভূপৃষ্ঠে প্রকৃতি কোথাও এত রূপসী নয়। ট্রেনে বসে সেই মুহূর্তে আমারও মনে হ'ল-সেটা খুব একটা অত্যুক্তি নয়।

দেশে থাকতে কাশ্মীর আমার দেখা হয়নি। ইউরোপে, সুইজারল্যাণ্ড দেখেছি অনেক পরে।

ফার্থ অফ-ফোর্থ সমুদ্রের ধার দিয়ে ট্রেন ছুটছে। পেছনে ফেলে এসেছি পাশাপাশি নতুন আর পুরণো ফোর্থ ব্রিজের মুখে কুইন্‌সফেরির টোল। এবার একপাশে সমুদ্র বা সমুদ্রের খাড়ি, যাকে ফার্থ অফ-ফোর্থ বলা হয়। সমুদ্রতীর, যেমন সহজে কল্পনীয়, সুদূরে বিস্তীর্ণ বালুকা বেলার বন্ধনী রেখায় শাসিত—সে রকম নয়। বিশৃঙ্খল পাথর আর পাহাড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নীল স্ফটিক জল। ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গল উড়ছে। তারওপর ভোরের আলোর সঙ্গে কুয়াশার অস্বচ্ছ অবগুণ্ঠন। অন্যদিকে স্কটল্যাণ্ড সুন্দরীর উদ্‌ঘাতী তাম্রাভতণু। মাঝে মাঝে ছবির মত ছোট ছোট ফার্ম, লোকালয়, ক্বচিৎ কখনও কলকারখানা।

বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলাম। এবার কামরার ভেতর তাকাতেই চোখাচোখি হ'ল ভারতীয় কিশোরীর সঙ্গে। সেই যে ট্রেন ছাড়ার ব্যাস্ততায় আমার সুটকেশ তুলে নেওয়া উপলক্ষে 'থ্যাঙ্কু, ইউ আর ওয়েলকাম'-এর সৌজন্য সারা হয়েছে তারপর আর আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই নি। এবার সে ফিক করে হেসেই কিঙ্‌ সাইজ ফিলটার সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বেনসন এ্যাণ্ড হেজেস-এর সুদৃশ্য সোনালী প্যাকেটের দিকে চোখ রেখে বললাম, নো, থ্যাংক ইউ।

—ডোণ্ট ইউ স্মোক ?

হেসে মাথা নাড়লাম। খাই না। আর সেই মুহূর্তে সেই পঞ্চদশীর কাছে আমি হয়ে উঠলাম একটা আমোদের পাত্র।

প্রায় অর্ধেক মুখ ঢাকা বব্ করা ফাঁপান চুল। নিম্নাঙ্গে চাপা স্লাকস্-এর ওপর উর্দ্ধাঙ্গে একটা খলবলে জাম্পার। মনিকিওর করা নোখে কাঁচা মাংসের রং। ঠোঁটেও তাই, আবার কপালে একটা ছ'পেনি সাইজের সেই-রং-এর টিপ।

চোখের নীচের পাতা থেকে নীচের দিকে টানা পাঁচ ছটা মোটা মোটা কাজল রেখা—'বেবীডল' আঁখি পল্লব। ঘাড় কাত করে আহ্লাদী আহ্লাদী গলায় বলল, ইটস্ চিলিং, হাউ এ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক ? চোখের ইশারায় সুটকেশ দেখাল—অর্থাৎ মাল সঙ্গে আছে।

এবার আপত্তি না করে আমি সম্মতিসূচক হাসলাম। চলবে। ছুঁড়ীর দৌড় কতদূর দেখা থাক। টোবাকো হোক বা এ্যালকোহল, আমার কোনটাই চলে না। তবে সঙ্গদানের খাতিরে কুকর্ম করতে আমি সদাই প্রস্তুত। তাছাড় এই হাড় কাঁপান শীতে খাস স্কটল্যাণ্ডের বুকের ওপর এ বস্তুকে হেনস্থাই বা করি কোন সাহসে!

পঞ্চদশী সুটকেশ খুলে একটা নিব বার করল। প্লাষ্টিকের বাহারদার এগ্-কাপ বেরুল দুটো। টইটম্বুর ভরা হ'ল দুটিকে।

এবার টোষ্ট করা বিধি। ভরা পাত্র দুটো সাবধানে ওপরে তুলে ঠুক্ করে ঠেকালাম আমরা। মেয়েটি বলল, টু মাই পুওর ইণ্ডিয়া। বাই দ ওয়ে, আই বিলিভ্ ইউ আর নট এ পাকিস্তানী ?

নিট্ স্ক্চ হুইস্কিতে ছোট একটা চুমুক দিলাম। কণ্ঠনালী বেয়ে অঙ্গার প্রবাহ নেবে গেল। তার জ্বালা লুকোতে ভারতীয় পঞ্চদশী তখন মুখ বিকৃতি করে সিগারেটের ধোঁয়া গিলছে। ট্রেন কিরক্যাল্‌ডি পেরিয়ে গেল।

ফার্থ-অফ্-টে। সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে ডাণ্ডি সহর। সমুদ্রের ওপর টে'—ব্রিজ পেরিয়ে ট্রেন ডাণ্ডি ষ্টেশনে ঢুকল।

এরপরের দৃশ্যে দেখা গেল, ডাণ্ডি ষ্টেশনের সামনে ভোরের জনহীন পথ ধরে দু'টো ভারী সুটকেশ দুহাতে ঝুলিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে হাঁটা দিয়েছি আমি।

পাশে সঙ্গীনি পঞ্চদশী। তার হাতে আমার হাল্কা এ্যাটাচি কেসখানা। মুখে কিঙ্‌সাইজ বেনসন এ্যাণ্ড হেজেস্‌। টে-র খাড়ি থেকে দুরন্ত উইণ্ড-গাষ্ট হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েটির বাপমায়ের দেওয়া নাম হয়ত আজ তাঁদেরও মনে নেই। এখন ও নাম নিয়েছে অগাষ্টা। ভরা ভাদরে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকবে হয়ত—তাই ওই নাম, এমন উচ্ছলতা।

অগাষ্টার দিদি স্বামী পরিত্যাক্তা অহমদাবাদের পদ্‌মিনী চৌহান, আর ঢাকার শেখর ইসমাইল, এরা আমার এ গল্পের নায়ক নায়িকা। ঘটনা কাল মার্চ, এপ্রিল, মে, উনিশশো একাত্তর। আমি যেদিন ডাণ্ডি পৌছলাম ঢাকায় সেদিন ইয়াহিয়াখান কারফিউ জারি করেছেন।

বর্তমান বাঙলায় তখন তাঁর পাঠান সেনার প্রেতনৃত্যের আয়োজন পূর্ণপ্রায়।

অগাষ্টাদের পুরো পরিবার এখন ইংল্যাণ্ডে। ওর বাবা কিছুদিন আগে পযন্ত ইণ্টার সিটি যাত্রী বাসের ড্রাইভারী করছিলেন। কোন কারণে চাকরী ছেড়েছেন। বর্তমানে বেকার। অগাষ্টা বলল, ও একটা কোর্স করছে, কালার টিভির এ্যাসেম্বলি শেখার—দারুণ প্রসপেক্ট্‌। সংসার চলছে বাপের আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট বেনিফিটের ভাতায়, আর প্রধানতঃ পদ্‌মিনী চোহানের রোজগারে। আমি ক্যাম্পারডাউন অঞ্চলে যে ফ্যাক্টারীতে স্পেসালাইজ করতে যাই ড্রাই ব্যাটারীতে, পদ্‌মিনী সেখানে ফেরো-গার্ল, অর্থাৎ ব্লু-প্রিণ্ট ফটো কপি ইত্যাদি বার করে। আর শেখর ডেভেলাপমেণ্ট ল্যাব এ্যাসিটেণ্ট্‌। বাঙলায় বলা চলে—উন্নয়নমূলক গবেষণাগারের কর্মী। এগল্পে আর একজনের একটু ভূমিকা আছে। এইখানে তার পরিচয় দিয়ে রাখছি। সে হ'ল পদ্‌মিনীর পোষা ভাল্লুক সদৃশ্য বৃহৎ বুড়ো কুকুর—অগাষ্টা যার নাম দিয়েছিল ওল্ডটম।

শেখর ইসমাইল পদ্‌মিনীদের বাড়ীর একটা ঘরে পেয়িং-গেষ্ট হয়ে থাকে। অগাষ্টা নিঃসঙ্কোচে বলেছিল, ওটাও ওদের একটা সোর্স অফ্‌ ইনকাম। আমি যতদিন অগাষ্টাদের বাড়ী গেছি ওল্ড-টমকে শেখরের ছোট ঘরটার মেঝেয় পড়ে ঝিমোতে দেখেছি।

আমার জন্যে হোটেল বুক করাই ছিল। এই সাতসকালে আমায় রিসিভ্‌ করতে ষ্টেশনে এসেছিলেন হেড অফিসের নির্দেশ প্রাপ্ত এক ভদ্রলোক। তবে অগাষ্টা আর তার দুই বিরাট সুটকেশ এমন বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল যাতে তিনি

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য নামের এই বঙ্গ সন্তানটিকে ঠিক ঠাউর করে উঠতে পারেন নি।

ক্যাম্পার ডাউনে ফ্যাক্টরীর কাছেই অভিজাত পার্ক হোটেলের আড়াই পাউণ্ড দৈনিক ভাড়ার ঘরে আমায় তোলা হ'ল। তেরাত্তির না কাটতেই আমি গুটি গুটি অগষ্টাদের বাড়ীর কাছে রব-রয় নামের গেষ্ট হাউসে গিয়ে উঠলাম। সেখানে খাওয়া থাকার দুটোরই সাপ্তাহিক দক্ষিণা মোট সাত পাউণ্ড। পুওর ইণ্ডিয়ার ততোধিক পুওর হিরণ্ময় ভট্‌চায হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

লণ্ডনের হিথ্রো এয়ার পোর্টে পা দিয়ে সবচেয়ে প্রথম আমার মনে যে বোধটা জন্মেছিলো তা হচ্ছে কাশাহত হীনমন্যতার। মনে হয়েছিল, এখানে আমার একমাত্র পরিচয়, আমি একজন গড় ভারতবাসীর প্রতিনিধি—এ রিপ্রেজেনটেটিভ্ এ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ান। আর এমন একজনের যে ইমেজ্ সৃষ্টি করা হয়েছে উত্তর স্বাধীনতা যুগে, তার যথার্থ রূপটা দেশের বাইরে না গেলে বোঝা যায় না। আমিও এই প্রথম উপলব্ধি করলাম আমার দেহে মনে চেতনায়। কারণ এই নয় যে আমি হাইপার্-সেন্সিটিভ্। কারণ এই, ভারতবর্ষের বাইরে যারা বছরের পর বছর বাস করে, আর যারা নিজেদের যথার্থ ভারতবাসী বলে মনে করতে লজ্জা পায়, আমি তাদের ওপর এই গ্লানিকর প্রোপাগাণ্ডার কুৎসিত প্রভাব আর প্রতিক্রিয়া দেখেছি। সেবার আমি কন্টিনেন্টের সব কটা দেশে ঘুরেছিলাম, আর তারপর এই লেখায় হাত দেবার আগে, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, হঙ্কঙ্, তাইওয়ান আর জাপান এতগুলো দেশ ঘুরেছি। সে শুধু কারিগরী কুশলতা অর্জন করতে নয়, আমার এই কমপ্লেকস্‌কেও যাচাই করতে। মনে পড়ছে, লণ্ডনে গ্যাসবোর্ডের অফিসে বসে কিছু ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে আমার আলোচনা। হঙ্কঙের এক প্রাসাদশীর্ষে ঘূর্ণায়মান রেস্তোঁরায় বসে ভারতীয় ক্রিশ্চান এক বিজ্‌নেস ম্যাগনেটের অভিমত, সিঙ্গাপুরে পথের ধারে এক তামিল তনয়ের মনিহারী দোকানে দাঁড়িয়ে শোনা তার মন্তব্য, তাইপের এক নাইট ক্লাবে আধা ভারতীয় আধা মার্কিন এক রূপোপজীবিনীর বিদ্রূপ—আরও বহু উল্লেখ করা যেত—সব কিছুর মূলে একই কথা, ভারতবর্ষের দারিদ্র, জনসংখ্যাস্ফীতি আর অনগ্রসরতার দিকে আঙুল তুলে বাকি বিশ্বের ধিক্ ধিক্। আমি আধখানা বিশ্ব ঘুরে বুকভরা এই জালা নিয়ে ফিরেছি। কেয়ার, অক্সকাম্ অরগানাইজেশন, এড্ ইণ্ডিয়া ক্লাব এমন আরও অনেক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান দেশে দেশে কাজ করছে—যাদের কাছে

আমরা কতটা উপকৃত আমি বলতে পারি না। তবে বিশ্বের দরবারে আগামী আরও দু'শো বছর এরা হয়ত আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মনোবলটুকু কেড়ে নিচ্ছেন।

হায়ার টেক্‌নিকল ট্রেনিং-এর নাম করে দরিদ্র ভারতের অনেক শিক্ষানবীশ বিদেশে যায়। আমিও তাদের একজন। দৈনিক বারো পাউণ্ড হিসেবে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা আমার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে। তাতে খাওয়া থাকা যাতায়াতের ভাড়া যাবতীয় খরচ চালাতে হবে। আর ফেরার সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সাহেব সুবো এঁদের জন্য যা কিনে ফিরতে হবে—তা, না জাহাজে আঁটবে, না পার হ'তে পারবে কাষ্টম্‌স্‌-এর ফাটক।

আমার ট্রেনিং-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এসপিওনাজ্‌। কথাটার অভিধান সম্মত অর্থ দাঁড়ায় গোয়েন্দাগিরি। আমার মনে হয় যদি বলি, সাহেবদের জ্ঞানের ভাঁড়ারে সিঁদ কাটা, তবেই আরও নিখুঁত হয়। ঈশ্বর করুণাময়, তাই ডাণ্ডি গিয়ে শেখর আর পদ্‌মিনী এদের দুজনকে আমি অমন ষ্ট্রাটেজিক পদে পেয়ে গেলাম। মনে হয়েছিল হাতে চাঁদ পেলাম। বাস্তবিক, এত সহজে যে দুটি সিঁদ কাটার দোসর জুটবে, আশা করা যায়নি।

উন্নয়ন মূলক গবেষণাগারের কর্মী শেখর ইসমাইল-এর সঙ্গে আমি যেচে ভাব করলাম। ডাণ্ডির কারখানা তখন মারকারী ব্যাটারীর পাইলট্‌ প্লাণ্ট্‌ চালু করে পুরোদমে তার উৎপাদনের জোগাড় যন্তর করছে।

প্রথম যেদিন আমি পার্ক হোটেলের আয়েস ছেড়ে সুলভ দক্ষিণার আস্তানায় এসে উঠলাম, সেদিন সন্ধ্যায় পদ্‌মিনীদের বাড়ী চা খেলাম। তার দিন সাতেক পরে আমায় ডিনার দেওয়া হ'ল। পদ্‌মিনীর হাতের রান্না মুরগীর মাংস আর পোলাউ খেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়লাম। তখনও জানা ছিলনা, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।

পদ্‌মিনী বাড়ীর বড় মেয়ে। বয়স বছর পঁচিশ। তারপর বিশ্ববখাটে এক ভাই। এডিনবারায় কাজ করে—তবে বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না। তারপর অগাষ্টার আর এক দিদি,—সে বিয়ে করে আহ্‌মদাবাদে স্বামীর ঘর করছে। তারপর অগাষ্টা,. অগাষ্টার পরও আরও তিনটি—সাকুল্যে সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েও চৌহান দম্পতি এখনও 'কিপ্‌ দি ষ্টর্ক এওয়ে' তে বিশ্বাসী নন্‌। পদ্‌মিনী মা ডিমভরা কৈমাছ সদৃশ্য গতর নিয়ে আমাদের ডিনার সার্ভ্‌ করলেন।

চৌহান পরিবার আর শেখর ইসমাইল-এর সঙ্গে আমার সেই রাতেই গভীর ভাব জমে গেল। অবশ্য বিদেশে বিভূঁয়ে দেশওয়ালি হ'লেই আমরা ভারতীয়রাঁ একেবারে গলায় গলায় হয়ে পড়ি— সিঁদ কাটার দোসর হওয়ার ব্যাপারটা পাকা হয়েছে তার অনেক পরে।

পদ্মিনীর বাড়ীতে যে রাত্রে আমাদের খাওয়া ছিল, সেদিন মার্চ উনিশশো একাত্তরের তেরো তারিখ। ডাণ্ডিতে আমাদের তখনও অজানা, পূর্ব বাঙলায় আওয়ামি লীগের অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে। চাটগাঁর বন্দরে এসে পৌঁছচ্ছে জাহাজ বোঝাই পাঠান সেনা।

ডাণ্ডিতে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। রাস্তায় ফুটপাথে আটইঞ্চি উঁচু বরফ। সপ্তাহে সাত পাউণ্ড থাকা খাওয়ার বদান্যতায় সেন্ট্রাল-হিটিং আশা করা যায়না। খাটের তলায় একটা সিকি কিলোওয়াট মাপের হিটার জ্বালিয়ে সোয়েটার আর মোজা পরে রাত্রে ঘুম আসতে চায়না। সমুদ্রের মুখোমুখি ঘর পেয়েছি। তবে বরফ পড়া আরম্ভ হবার পর ফার্থ-অফ-টে হাড় কাঁপান উইণ্ডগাষ্ট্ স্থগিত রেখেছে। দিনে দশ ঘণ্টা কারখানায়, আর রাত্রে ছ'ঘণ্টা নোট আর রিপোর্ট তৈরী—কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছিল না। তবু মাঝে মাঝে পদ্মিনী চৌহানের খাঁটী ভারতীয় মুখটা অজন্তার ফ্রেস্কোর মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। না, যা ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয়। শুনে মনে ব্যথা লাগেনি—পদ্মিনী কুমারী নয়। অবাক হয়েছিলাম, এমন মেয়েকে হেনস্থা করতে পারে সে কেমন পুরুষ!

দেশ থেকে বন্ধুর চিঠি পেয়েছি—সব কথার মাঝে বড় কথা, পূব বাঙলার খবর। লিখেছে, পিঁপড়ের সারি বেঁধে সর্বহারা উদ্বাস্তরা ভারতের সীমারেখা পেরিয়ে এদিকে চলে আসছে। পূব বাঙলায় লুঠ খুন আর নারীধর্ষণ নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে ইয়াহিয়াখানের পিশাচ সেনা।

সেদিন রাত্রে পদ্মিনীদের বাড়ীতে ডিনার সারার পরও আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম। হেঁসেল উঠে যাওয়ার পরও কফি চলেছিল। আমি বিদায় নিলাম তখন রাত এগারোটা।

পদ্মিনীদের বাড়ী থেকে আমার আস্তানা হাঁটাপথে মিনিট পাঁচেক। শেখর আর অগাষ্টা ফুটপাথের বরফ ভাঙতে ভাঙতে কিছুদূর আমার সঙ্গে চলল। পদ্মিনীর ওল্ড-টম ব্যাজার মুখে গেট পর্যন্ত বেরিয়ে এসেই আবার ফিরে গেল। শুভরাত্রি জানাবার সময় পদ্মিনীর শান্তসুন্দর মুখটার দিকে আমি দুদণ্ড

চেয়েছিলাম। আমার চোখে দু'টো নিরাসক্ত চোখ রেখে ও বলল, আবার আসবেন।

ফুটপাথে বরফের ওপর হাঁটতে হাঁটতে শেখর বলল, আপনাদের নতুন কারবার, আর কম্‌পিট করছেন এই ট্রেডে যারা ওয়ার্ল্ড-জায়াণ্ট তাদের সঙ্গে। ডাণ্ডিতে স্পেসালাইজ করতে আসায় আপনার দায়িত্বের গুরুত্ব আমি বুঝেছি। কথা দিচ্ছি, ইমান না খুইয়ে যতটুকু খিদ্‌মত আপনাকে করা সম্ভব আমি করব।

শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা দুদিকে হাঁটা দিলাম। ক্ষুদে অগাষ্টা শেখরের কাঁধ ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি করে থাকবে, হঠাৎ দেখলাম শেখর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওকে বরফের ওপর আছড়ে ফেলল। শেখর সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পথের ওপর বসে বরফের গোলা বানিয়ে বানিয়ে অগাষ্টা ওকে ছুঁড়ে মারছে।

পথঘাট জনমানবশূন্য। এই দুপুর রাতে কচিৎ এক আধটা গাড়ী যাচ্ছে। চাকা থেকে বরফ ছিটোবার দৃশ্যটা আমার কাছে নতুন। গায়ে আমার ভারি ওভারকোট। কিন্তু মাথায় টুপি নেই। মাথায় ঘাড়ে বরফ জমছে। ভাবছিলাম শেখর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল, তবে চুক্তি রাখল ওর ওই 'ইমান না খুইয়ে' সর্তের। ওকে এই কদিনেই আমি চিনেছি। পদ্মাপারের গোঁ'য়ের সঙ্গে এই ছ'বছর বিলেতে থাকার দৌলতে ব্রিটিশ চরিত্রের কিছু সদ্‌গুণ ও কঠিন অধ্যবসায়ে আয়ত্তে করেছে। গবেষণাগারের কন্‌ফিডেনশিয়াল কাগজপত্তর ফরমূলেশন ইত্যাদি যা আমার সিঁদ্‌কাটার উদ্দেশ্য—সে বিষয়ে কার্যসিদ্ধি ওর ওই 'ইমান না খুইয়ে'র প্রতিবন্ধে ক'পা এগোবে!

লাঞ্চের ছুটিতে শেখরকে আমি টেনে নিয়ে গেলাম ক্যান্টিনের ভীড় থেকে বাইরে ছোট একটা কফি শপে। নুনে পোড়া বেকন আর ফিংগার চিপস্‌ দু প্লেট অর্ডার দিয়ে ফেলেই আমি বেজায় ব্যস্ত হয়ে সার্ভিং গার্লকে মানা করতে যাচ্ছিলাম। শেখর নিজেই উঠে মেয়েটিকে ডেকে ফিশ্‌ এ্যাণ্ড চিপস্‌-এর অর্ডার দিল। আমি হিঁদুর ছেলে গো মাংস খাই, তাই বলে ও মোছলার পোলা শুওর খাবে কেন। বাঙাল মাছ খাবে। লজ্জায় জিভ কেটে তিনবার তওবা তওবা করলাম।

সেই নিরালা কফিশপে বসে শেখরকে আমি আমার পরিকল্পনাটা বোঝাবার

চেষ্টা করলাম। ঠিক যেমন করে কোন ক্ষুঁদে উকিল এক আহাম্মক মক্কেলকে ফাঁসির ফাঁদ থেকে বাঁচাবার ফন্দি বাতায়, সেই ভাবে।

চুপ করে বসে শেখর সব শুনল। ইংরেজের দু'শো বছরের গোলামী করেছি আমরা দুজনেই। সেই গোলামীর কলঙ্করেখা আমাদের দুজনের ললাটেই সমান গভীর। ভূগোলের পাতায় বিভেদ সৃষ্টি করে গেছে ইংরেজ। কিন্তু অন্যভাবে আরও একাত্ম করে গেছে আমাদের! কফি শপে বসে শেখরকে ছোট একটা গল্প শোনালাম আমি।

দিনকতক আগে ক্যামেরা হাতে পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম ডাণ্ডির কিছু কালার ট্রান্সপেরিন্সি ছবি তুলব, এই ভেবে। আকাশে সেদিন বিকেলে বেশ আলো ছিলো। ক্যাম্পারডাউনের রেসিডেন্সিয়াল কলোনীর মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছি। পথের ধারে বল খেলছিল বছর সাতেকের একটা স্কচ্ বাচ্চা! বলটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়তে আমি সেটা কুড়িয়ে বাচ্চাটার দিকে ফেরৎ পাঠালাম। মুখে বললাম, হ্যালো লাভি!

—এ এ—পাকিস্তানি, নাক কুঁচকে জবাব দিলো ছেলেটা। বল নিয়ে ছুটে পালাল।

এই গল্প দিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করেছিলাম। একটা সাতবছরের শ্বেতকায় শিশু আমাকে হোক বা শেখর ইসমাইলকে, নাক কুঁচকে 'এ এ পাকিস্তানী' বা 'এ এ ইণ্ডিয়ান' কেন বলে? আর কতদিন বলবে! এই অসম্ভ্রান্ত প্রশ্নটাকে কেন্দ্র করে সেদিন শেখরের কাছে আমার মনোভাব বলয়িত হয়েছিল।

শেখর কথা বলেনি এতক্ষণ। দু'বছর বিদেশে রয়েছে ও। অনেকে সইতে শিখেছে। বলল, আপনি আমার দেশাত্মবোধ নাড়া দিয়ে কথা আরম্ভ করলেন, আর শেষ করলেন এই সিদ্ধান্তে এসে যে আমি আমার ইমান খুইয়ে আপনাকে ইংরাজের কাগজ পাচার করব। আপুনি কি সত্যিই মনে করেন যা বলতে চেয়েছিলেন গুছিয়ে বলতে পেরেছেন?

খোঁচা গিলে বললাম, দেখ শেখর, তোমার ফ্যাক্টরীর সঙ্গে আমাদের একটা আইনসম্মত কোলাবোরেশন আছে। সে কথা তুমি জান। তবে সেটার প্রসার ছোট, খুবই ছোট। আমরা এদের সামান্য নো—হাউ'-এর জন্য সামান্য রয়ালটি দিয়েছি। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বাইরে এরা আমাদের কিছুই দেবে না। কিন্তু

আমাদের অনেক চাই। আর সেই অনেক চাওয়ার মূল্য আমরা দিতে পারব না। দেব না।

—কিসে কোলাবোরেশন আপনাদের ?

—পেষ্ট-লাইন। শুধু পেষ্ট-লাইন সিলিণ্ড্রিকল ব্যাটারীর। আর আমার কি চাই জান—পেপার-লাইন, লেয়র-ষ্ট্যাক্, এ্যালকালাইন। আর এমন কি, মারকারি ব্যাটারী—সব। আমার সব চাই শেখর। বুঝতে পারছ! আমাদের এই মতলব, ছুঁচ হয়ে ঢুকবার সুযোগটুকু করে নেওয়া হয়েছে, এবার—

—আপনি তো সাংঘাতিক—

—হাঁ সাংঘাতিক। তোমাকেও সাংঘাতিক হতে হবে শেখর। এ-তোমার আর আমার আর এক কোলোবোরেশন্। জাপানীরা যে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে, আর তা যে পন্থায়, এস আমরা সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিই। আমরা দু'জন—'এ এ পাকিস্তানী' আর 'এ এ ইণ্ডিয়ান' সম্পর্কে গুরুভাই হতে শিখি। পারবে ?

—আমি দেশকে ভুলে গেছি। দ্বিতীয় বার আন্দোলনের পর দেশ ছেড়েছি, আবার ফিরে যাব যবে—।

আবার কবে দেশে ফিরবে সে বাসনা শেখর গোপন রাখল। বলেছিল, ও দেশকে ভুলে গেছে। মিথ্যে বলেনি। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ও ফেরার। সত্যই দেশের খোঁজ রাখে না। জানে না, ওদিকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার স্বপ্ন সাধনায় রুধিরে তর্পণ আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গের জের টেনে আমিই বললাম তা আর তুমি পারবেনা শেখর। তোমার আগুন নিভে আসছে—সে হুঁশটুকু তোমায় আমিই ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি; না হ'লে তোমার ছেঁদো মরাল তোমাকে তোমার প্রাক্তন প্রভুর—এই ইংরেজের গোলামিতে স্থবির করে ফেলবে। বদ হতে শেখ শেখর, আমি তোমায় পথ দেখাচ্ছি।

—কি করতে বলেন আপনি ?

—আমি আমার জেনারেল ম্যানেজারকে লিখেছি। তুমি চীফ্কেমিষ্ট হয়ে আমাদের ফ্যাক্টরীতে যোগ দিতে রাজি আছ। তোমার একটা আনকনফারমড্ বায়ো-ডাটা চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলাম।

—কি বলছেন আপনি ?

—চমকালে। আমি একটা এ্যাপলিকেশন-ফর্ম ও আনিয়েছি। কাল পরশুর ডাকে এসে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার সই আর সম্মতি শুদ্ধ সেটা ভারতে ফিরছে। তোমার নতুন পদের জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। উইশ ইউ বেষ্ট্ অফ্ ব্রিটিশ লাক্।

—আপনি—

—শোন। কম করে পাঁচ বছরের একটা কন্ট্রাক্ট্ তোমার সই করতে হবে। কেমিক্যালে তুমি আর মেকানিক্যালে আমি—মনে রেখ, পাঁচ বছরের মধ্যে পেপার-লাইন, লেয়র-ষ্ট্যাক, এ্যালকালাইন আর মারকারি ব্যাটারী—এর সবচেয়ে কাষ্ট-সেলিং সাইজগুলো বাজারে ছাড়তে হবে। গাড়ী বাড়ি বোনাস। আর মাসে বাইশশো টাকা বেসিক-পে। রাজী।

—চলুন। দেরী হয়ে গেছে। উঠে পড়ল শেখর। কফি-শপ থেকে ফ্যাক্টরী গিয়ে পৌঁছন পর্যন্ত শেখর আর আমি পথে একটা কথাও বললাম না।

শেখর সমন্ধে আমার পরিকল্পনা পদ্মিনীকে আমি খোলসা করে বললাম। এর মাঝে দিন সাতেক সময় কেটেছে। এক উইক-এণ্ডে আমি শেখর পদ্মিনী আর অগাষ্টা এডিনবারা হয়ে কাল্পনিক জলদৈত্যের ডেরা লখসমন্ বেড়িয়ে এসেছি। সে সব হয়েছে আমার খরচে। অর্থাৎ বিদেশে আমরা দিশি মানুষ কজন আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি।

পদ্মিনীদের বাড়ীতে শেখরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। অগাষ্টা বেরিয়ে গেছে তার এক বয়-ফ্রেণ্ডের সাথে। ওল্ড-টম মেঝেয় শুয়ে ঝিমোচ্ছে। শেখর আটটার আগে ফিরবেনা। ওভার টাইম খাটছে। ইতিমধ্যে পদ্মিনীর তদ্বিরে ভেতর থেকে কফি এসে গেছে।

বেশ নিরিবিলিতে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া গেছে পদ্মিনীর সঙ্গে।

পদ্মিনী কথা কম বলে। শাড়ী পড়ে। হাতে চুড়ি, কানে দুল। সধবার কোন লক্ষণ দেহে রাখেনি। ওদের মধ্যে শাঁখা সিঁন্দুরের চল আছে কিনা আমি অবশ্য জানিনা। তবে বিলেতে ভারতীয় কুমারীদের যা আচার ব্যবহার তার সঙ্গে ওর কোথাও মিল নেই। অগাষ্টা ওকে আড়ালে বলে—জোগন্,—অর্থাৎ যোগিনী।

শেখরকে আমি বিলেত ছাড়া করতে তৎপর পদ্মিনী শুনল। খবরটার প্রতিক্রিয়া পদ্মিনীর ওপর লক্ষ্য করছিলাম। না, কিছু বোঝা গেল না।

একেবারে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, বেশ তো, তাতে যদি আপনাদের ভাল হয়, করুন না। আমাকে দরকার নেই আপনার? বলে মাথা নীচু করল পদ্মিনী।

আমার মুখ চোখ আরক্ত হয়ে থাকবে। বললাম, তোমাকে খুব দরকার পদ্মিনী। তবে তুমি এখানে থাকবে। যে কবিতাটুকু গড়ে উঠেছিল আমি তা ছিন্ন করলাম, বললাম, আমি আবার আসব পদ্মিনী। আরও অনেক ড্রইং চাই আমার। তুমি চলে গেলে সে পথ যে বন্ধ হয়ে যাবে।

—কিন্তু আমাকে এখুনি যে ঝুঁকি নিতে হচ্ছে—, আপনি তো জানেন, আমাদের সংসারের কি—

—আমি জানি পদ্মিনী। তুমি আমাকে আর লজ্জা দিওনা। ষ্টারলিঙ্ পাউণ্ডে হয়ত সম্ভব হবে না তোমার ঋণ শোধ করা, কিন্তু কথা দিচ্ছি, ভারতীয় কারেন্সিতে আমি তা শোধ করব ভারতে ফিরে গিয়েই। ওখানে তোমাদের কোন লায়াবিলিটি থাকলে বলো—তুমি তো জান, এমন সব ট্রানজাক্সন এই ভাবেই করতে হয়।

—দেখুন, হঠাৎ পদ্মিনী উঠে দাঁড়াল, কণ্ঠে উষ্ণতা, বলল, শেখর রাজি হয়েছে কিনা জানিনা, কিন্তু আপনি কি আমাকেও কিনে রাখতে—।

—এই দেখ। তুমি মিছিমিছি রাগ করছ। এতদিন এদেশে থেকেও তুমি সভ্য হলে না। এখানে দেখনি, ছেলের পকেট থেকে বুড়ো বাপ সিগারেট বার করে পেনিগুণে পয়সা ফেলে রাখে। না ভাই, মূল্য শোধের ব্যাপারটাকে সেন্টিমেণ্টাল ইস্যু বানিয়ে বোসো না। তবে রিস্ক্—হ্যাঁ, তোমার দায়িত্ব আমি বুঝি। কথা দিচ্ছি, চোর অপবাদ যদি কপালে থাকে সে আমার। তোমার গায়ে আঁচটি লাগবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

—থাকব, আপনি বললেন আর আমি রইলাম। আচ্ছা বলুন তো, শেখর কি এ্যাপ্লাই করেছে? আবার বসে পড়ল পদ্মিনী।

—আমি আমাদের ওখান থেকে ফর্ম আনিয়েছি। দিয়েওছি ওকে। তুমি ওকে একটু খুঁচিয়ে দেখনা।

—আমি! তাতে কি লাভ হবে! আমি কি ওর গারজেন নাকি?

—নও ? পদ্মিনীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি।

—কফি খান। এক চুমুকে সবটা গলায় ঢালার মত হয়েছে। উঠে পড়ল পদ্মিনী; বলল, পাঁপড় খাবেন ? বিলিতি আলু আর গুজরাতি ফরমুলেশন। বাড়ীতে তৈরী। বসুন, ভেজে আনি। মরাল গমনে ভেতরে চলে গেল পদ্মিনী।

ডাণ্ডির যে কোম্পানীতে আমি স্পেসালাইজ করতে গেছিলাম তার হেড অফিস লণ্ডনে। হঠাৎ আমার ডাক পড়ল সেখানে। একজন মিষ্টভাষিণী পি, এ, টু অমুক আমায় এনে দিলেন ছোট একটা চিঠি বা শমন, আর এডিনবারা-লণ্ডন রিটার্ণ এয়ার টিকিট। এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ইণ্ডাসট্রিয়াল এসপিওনাজ্ পিনাল কোডের কোন ধারায় পড়ে এই দুশ্চিন্তা বুকে নিয়ে যাত্রা করলাম।

টেলিফোনে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট হ'ল। সাহেব ডাকলেন বিকেলে টি-এর সময়। আশা প্রকাশ করলেন, আমি ওঁর দপ্তরে আমার এক নেবার অর্থাৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হব।

নেবার নয়, নেবারিঙ্ কান্ট্রি ম্যান—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষ। ঢাকা থেকে এসেছেন জনাব খালিদ মুখতার। ড্রাই ব্যাটারীতে কোলাবোরেশন চান। আমাকে ডাকা হয়েছে ওঁকে এই কথাটা বোঝাতে, ভারত ও পূর্বপাকিস্তানের জলহাওয়া, ইনডাসট্রিয়াল এন্‌ভায়রনমেণ্ট এবং অন্যান্য অনেক 'ইয়ে' যেহেতু একই রকম এবং যেহেতু এঁদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে আমরা লাভবান, অতএব ফিজিবিলিটি ষ্টাডির প্রথম ধাপ খালেদ সাহেব উত্তীর্ণ হয়েই গেছেন—ইসমে কোই সুবা নহি। তাছাড়া, যেহেতু ইতিমধ্যে এ বিদ্যায় আমি নিজেই একজন ধুরন্ধর হয়ে উঠেছি, মুখতার সাহেবের সমস্যাগুলোকে সরলীকৃত করতে আমি নিশ্চয় কাজে লাগব।

মুখতার সাহেবের সঙ্গে বড় সাহেবের অফিসে বসেই আলাপ হ'ল। উনি মাস ছয়েক দেশের বাইরে। নানান ফিকিরে তামাম দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছেন। ওঁদের কস্‌মেটিকস্-এর ফলা ও ব্যবসা। এবার ড্রাইসেলে পদক্ষেপ করতে চান।

মুখতার সাহেবের উদ্দেশ্য খুবই সাধু। কিন্তু আমার পরিকল্পনা যে তাহ'লে মাঠে মারা যায়। এর চেয়ে এস্‌পিওনাজের দায় বরং ভাল ছিল।

শেখরের খোঁজ পেলেই মুখতার সাহেব অবিলম্বে তাকে গলাধঃকরণ করবেন, এই হ'ল আমার দুশ্চিন্তা।

সন্ধ্যাবেলায় মার্বেল-আর্চ তল্লাটে শাহাজাহান নামের এক অভিজাত ভারতীয় রেঁস্তোরায় মুখতার সাহেবের সঙ্গে খানা খেলাম। আর ওঁকে এই সার কথাটি বোঝালাম, আমরা পছ্‌তাচ্ছি। ড্রাই সেল্‌ টেকনোলজিতে এদের রুডিমেণ্টারি নলেজ অর্থাৎ হাতেখড়ি এখনও হয়নি। ভারত বা পূর্বপাকিস্তানের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এদের প্রসেস্‌ স্পেসিফিকেশন্‌ বা প্রক্রিয়া বিধি সম্পূর্ণ অচল। দ্রুতগতি সিঙ্গল-রো আর মন্থরগতি মালটি-রো, এই দুয়ের অপেক্ষিক ভালো মন্দ, পারসেন্‌টেজ রিজেক্ট, শেল্‌ফ-লাইফ্‌; উৎকর্ষের সমতা ইত্যাদি নিয়ে এমন এক কমেডি-অফ-মেনাস্‌ সৃষ্টি করলাম—মনে হ'ল, মুখতার সাহেবকে পাক্‌কা গেঁথে ফেলেছি।

তিনদিন পরের কথা। ডাণ্ডির অফিসে আমার অস্থায়ী টেবিল চেয়ার আলো করে কালো মুখ নিয়ে বসে আছি। একটু আগে মেজসাহেব জনাব খালেদ সমভিব্যাহারে কারখানা পরিদর্শন করে গেলেন। ল্যাবোরেটারিতে শেখরের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেবার সঙ্গেসঙ্গেই বিশুদ্ধ ঢাকাই বাঙালে দুজনে ঝাড়া সাড়ে সাত মিনিট বাক্যালাপ করেছেন। জনাব মউকা বুঝে পদ্‌মিনীর সঙ্গেও একটুও রসালাপ করতে ছাড়েন নি। আমার মুখোমুখি হতেই দুজনে আমরা কাষ্ঠহাসি হেসেছি। খালেদ সাহেব বলে গেলেন, বুঝলেন কিনা, এতদূর যখন এসেই পড়েছি, ভাবলাম না হয় একটু দেখে শুনেই যাই। মানে, আমারও তো একজন আবার ওপরওয়ালা আছেন। একটা বেশ কন্‌ভিনসিং রিপোর্ট তো দিতেই হবে, তাই আর কি। তবে হ্যাঁ, আপনার পয়েণ্টগুলো—মানে যাকে বলে—, খুব মনে থাকবে মশাই। ইত্যাদি।

খালেদ সাহেব বিদায় হবার একটু পরেই শেখর থমথমে মুখ চোখ নিয়ে আমার টেবিলে হাজির। বলল, শুনেছেন কিছু ?

—ঢাকায় কোলাবোরেশনের কথা !

—রাখুন আপনার কোলাবোরেশন, দেশের কিছু খোঁজ রাখেন ? পূর্ব-বাঙলার। আপনি তো সারাদিন লণ্ডনে ছিলেন !

হ্যাঁ, আমি একটা দিন লণ্ডনে ছিলাম। অলড্‌উইচে ইণ্ডিয়ান এমব্যাসির অফিসে চেনা লোক আছেন। ঘণ্টা দুয়েক সেখানেও কাটিয়েছি। পূর্‌বাঙলার

অনেক খবরই পেয়েছিলাম। খারাপ খবর। মানব সভ্যতার দু'হাজার বছরের ইতিহাসে যত খারাপ খবর সৃষ্টি হয়েছে তার অন্যতম খারাপ খবর।

সেই খবর পূববাঙলার নাড়ী-ছেঁড়া ছেলে শেখর ইসমাইলকে আমায় শোনাতে হ'ল। খালিদ সাহেব শেখরকে তার আভাস মাত্র দিয়ে গেছিলেন। তখন সমগ্র পাকিস্তানে ষ্টেট্ অফ্ ইমারজেন্সি ঘোষিত হয়ে গেছে। ঢাকায় কারফিউ। বঙ্গবন্ধু মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের বন্দী। বাঙলার লক্ষীশ্রীর সিন্দুরটুকু মুছে নিচ্ছে ইয়াহিয়া খানের কলুষ স্পর্শ।

পাথরের মত শেখর বসে আছে। আমরা সেই নিরালা কফি শপটায় গিয়ে বসেছিলাম। যতক্ষণ আমি কথা বলেছি, শেখর একটাও প্রশ্ন করেনি। বুঝতে পারছিলাম, ভেতরে ওর বিস্ফোরণ চলেছে, তাই বাইরে অমন স্থানুবৎ।

বললাম, না শেখর, দেশে এখন তুমি ফিরতে পারবে না। আমার মেয়াদ তো এখানে ফুরিয়ে এলো। চল তুমি আমার সঙ্গে। কথা দিচ্ছি, যত শীঘ্র সম্ভব আমি তোমার ঢাকা পৌঁছোবার ব্যবস্থা করে দেব। শেখরের দুটো চোখ থেকে রক্ত আর অশ্রু একসঙ্গে উপচে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। কঠিন আত্মশাসনে ও শুধু বলল, আমি যাব।

—কোথায় যাবে শেখর ?

—আমি দেশে যাব !

আবার শেখরের ঘর। মাঝে দু'তিন দিন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওল্ড-টম মেঝেয় শুয়ে ঝিমুচ্ছে। কোলের ওপব দুটো হাত রেখে পদ্মিনী চুপ করে বসে। শেখরের কোন পাত্তা নেই।

পূর্ববাঙলার কথা পদ্মিনীকে এইমাত্র শুনিয়েছি আমি। শেখরের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পদ্মিনীই আজ অফিসে বলেছিল সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসতে। এসে দেখলাম শেখর ফেরেনি। টেলিফোন করে জানা গেল অফিসেও নেই।

পদ্মিনী বুঝেছিল একটা অমঙ্গল ঘনাচ্ছে। তা নাহ'লে আমায় এভাবে ডাকত না। আমরা দুজনেই জানতাম শেখর লং ডিসটেন্স কলে লণ্ডনে ওর পরিচিত কারুর সঙ্গে বার তিনেক কথা বলেছে।

পদ্‌মিনীর চোখ ছলছল করছে। কোলের ওপর একটা হাত অন্যটাকে পেষণ করছে। বলল, কিন্তু দেশে ও ফিরবে কেমন করে ?

—আমি তো বলিনি, ও দেশে ফিরতে চায়।

—আমি জানি, ও ঠিক চেষ্টা করবে। এর আগের বারের আন্দোলনে ওর নামে যে—, ঢাকা এয়ারপোর্টেই ধরা পড়বে ঠিক।

—না পদ্‌মিনী, ঢাকা নয়। এখান থেকে বাই এয়ার রেঙ্গুন। তারপর জাহাজে কক্স্‌বাজার হারবারের মাইল কুড়ি দূরে কোন জেলে নৌকো। আমার পরামর্শ শুনলে—

—আপনি বলেছেন ?

—বলবার দরকার হবে কি ?

—কিন্তু রেঙ্গুন পর্যন্তই বা ও যাবে কি করে ? ওর কাছে তো কিছুই নেই।

—তার মানে ?

আর কথা নেই পদ্‌মিনীর মুখে। তবে ওর মনের কথা আমি মুহূর্তে বুঝেছি ! লণ্ডন—রেঙ্গুন এয়ার-ফেয়ার দেবার মত সঞ্চয় শেখরের কাছে নেই। কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়। শেখরের যা উপার্জন তাতে ওর থাকা খাওয়ার খরচ বাদ দিলে অনেক বাঁচে। আর ভরণ পোষণ করার মত দেশে তো ওর কেউ নেই। তবে !

এমন অনেক কিছু যা ইংরেজে পারে, আমি পারিনা।

আমার সমাজব্যবস্থা কৌতূহল শাসন করার সদগুণ আমার মনে গড়ে তোলেনি। আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিলাম।

পদমিনীকে নিষ্ঠুরের মত খুঁচিয়ে এই তবের উত্তর আদায় করলাম।

সঞ্চয় ছিল শেখরের। পদমিনী অধমর্ণ হয়ে রাতারাতি দুর্বৃত্ত স্বামীকে বিলেত ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শেখরের ঐ সঞ্চয়টুকু দিয়ে। পদ্‌মিনীর কপালে সে কলঙ্ক লেপনের কাহিনী কম লোকে জানে। তারপর সে জল আরও অনেক গড়িয়েছে। বিদেশে থেকেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে পদ্‌মিনী। শেখরের কিছু সঞ্চয় থাকার প্রশ্ন ওঠেনি তাই। সেই সুযোগে আমাদেরও চুক্তি হয়ে গেল, ভারতে ফিরে গিয়ে পদ্‌মিনীর কাছে আমার যে ঋণ, তা আমি শোধ করব কি ভাবে।

আমাকে বসতে বলে ভেতরে গেছিল পদ্‌মিনী। অনেকক্ষণ পর কফি হাতে

ঘরে ঢুকল। চোখে মুখে জল দিয়ে এসেছে। সহজ সুরে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো। মুন্নিও এখনও ফিরল না। ও ও না।

—মুন্নি!

—অগাষ্টার দিশি নাম। জানেন না বুঝি। ও কি পড়ছেন?

একলা বসেছিলাম বলে অবৈধ কৌতূহলে শেখরের পুরন কাগজপত্তর ঘাঁটছিলাম। ল্যাব-এর কিছু ফরমুলেশন পাওয়া গেছিল। আর একটা আধুনিক কবিতা। একটা সাইক্লোস্টাইল করা ফর্মের ওপর হিজিবিজি করে লেখা। সেটাই পড়ছিলাম। বললাম, শেখরের দেখছি অনেক গুণ। কবিতা লেখে জানতাম না তো।

—বাঙলায়, না! পড়ে বোঝান—না, থাক। আমি কি বুঝব। মুহূর্তে কবিতাটার বিষয় নির্লিপ্ত হ'ল পদ্মিনী।

ওকে সেই দুঃসাহসিক আধুনিক কবিতার হিন্দী বা ইংরিজী তর্জমা বোঝাই তেমন জ্ঞান বা মনোবল আমার নেই। কবিতাটা তাই এই গল্পের গোড়ায় লিখে রেখেছি।

পদ্মিনী শেখরের মনের কোন ফিলিঙস্ এই কবিতায় মূর্ত ভেবেছিল, সেটা বিচার্য্য। লেখক হিসেবে আমারও কিছু দায় আছে। কাহিনীর সঙ্গে কবিতাটা কিভাবে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা করব, এমন অঙ্গীকার আছে। এখন মনে হচ্ছে অকপটে লিখতে পারি, বুঝিনি, বুঝিনি।

শেখরের ঘরের জানালা দিয়ে রাজপথ দেখা যায়। এমনি সময় বাড়ীর সামনে এসে থামলো একটা ক্ষুদে পোর্টার ক্যাব। কলকাতার ক্যানিংষ্ট্রিট অঞ্চলে তিনচাকার টেম্পো মালগাড়ী যেমন দেখা যায়, সেই জাতের, তবে চাকা আছে চারখানা, আর পরিপাট্যে একটু কুলীন শ্রেণীর। ক্যাবটার পেছনে মাল রাখার খোলা অংশে দাঁড়িয়ে অগাষ্টা। লাফিয়ে রাস্তায় নাবল। ড্রাইভারের সীট্ থেকে নাবল শেখর। আসল ড্রাইভার পাশেই বসেছিল। সে গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অগাষ্টা, যার দিশি নাম মুন্নি, হয়ত সোজা অন্দরে গেছে। শেখর ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, বলল, আরে ভট্চাজদা কতক্ষণ? একটু ড্রাইভিং শিখছিলাম। দেরী হয়ে গেল।

—মুন্নিকে পেলে কোথায়? পদ্মিনীর প্রশ্ন।

—সিটি সেণ্টারে। এ্যানগস্ হোটেলের বেসমেণ্টে বোধ হয় কোন পাব আছে। মুন্নি ওর একজন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে স্ফূর্তি সেরে বেরোচ্ছিল। চৌহান বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে তোমার বোন।

—সৎপাত্রে পড়লে শুধরে যাবে ঠিকই। আমি তো এখুনি ভট্‌চাযদাকে বলছিলাম—ওকে আমি ঠিক তোমার গলায় ঝুলিয়ে—

—পদ্‌মা।

চাপা গলায় শেখরের এই পদ্‌মা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা নেবে এল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম—শেখরের চোখ মুখ মুহূর্তের জন্য রক্তশূন্য হয়ে গেছিল। ম্যাকিনটোস্‌টা না খুলে আমার পাশে বসে পড়ল শেখর। খুব সংযত ভাবে বলল, আমি বাঙাল আর মুসলমান, জেনে রেখো—গোঁয়াতু'মি আর গোঁড়ামী আমার স্বভাবে দুটোই একসট্রিম।

মুহূর্তে ঘরের বাতাস ভারি হ'ল। শেখরের মনের বর্তমান অবস্থা আমার বা পদ্মিনীর অজানা নয়। পদ্‌মিনী যে হঠাৎ এমন ছেলেমানুষী করবে ভাবতে পারিনি।

—ফার্মটা ভরেছ শেখর? আমি জানতে চাইলাম হঠাৎ। প্রসঙ্গের মোড় ঘোরাতে হবে।

—না ভট্‌চায দা, ওটা আপাতত মুলতুবি থাক।

—আপনারা বসুন, পদ্‌মিনী উঠে পড়ল, বলল, চা নিয়ে আসি। আপনার আর একবার চলবে তো? সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে ভেতরে চলে গেল পদ্‌মিনী।

—ঢাকা যাচ্ছনা তুমি তাহালে?

—ভট্টচাযদা। তবে খালি হাতে নয়।

—হঠাৎ ড্রাইভিং শেখার খেয়াল হ'ল যে? লারনারস্ লাইসেন্স নিয়েছি? এখানে শুনেছি খুব কড়াকড়ি। আচ্ছা, তুমি খালিহাতে নয় বললে, তার মানে!

শেখর হাসল। আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, ওই পোর্টার ক্যাব'টা কি কাজে আসে জানেন আপনি!

জানতাম। ফ্যাক্টরীতে ব্যাটারী তৈরী হয়ে যাওরার পর কাঁচামালের অব্যবহার্য উদবৃত্ত অংশ কোন কণ্টাকটারের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ করে ওই গাড়ীটা।

শেখরের মুখে তখনও হাসি। বলল, গারবেজ ডিসপোজালের। জঞ্জাল ফেলার। দেশে ফিরে আর কিছু না জুটুক, ধাঙড়ের কাজ তো করতে পারব। অনেক জঞ্জাল সরাবার ডাক শুনেছি ভট্‌চাযদা।

শেখরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমার দৃষ্টি ওর মুখ থেকে সরেনি। ক্রমে যে ভাব ওর মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম, মনে হ'ল, তার ভাষায় বর্ণনা হয় না। আমি দুর্বলচিত্ত মানুষ নই, তবু পূর্ব বাঙলা থেকে আট হাজার মাইল দূরে বসে সেই মুহূর্তে শিহরিত হলাম।

মুন্নি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। পদ্‌মিনী আসেনি। আমি জানতে চাইলাম, দিদি কোথায়?

ফিক করে হাসল মুন্নি, বলল, মার কাছে। সি ইজ্‌ সিক্‌। ভেতরে চলে গেল।

পদ্‌মিনী এল একটু পরে। মুখে দুশ্চিন্তা। বলল, শেখর, একটা ক্যাব ডাকবে। মার শরীর খারাপ হচ্ছে বোধ হয়।

ব্রটি-ফেরি অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে একটা নিম্ন শ্রেণীর নার্সিং-হোম। মিসেস্‌ চৌহানকে নিয়ে আসা হয়েছে। পদ্‌মিনী আর শেখর তো আছেই। আমিও সঙ্গে এসেছি। জানিনা কি কারণে ক্রমে বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়ছি এদের সঙ্গে।

পদ্‌মিনী ভেতরে তার মার কাছে। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি আর শেখর। সামনে সমুদ্র। পেঁজা তুলোর মতন বরফ পড়ছে। দূরে কুইন্‌স ফেরির দুটো আলোক স্তম্ভের আলো দেখা যাচ্ছে।

শেখর বলল, জানেন ভট্‌চায-দা, অনেক বার এমন হয়েছে, সদ্য পরিচিত এমন অনেকে জানতে চেয়েছে, আমার ছেলেপুলের সংখ্যা কি। আপনিও তো বিয়ে করেন নি, আপনাকে এমন কেউ জিজ্ঞাসা করেনি?

—করেছে।

—আমাদের কি ইমেজ্‌ সৃষ্টি হয়েছে দেখুন। এরা যেন কল্পনাই করতে পারে না, পঁচিশের ওপর কোন ভারতীয় বা পাকিস্তানীর পাঁচটার কম সন্তান। বিয়েটা পর্যন্ত হয়েছে কিনা খোঁজ করেনা। আপনার সেই 'এ এ পাকিস্তানী' গল্পটা মনে পড়ে বারবার। বলতে পারেন, কেন এমন—।

শেখর চুপ করল হঠাৎ। আমিও নীরব। ব্রটি-ফেরির মরা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা একজন ভারতীয় আর একজন পাকিস্তানী আবার মর্যাদাশূন্য

আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি হলাম। অথচ বস্তুতঃ আমরা দুজনেই তখন আর একটি ভারতীয়ের জন্মক্ষণের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

হঠাৎ শেখর চাপা বিকৃত স্বরে বলল, মানুষ নয়, প্রায় সাতশো মিলিয়ন এ্যাবোরিজিন্‌স—এই তো আমাদের সত্য পরিচয়।

—এ্যাবোরিজিন্‌স? না শেখর, আমি প্রতিবাদ করছি—কথাটা তুমি ফিরিয়ে নাও। ডিসিপ্লিনের অভাব যদি তোমার অভিযোগের কারণ হয়, আমি বলব, আমি দেখেছি, সাঁওতাল, ওঁরাও, ভুঁইয়া,—আমাদের দেশের আদিবাসীরা নিয়মানুবর্তিতার সভ্য ভারতীয়দের অনেক ওপরে। হয়ত পাকিস্তানেও তাই। আর ভুলোনা, এই ট্রাইবস্‌গুলো বর্দ্ধিষ্ণু নয়, ক্ষয়িষ্ণু।

—জানোয়ার শব্দটা আমাকে দিয়ে আপনি ব্যবহার না করিয়ে—

—আমি ভাবছিলাম কনসাস্‌নেসের প্রশ্ন তুলব। প্রতিশত কজনে আমরা এই হীনমন্যতায় ভুগি? এই নিকৃষ্টতা বোধ!

—একটা স্টাটিস্‌টিকল সারভে করে দেখা যেতে পারে। জেনে রাখুন, বড় ধিক্কার জনক ফিগারস্‌ পাওয়া যাবে। আপনি যে সেই 'এ এ পাকিস্তানী'র গল্প বলেছেন, সেদিন থেকে মনে একটা কথা চেপে রেখেছি। আজ বলছি শুনুন।

পদ্‌মিনী বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। বলল, ডাক্তার বলছেন ফল্‌স্‌ পেন—তবে এ্যাডমিট করতেই হবে। মনে হচ্ছে মা এবার কষ্ট পাবে।

মিসেস্‌ চৌহান অষ্টমগর্ভা—কষ্ট পাবেন, তাতে সন্দেহ কি?

আমরা জবাব দিইনি। শেখর ফিরেও তাকায়নি পদ্‌মিনীর দিকে। ওর জ্বালাধরা দুটো চোখ দূরে ফার্থ অফ টে'র মরা সমুদ্রের বুকে। পদ্‌মিনী একটু অপ্রতিভ বোধ করে থাকবে। আমাদের কাছে না দাঁড়িয়ে আবার ভেতরে চলে গেল।

—কি বলবে বলছিলে শেখর?

—হ্যাঁ। ফ্রাঙ্কফুর্ট ট্রানজিট লাউঞ্জের একটা দৃশ্য। বেরুট থেকে আমি বি, ও, এ, সি-র ফ্লাইট নিয়েছিলাম। আমি জানিনা আপনি ফ্রাঙ্কফুর্ট টাচ্‌ করেছেন কিনা। ওখানে একটা গোল কাঁচের ট্রানজিট লাউঞ্জ আছে। চার ধার দেখা যায়। সেদিন আমার সহযাত্রী সবাই ইউরোপিয়ানস্‌। বুকে বি, ও, এ, সি-র ট্রানজিট-কার্ড গুঁজে লাউঞ্জে সময় কাটাচ্ছি। এমন সময় একটা পি, আই, এ-র বোয়িং এসে ল্যাণ্ড করল। করাচী থেকে আসছে। এ্যানাউন্সমেন্টে জানলাম—

সেটাও লণ্ডন রাউণ্ড। একটু পরেই প্রায় তিরিশজন ওয়েষ্ট পাকিস্তানী লাউঞ্জে এসে ঢুকল। চার পাঁচ জন পুরুষ। মেয়ে লোক গোটা দশেক। আর বাকি সব নানান বয়সের কাচ্চাবাচ্চা। সঙ্গে একমপেনিড্ লাগেজ বলতে বোঁচকা-বুঁচকির গন্ধমাদন। মুহূর্তে যেন মেছোবাজার বসে গেল। গোটা চার পাঁচ টিফিন-কেরিয়ার খোলা হ'ল। ভাগাভাগি হ'ল। অর্ধেক সোফায়, বাকি অর্ধেক মেঝেয় বসে গেল দপ্তরখানা বিছিয়ে। পাঁচছটা বাচ্চা খাওয়া ফেলে উদ্দাম ছুটোছুটি আর ঝগড়া আরম্ভ করল লাউঞ্জের মধ্যেই। বাকি সবাই কল্‌কল্ করে কথা বলছে। ওরা পাঠান না মালাকান্দি, পুস্তু বলছে না অন্য কিছু, আমি বলতে পারব না। মনে ধরে রাখার মত একটা কথা এই দেখেছিলাম, ওরা সবাই অবিভাজ্য বৃহত্তর ভারত-বর্ষের সাধারণ নাগরিক—আর্যসন্তান। ক্লাইম্যাকস হ'ল যখন বোর্খাধারী এক মা তার বছর তিনেক বয়সের কন্যাসন্তানটিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পা'য়ে বসিয়ে পায়খানা করাতে আরম্ভ করল।

ফ্রাঙ্কফুটের মত একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টে এই দৃশ্য আর ওই জনা কুড়ি ইউরোপিয়ানের চোখে মুখে কষ্টকৃত নির্লিপ্ততা,—কল্পনা করার চেষ্টা করুন। বি, ও, এ, সি-র ফ্লাইট্ সেদিন কোন যান্ত্রিক গোলোযোগের জন্য লেট হয়েছিল। পাকিস্তানীরা আমাদের আগেই চলে যায়। আর লাউঞ্জটাকে যে অবস্থায় ছেড়ে যায় তা আমার সহযাত্রীদের বিবেচনায় কোন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের যাত্রীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। ভট্‌চাযদা, আশ্চর্য এই—কোন অসম্মানজনক মন্তব্য ওরা কেউ করেনি। তবে হঠাৎ বি, ও, এ, সি-র ফ্লাইট ডিলে হওয়া নিয়ে জনা আটেক ব্রিটিশের মুখে যে শক্ত শক্ত সমালোচনা শুনলাম তার পেছনে ওদের জাতীয়তা-বোধ কতটা প্রবল ছিল সন্দেহ হয়। আমার মনে হয়েছিল, সেটা ওই পাকিস্তানীদের বিরক্তিকর এয়ার সৃষ্টি করার প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি সেদিন এক কাণ্ড করেছিলাম। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া সমস্ত জঞ্জাল, এমন কি খবরের কাগজে মোড়া বাচ্চাটার পায়খানা, সব জড়ো করে বাইরের লিটরে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম।

—মারভেলাস। সাহেবদের ব্যাক-প্যাটিং পাওনি? আচ্ছা বলতো, প্রয়োজনের কতভাগ জঞ্জাল সেদিন ডিস্‌পোজ করেছিলে তুমি?

শেখর জবাব দিল না। আমিই এবার বললাম, শোন শেখর তোমায় আর একটা গল্প শোনাই।

—দাঁড়ান। আসুন আগে কামনা করি মিসেস্ চৌহানের ফলস্-পেন যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর একটা শিশু চৌহান ভূমিষ্ঠ হবার আগে এমনি গোটাকতক গল্প জন্ম নিক। এবার বলুন।

—আমাদের দিল্লীর গল্প। মে জুন মাস—দিল্লী ষ্টেশনের পাশে কিছু খাবারের দোকান। মুসাফির আর ফালতু লোকেদের বেজায় ভীড়। একদিনের ঘটনা বলছি—তখন দুপুর, 'লু' চলছে, আর ভীষণ রোদ, গরম। ফলের দোকানে জনা ছয়েক তরমুজ খাচ্ছে, আর যথেচ্ছাচারে খোসাগুলো এদিক ওদিক ছড়াচ্ছে। তিনচারটে গরীবের বাচ্চা খোসাগুলো কুড়িয়ে শাঁসের অবশিষ্ট যেটুকু পাচ্ছে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জি, বি, মার্কা একটা টুরিষ্ট-ভ্যান। তার মধ্যে বাউণ্ডুলে গোছের একজন সাহেব—বাচ্চাগুলোর উচ্ছিষ্ট খাওয়া দেখছিল। দৃশ্যটা আমাদের দেশে চোখে পড়ার মতও নয়। তবু সেদিন আমি বড় যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধির শিকার হ'য়েছিলাম। বাচ্চাগুলো এর ওর তার পায়ের তলা থেকে তরমুজের খোসা তুলে নেবার সময় চোখে মুখে যে আতঙ্ক আর ভীতি নিয়ে ফলাহারিদের লক্ষ্য করছিল—ওদের সেই দীনতা আর অপরাধ বোধ, এবং তাই লক্ষ্য করতে করতে গাড়ীতে বসা সেই ইউরোপিয়ানের দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল নেবে আসা—তুমি বুঝতে পারছ শেখর, ক্যামেরায় না ধরে রেখে, চোখের জলে এমন দৃশ্য ঝাপসা করে তোলা।—এর আমি আজও কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। এখনও ভাবতে গেলে মন ভারী হয়ে যায়—উচ্ছিষ্টলোভী বাচ্চাগুলোর চোখে মুখে ওই আতঙ্ক, কেন--পরস্বাপহরণের অপরাধবোধ, আর তাই দেখে কাঁদছে সংসারত্যাগী নিরাসক্ত ইংরেজ—যার প্রপিতামহ গত শতকেই জাহাজ বোঝাই জুয়েলারী নিয়ে গেছে তার রক্তচোষা ভ্যামপায়ারের শাসনতন্ত্রের অধিকারে! তবু শেখর, মানুষের এ লাঞ্ছনা ওদেরই বেশী ভাবায়, ওরাই ফরমূলা বাঁধে—ভারতে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একুশশতাব্দীর প্রাক্কালে এসেও সভ্যতার অনতিক্রান্ত সমস্যাগুলো উচ্ছেদের—আমরা যেগুলোকে জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বিবেচনা করে বসে থেকেছি, বসে আছি।

ফার্থ অফ টে'র মরা সমুদ্রের বুকে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই হিম খাচ্ছি। নার্সিং হোমের সামনের জমি বরফে ঢাকা পড়ছে।

এমনি সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একটা নার্স নেবে এল। শেখর হঠাৎ ছুটল ট্যাক্সিটা ধরতে। বলে গেল, তার জরুরী কাজ আছে। কাল ফ্যাক্টরীতে আবার দেখা হবে। কাল শনিবার—উইক-এণ্ড শুরু, শেখরের খেয়াল নেই।

শেখর পালাল। ব্রটি-ফেরির একটা নিম্নশ্রেণীর নার্সিং হোমের বারান্দায় মরা সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি আর পদ্মিনী। ও কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। শেখরের চলে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেনি। বরফ পড়া আরও বাড়ছে।

শেখরকে যে প্রশ্ন করলাম আমি নিজেই তখন তার উত্তর খুঁজছি। পদ্মিনী অনেক কুণ্ঠায় বলল, ভট্চাযদা, মার একটা ব্যবস্থা করুন। দেখলেন তো—শেখর চলে গেল।

মিসেস্ চৌহানের জন্য ঘর ভাড়া করে পদ্মিনীকে বাড়ীতে ছেড়ে আমি যখন আমার আস্তানায় এসে পৌঁছালাম তখন রাত বারোটা। সাপার তো গেছেই, রাত দশটার হাই—টি-এরও পাট চুকেছে। অর্থাৎ আজ রাতে হরিমটর। এই দুপুর রাতে পদ্মিনীর রান্নাঘরে পাত পাড়তে সঙ্কোচে বেধেছিল। ওর নিজের কপালেও কিছু জুটবে কিনা সন্দেহ। হাইঞ্জের টিন খুলে সুপ্ খাওয়াবে, তার এই প্রস্তাব আমি অগ্রাহ্য করে এসেছি।

জরুরী রিপোর্ট তৈরী করার ছিল আমার। ঘুমলে চলবে না। পদ্মিনী সেদিন অনেকগুলো ড্রইং-এর ফটো-কপি বার করে দিয়েছিল। ওসব সঙ্গে রাখার জিনিষ নয়। রিপোর্টের সঙ্গে রেজিষ্ট্রী করে কালই দেশে পাঠাতে হবে। হিটার জ্বালিয়ে কাজে বসে গেলাম।

ভোর তখন চারটে। রিপোর্টের খসড়া তৈরী। কার্বণ লাগিয়ে দুখানা ফেয়ার-কপি তৈরী করতে হবে। এবার আলস্য লাগছে। বাইরে বরফ পড়া থেমে গেছে। ফট্‌ফট্ করছে ভোরের আলো। সূর্যদেব অনেকটা ওপরে উঠে এসে থাকবেন। ঘুম আর আসবে না। তবে চা বা কফি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। উপায় নেই। পার্ক-হোটেল হলে টেলিফোন করে আনিয়ে নিতে পারতাম এখুনি।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছি। একবার পূর্ববাঙলার কথা মনে

পড়ল। কত শিশু কত কুমারী কন্যা এমনি কত বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে ওখানে। কত মিলিটারী ক্যাম্পে, কত ট্রেন্‌চে, কত ধর্ষিতার রক্তক্ষরণ চলছে। শেখর কাল রাতে বাড়ী ফেরেনি। শেখর হয়ত দেশেও ফিরতে পারবে না যুগান্তরের এই সন্ধিক্ষণে।

ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফার্থ-অফ-টে-র ধার ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসব। পদ্‌মিনী বলেছিল ও খুব ভোরে উঠে যোগাসন করে। ফেরার সময় ওদের বাড়ী গিয়ে কফি খাওয়া যাবে।

আমার কপালে কফি ছিল না। ফার্থ-অফ-টে-র ধারে আমাকে পুলিশ ধরল। সারা সহর তখন জানালায় ভারি পর্দা টেনে ঘুমে মগ্ন। পুলিশকে এখানে বলে, ববী। দুটি নেহাৎ আদবে ফরাসী ববী আমায় সবিনয়ে এই জ্ঞানটুকু দিল—সূর্য উঠলেই এখানে রাত শেষ হয় না। ঘরে ফিরে গিয়ে আর একপ্রস্থ ঘুমিয়ে নিতে উপদেশ দিল। ওরা রাতের পাহারাদার। রোঁদে বেরিয়েছে। আমি বেরিয়েছিলাম রোঁদ দেখে।

গেষ্ট-হাউসে ফিরে রান্না ঘরের দিকে একটু উঁকিঝুঁকি মারলাম, তখন ভোর পাঁচটা। কারুর পাত্তা নেই। বুঝলাম, সেই সাতটার আগে কপালে কফি নেই।

ঘরে ঢুকে আমি অবাক। বিছানার ওপর পদ্‌মিনী বসে আছে চুপ করে। হাতদুটো কোলের ওপর, দুচোখ বাইরের সমুদ্রের দিকে।

—তুমি!

—এখানে বসে জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম আপনাকে। হেঁটে ফিরছিলেন সমুদ্রের দিক থেকে। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, না?

—তুমি এ সময় কোন্ সাহসে পথে বেরিয়েছ? আমায় তো পুলিশে ধরেছিল।

ম্লান হাসল পদ্‌মিনী। বলল, হ্যাঁ, শনিবার কিনা, ওরা একটু বেশী কড়াকড়ি করে। নেশায় বেহুঁস হয়ে অনেকে মারা যায়, বরফের ওপর পড়ে থাকে।

—হ্যাঁ, তা টিন্‌-এজারদের স্ফূর্তির যা বহর দেখি উইক-এণ্ড বলে—বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া, আমি আবার উট্‌কো লোক। ওদিকের খবর কি?

—টেলিফোন করেছিলাম। মা তো ঘুমচ্ছে। এবার আবার যেতে হবে আমায়। আপনার কাছে এলাম।

—বল।

আর কথা বলে না পদ্‌মিনী। আমার অগোছাল বিছানার ওপর বসে, মাথা নিচু করে রয়েছে। চেয়ার টেনে আমি ওর সামনেই বসেছি। পাশে টেবিলের ওপর কাগজপত্তর ছড়ান। পায়ের কাছে হিটারটা জ্বলছে। আমি আমার হাত দুটো তার ওপর মেলে ধরলাম।

হঠাৎ পদ্‌মিনী মুখ তুলে সোজাসুজি আমার দিকে চাইল। বলল, আমার টাকা চাই ভট্‌চাযদা। অনেকগুলো টাকা। পারবেন দিতে ?

—শেখরের জন্য চাইছ ?

—না, হঠাৎ বড় তীব্র শোনাল পদ্‌মিনীর স্বর, বলল, ও নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে। আমি চাই অন্য কারণে। আবার গলা নাবিয়ে বলল, মার পেছনে এবার হয়ত অনেক খরচ হবে ভট্‌চাযদা। তাছাড়া—, আরও দরকার আছে। আমি আমার কাজের মজুরী চাইছিনা—শোধ তো করতে পারব না, ধরুন—, ধরুন ভিক্ষে চাইছি।

—কি বলছ পদ্‌মিনী। আমি তোমার কাছে অনেক ঋণী।

আমি যে অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি তাতে অনেক ঝুঁকি— কাজেই অনেক খরচ। বৈধভাবে সে টাকা ভারত সরকার সঙ্গে আনতে দেয়নি। তা এসেছে বাঁকা পথে। লণ্ডনে গিয়ে আমি হাতে চারশো পাউণ্ড পেয়েছিলাম। আমার নিজের খরচ বাবদ এখনও আমার কাছে তিনশো পাউণ্ডের ট্রাভেলার্স চেক। ভেবেছিলাম শেখর যদি নেয়, লণ্ডন-রেঙ্গুন প্লেন ভাড়া আমিই ওকে দেব। কিন্তু কাজ আমার জন্যে ও কিছুই করেনি। পদ্‌মিনী যা করেছে তা আশাতীত। আরও করবে।

বললাম, টাকা আমি পেয়েছি পদ্‌মিনী। কত হলে তোমার কাজ চলে যাবে, বল।

—আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। আপনি যা পারেন দিন।

আমি দশ পাউণ্ডের কুড়িটা নোট বার করলাম। দুশো পাউণ্ড, প্রায় চার হাজার টাকার মত হয়। পদ্‌মিনীর কাছ থেকে যত ড্রইং আদায় করতে পারব তার তুলনায় আমার জেনারেল ম্যানেজার এই অঙ্কটাকে সামান্য বিবেচনা করবেন, এমন ভরসা ছিল।

নোটগুলো পদ্‌মিনী নিল। বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। নোটগুলো শক্ত হাতে

কোলের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে বসে আছে। আমার ঋণ শোধ হ'ল কিনা সে প্রশ্ন নয়, ওর প্রয়োজন মিটবে কিনা তাই ভাবছিলাম। পদ্‌মিনী মুখে কোন কথা বলল না, হঠাৎ দেখলাম, হার্‌ম্যাজেষ্টির ছবির ওপর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরছে।

হঠাৎ মুখ তুলে চাইল, সব সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে। দৃঢ়প্রত্যয়ে কিছু বলতে চায়। অথচ দুচোখে জল উপচে উঠছে।

এরপর ওর স্বরের তিক্ততায় ভয় পেলাম আমি। পদ্‌মিনীর যেন অন্য এক রূপ, বলতে আরম্ভ করল, এদেশের নিয়ম কানুন আপনি কিছুই জানেন না, না! একটা জোয়ান মেয়ে এমন সময় হোটেলের ঘরে আসে, আর এতগুলো টাকা নিয়ে এমনি ফিরে যায়—এমন এখানে হয়না ভট্‌চাযদা। এখানে উচিৎ মূল্য যে দেয়, তার কাছে সবই পণ্য।

—তুমি থামবে! কি যা তা বলছ?

—আপনার কাছে এত ঋণ তো আমার নেই। ভেবেছিলাম বড়জোর পঞ্চাশ পাউণ্ড আদায় করতে পারব। আপনি এত কেন দিলেন? বলুন, অন্যদের কাছে আর কাজ আদায় করার নেই? আপনার কোম্পানী এই এতগুলো টাকা আমায়—

দুচোখে তীব্র জ্বালা নিয়ে উঠে দাঁড়াল পদ্‌মিনী। পায়ে পায়ে পেছন হেঁটে চলে গেল দরজা পর্যন্ত। ওর চোখের তীব্র দৃষ্টি আমাকেই দগ্ধ করছে। আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি।

—বলুন, কিছু চাননা আপনি? এই দেড়শো পাউণ্ড আপনার দয়ার দান। এর বিনিময়ে দাবী করার কিছুই পেলেন না আমার মধ্যে। আপনি জানেন না এখানে একটা মেয়ের দেহের কি দাম! বলুন—বলুন।

ভেজান দরজার ওপর পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছে পদ্‌মিনী। হাতে কুড়িটা দশ পাউণ্ডের নোট। দু'চোখ ভরা অশ্রুর ভেতর থেকে তীব্র বহ্নির জ্বালা ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার দয়ার দান দেড়শো পাউণ্ডের বিনিময়ে ও নিজেকে পণ্য করেছে।

না, এ আত্মসমর্পণ নয়। সাধ্য কি আমার ওকে স্পর্শ করি, কলুষিত করি। দেখলাম, একটা রিক্ত মন, একটা প্রবঞ্চিত দেহ তার অগ্নিগর্ভ রূপ মেলে ধরেছে। আমি তার দারুণ দহনজ্বালার উত্তাপটুকু দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলাম।

এই ভাবে কিছুটা সময় কাটল। তারপর আমি একেবারে সহজ স্বরে বললাম, চল পদ্মিনী, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। কফি খাওয়াবে—প্রমিস্।

ফুটপাথের বরফ ভাঙতে ভাঙতে আমরা ফিরছি। পথে এখনও জন মানবের চিহ্ন নেই। শনিবারের ভোর, সবাই ঘুমুচ্ছে।

আমি বললাম, এখানে তো স্থায়ী বাসিন্দাদের ন্যাশনল হেল্থ না কি যেন একটা ব্যবস্থা আছে! তোমার মার পেছনে তো খরচ বেশী হবার কথা নয়! তুমি অত ভাবছ কেন?

—আপনাকে বলব ভেবেই এসেছিলাম। কথা দিন, শেখর যেন কিছু জানতে না পারে। জানেন, মুন্নি সত্যিই বয়ে গেছে।

—অগাষ্টা! কি করেছে?

—কি করে বলি আপনাকে! ওর আজ দিন কুড়ি ওভার ডিউ। তার মানে বোঝেন! ও লুকিয়ে রাখছিল। বাড়ীর সব দায় তো আমার। আমিই জোর করে টেষ্টিং করিয়েছি। মুন্নি নিজেও জানে না—কন্‌সিভ্ করে বসে আছে। ভট্‌চাযদা, এখানকার সমাজ শুধু ভোগকে চিনেছে—কেউ কোন বঞ্চনা স্বীকার করবে না, শুধু আমি—। আমায় ক্ষমা করুন ভট্‌চাযদা—আজ আপনাকে খুব অপমান করেছি।

—মুন্নি তোমায় জোগন্ বলে—জান। না পদ্মিনী, আমার কনফেসন নাও, তোমায় কামনা করিনি এমন নয়। কিন্তু চারদিকে এই ভোগের মাঝে তোমার ওই জোগন্ রূপটা আমার মনে ধরা থাক। মুন্নিকে নিয়ে এবার কি করবে?

—ওকে নিয়ে যাব লণ্ডনের লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে। ওখানে এ্যাবোরশনের চার্জ দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না ভট্‌চাযদা। আপনি টাকা দিয়ে আমায় বাঁচালেন।

শনি রবি দুটো দিন শেখরের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সোমবার অফিসে এল না। আমি আর পদ্মিনী সেদিন একসঙ্গে ফ্যাক্টরী থেকে বেরোলাম।

পার্ক হোটেলের সামনে থেকে সিটি-সেন্টারের বাস ধরব। তারপর বাকি পথটুকু হাঁটা যাবে।

পদ্মিনী লক্ষ্য করেনি, আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম, ফ্যাক্টরীর সেই জঞ্জাল ফেলার ক্ষুদে পোর্টার-ক্যাবটা ষ্টোরস-এর দিক থেকে মাল নিয়ে বেরোচ্ছে। একটু

দূরে গিয়েই গাড়িটা থামল। প্রায় তক্ষুণি ভূঁইফোঁড়ের মত শেখরকে দেখলাম গাড়ীটার কাছে এসে হাজির হতে। গাড়ীর ভেতর ড্রাইভার ছাড়াও আর একজন ছিল। শেখরও উঠে বসল। গাড়ীটা চলে গেল আমাদের উল্টোদিকে, উত্তর পশ্চিম মুখো—কুপার এ্যানগস, ব্লেয়র-গোরির দিকে। শুনেছি ওই পথে কিছুদূর গিয়ে মুয়ের হেড গ্রামের কাছেই স্ক্রাপ্-রিক্লেম করার কারবার। ফ্যাক্টরী থেকে যে জঞ্জাল বেরোয় তার থেকে কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। একজন কনট্রাকট্‌র এখানকার নাগরিক স্বাস্থ্য রক্ষার আইন অনুসারে ডাণ্ডি সহরের বাইরে তার কারবার খুলেছে। গাড়ীর মধ্যে ড্রাইভার আর শেখর ছাড়া যে তৃতীয় অজানা মুখ সে বোধ হয় ওই কনট্রাকটরের। শেখরের মতলব কি বোঝা যাচ্ছে না।

বাস চলেছে সিটি সেন্টারের দিকে। আমি আর পদ্মিনী পাশাপাশি বসে।

জানতে চাইলাম শেখরের কি খবর? আজ কাজে এল না? ওদের মারকারী ব্যাটারীর এত জরুরী কাজ চলছে।

—কি জানি। আমার সঙ্গে তো কথাই বন্ধ। রাত্রে কখন ফেরে জানেন? খাবার আগলে আমিই বসে থাকি। কি যে ও করছে ওই জানে।

—তোমার মার কি খবর? তুমি তো বাড়ী হয়ে ওখানে যাবে, তাই না?

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আজ নর্মাল কিছু না হলে, ওরা অন্য উপায় দেখবে। ফ্যাক্টরী থেকে টেলিফোন করেছিলাম। মুন্নি ছিল, বলল, আজ সকাল থেকে মা খুব কষ্ট পাচ্ছে।

—তুমি ছুটি নাও না কটা দিন।

—ছুটি আর পাওনা নেই ভট্‌চাযদা। নিলে মাইনে কাটা যাবে। গতবছর এত ছুটি নিয়েছি আমার এবছর ছুটি জমেই নি। তাছাড়া আমি তো এখনও কনফার্মড্ নই।

—গতবছর বেশী ছুটি নিয়েছ কেন?

—বলেছি তো আপনাকে, আমার পতিদেবতাটির সেবায়। ভস্মে ঘি ঢালতে।

—আচ্ছা তোমাদের কি সত্যিই আর কোন—, অথচ তবু তুমি—

—ও কথা থাক ভট্‌চাযদা। ভাল লাগে না। আমাদের কথা এইখানেই থামল। বাস সিটি-সেন্টারে পৌঁচেছে। আমরা বাড়ীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

পদ্মিনী জানতে চাইল, আপনি দেশে ফিরছেন কবে ?

—বিলেত ছাড়ছি পরের মাসে। জার্মানীতে দু'সপ্তাহের কাজ আছে। তারপর একটু কন্টিনেন্টে ঘোরা। দেশ এখন দূরে।

—শেখরের জন্যে আপনি ভাবেন না, না ? ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ওকে সামলাতে পারবেন। সঙ্গে করে যদি নিয়ে যেতেন ভালই হত। জানি না এর পর ও কি করবে। যা সব শুনছি।

—ওর জন্যে আর দুঃখ করে লাভ নেই পদ্মিনী। ও ঘর পোড়া গরু। তুমি ওকে আর বাঁধতে পারবে না। ওর পোড়া ঘরে এবার সর্বনাশের আগুন লেগেছে। শুনছি পূর্ববাঙলার বড়বড় সহরে 'নাপাম' বোমার বর্ষণ হয়ে গেছে। ওদের গোটা জাতটা ধ্বংসের মুখে। তুমি একলা শেখরকে বাঁধতে—

—বাড়ী এসে গেছে। আমি যাই। আপনাকে আজ আর কফি দিতে পারলাম না। এখুনি হাসপাতালে যাব।

—দরকার হলে টেলিফোন কোর' পদ্মিনী। যদি আজ রাতে কিছু হয়, আমি হাসপাতালে চলে আসব। আজ আমার অনেক কাজ। বেরোবনা কোথাও।

পদ্মিনীকে বললাম, অনেক কাজ, কিন্তু কাজে মন বসল না। দেশ থেকে বন্ধুর চিঠি পেয়েছি আজ। পূর্ববাঙলার ভয়াবহ সংবাদে ভরা। সঙ্কট শুধু—পূর্ববাঙলায় নয়, এবার ভারতেও। উনিশশো ছাপান্ন সালে ভারত পাকিস্তানে একবার যুদ্ধ বেধেছিল। তারপর দুটো দেশেই এই পনেরো বছরে দুটো ভিক্ষাপাত্রে অনেক আনি দুয়ানি, অনেক বাতিল যুদ্ধ-সরঞ্জাম সঞ্চয় করেছে। ফলে আজ উভয়েই আবার যুযুধান। আবার বাকি বিশ্ব দুজোড়া শীর্ণ পায়ে ধারালো নখর বেঁধে দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আখাড়ায় ছেড়েছে। চারিদিকে লাগলাগ রব। আট হাজার মাইল দূরে বসে দুটো ফাইটার-ককে'র ডানা ঝাপটানর আস্ফালনধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আবার বাধবে। আবার ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচরের খাতে বহু মিলিয়ন ডলার গড়াবে। এক যুদ্ধের ক্ষত সারতে না সারতেই পরেরটার জন্য আমাদের তৈরী পাবে আমাদের চালক শক্তি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমরা আর একটি ভারতীয় সামরিকের জন্মক্ষণের প্রতীক্ষায় রয়েছি। অক্সফাম প্রতিষ্ঠান তার ক্ষীণখর্ব দেহের ছবি তুলবে প্রোটিন-

পুষ্ট কোন মার্কিনী শিশুর পাশে বসিয়ে। দরদে গদগদ ক্যাপ্‌শন্‌ দিয়ে প্রোপাগাণ্ডা ছাপাবে সেরা দেশের সেরা সাময়িকী গুলোয়। যারা অনেক ভাল খাবার ফেলে দেয়, তারা উপদিষ্ট হবে এই অনাহারী ক্লিষ্টদের জন্য একটু সহানুভূতিশীল হতে। যাদের অনেক দামী কাপড় ওয়াড্রোবে পড়ে পড়ে পাটে পাটে ছিড়ে যায়, তারা এই অর্ধনগ্নদের জন্য সঞ্চয় করবে টেটেরণের লজ্জাবস্ত্র। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বাঁচার ন্যূনতম সংগতি। তাদেরই আর একজন আসছে। সুকান্তের কবিতা পড়ে সাবাস সাবাস করেছি—জঞ্জাল সরাইনি।

নীচে নেবে ব্রটি-ফেরির নার্সিং হোমে টেলিফোন করলাম। মিসেস্‌ চৌহানকে এখন এ্যাটেণ্ড করছে মুন্নির পরের ভাই। তার বয়েস তেরো। টেলিফোন ধরে বলল, দিদি অর্থাৎ পদ্‌মিনী আসেনি। ও নিজে এসেছে মুন্নির সঙ্গে। মুন্নি বেরিয়ে গেছে তার এক বন্ধু অর্থাৎ ছেলে বন্ধুর সঙ্গে। কখন ফিরবে, বলে যায়নি। আমি যখন টেলিফোন ছেড়েছি তখন রাত সাড়ে দশটা। মিসেস্‌ চৌহান কেমন আছেন জানা গেল না।

হাসপাতালের ফোন কেটে আবার আমি পদ্‌মিনীদের বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে টেলিফোন করলাম। ওরা ওই বাড়ীরই একটা অংশ নিয়ে থাকে। জানলাম পদ্‌মিনী বাড়ীতে নেই। অনেকক্ষণ ধরে থাকার পর ওর বেকার বাবা এসে টেলিফোন ধরলেন। কাংসকণ্ঠে যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়, আমায় জ্বালিও না, আমি কিছুই খোঁজ রাখি না। আমি ফোন কেটে দিলাম।

আবার আমার ঘর, আমি একা। টেবিলে কাজ জমে পাহাড় হয়ে রয়েছে। সামনে ব্রটি-ফেরির মরা সমুদ্র। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাজে মন বসে না। শেখর পদ্‌মিনী দুজনেরই গতিবিধি রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

ফার্থ-অফ-টে। পাড় বাঁধান সমুদ্র। জোয়ার ভাটার সঙ্গে এর উত্থান পতনও কোনদিন লক্ষ্য করিনি। মরা মাছের চোখের মত নিথর! জলের দিকে চেয়ে থাকলে এখন পদ্মা মেঘনার কথাই মনে পড়ে। আট হাজার মাইল দূর থেকে রক্ত হিম করা বর্বরতার খবর আসছে সভ্যতার এই কুশীলবদের দেশে। গান্ধী সুরাবর্দীর দূরদর্শিতার উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করছে বেয়নেটে বিদ্ধ শিশু, নিহত বিদ্রোহীর ধর্ষিতা প্রিয়া। ইহুদী রক্তে নাৎসী জার্মানীর হোলি খেলার এতগুলো বছর পর বিশ্বসভ্যতা আজ আবার তার উন্মেষ মুহূর্তের ইতিবৃত্ত লিখছে।

এখন রাত গভীর। শীতার্ত এই ভূখণ্ডের সুখী মানুষগুলো প্রিয়তনুলিপ্ত

উষ্ণতার আশ্রয়ে ধর্ষিতা বাঙলার কথা ভাবছে না। হিথ্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গেছেন পূর্ববাঙলার প্রতিনিধি—তাতে তাঁর নিদ্রা কতটা বিঘ্নিত কে জানে। ভুললে চলবে না, স্বাধীনতার অনেকগুলো বছর আগে ক্রীপস্‌ সাহেবকে আমরা ধূলো পায়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তেইশ বছর আগে আমরা ওদের দায়মুক্ত করেছি। এখন আমরা সাবালক—সয়ম্ভরতার দৌড়ে যথেষ্ট অগ্রণী। ঘনঘন এই ঢাক পিটিয়েছি।

ছোট ঘরটার মধ্যে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি। টেবিলের ওপর ফেলেরাখা কাজের স্তূপ। যে কটা দিন বিদেশে থাকব তার প্রতিটি মুহূর্ত কোম্পানীর স্বার্থে লাগাব, আসার আগে মালিককে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম। এখন পূর্ববাঙলার চিন্তা আমায় নিষ্ঠা আমার ইমান চেতন আদর্শের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমার সমস্ত পরিকল্পনা শেখরকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছিলাম। সে পরিকল্পনা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

হঠাৎ শুনলাম নীচে টেলিফোন বাজছে। এখানে ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই। নীচে আছে এজমালি একটাই। তর তর করে নেবে গেলাম। তারের ওদিকে পদ্‌মিনী। রাত প্রায় তিনটে।

কান্নায় পদ্‌মিনীর গলা বোঁজা। কোনক্রমে শুধু এইটুকু বোঝাতে পারল, ও কোথা থেকে কথা বলছে। আকুতি জানাল, আমাকে যে করেই হোক এই মাত্র ওর কাছে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে টেলিফোন করে একটা এমারজেন্সি কল দিলাম। আমি তৈরী হয়ে নেবার আগেই নীচে জানলার তলায় এসে দাঁড়াল একটা গাড়ী। দুটো সংক্ষিপ্ত হর্ণ দিল।

এ্যানগ্‌স রোড ধরে উত্তর পশ্চিম মুখো গাড়ী ছুটেছে। রাস্তার দুপাশে ঘন বন। ইংরেজ ড্রাইভারের চোখে মুখে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। ডাণ্ডি ছাড়িয়ে আমি চলেছি কুপার এ্যানগ্‌স-এর দিকে। মাঝে পড়বে মুয়ের-হেড নামের ছোট একটা গ্রাম। তার একটু এদিকেই স্ক্রাপ্‌ রিক্লেম অর্থাৎ জঞ্জাল পুনরুদ্ধার করার সেই ছোট কারখানা। পদ্‌মিনী ওখান থেকেই ফোন করেছে।

খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। রাস্তার একদিকে বরফে ঢাকা প্রান্তর। অন্যদিকে সীমাবদ্ধ একটুকরো জঙ্গল। আশে পাশে আর কোথাও বরফ ছাড়া

কিছু নেই। জনমানব শূন্য এমনি স্থানে একটা এ্যাসবেস্‌টাসের ছাতে ঢাকা সেরামিক্ ইটের হলঘর। সামনেই একটা বন্ধ রেলিং-শার্টার। কোথাও থেকে একটা কুকুরের ডাকের আওয়াজ আসছে শুনতে পাচ্ছি।

আমি নামলাম। ইংরেজ ড্রাইভার একবার নির্লিপ্ত ভাবে জানতে চাইল, অপেক্ষা করবে কিনা। আমি বললাম দরকার হলে টেলিফোন করব। ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে ডাণ্ডির দিকে ফিরে গেল। এমনি সময় আমার খুব কাছেই কুকুরের ডাক শুনতে পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম আমি। তারপর ধারণাই করতে পারিনি এমনি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কারখানার সামনে ওই রোলিং শার্টারটা ছাড়া আর বোধহয় কোন দরজা নেই। পেছন দিকে এমনি আর একটা শার্টার থাকা সম্ভব। তলায় বারোফিট সেরামিক ইটের দেয়াল। ওপরে ছাত পর্যন্ত ছোঁয়া ঘসা কাঁচের বেষ্টনী। এ্যাসবেস্‌টাসের ছাতের ওপর বরফ জমে রয়েছে। হলটার চারদিকে শুধু বরফ।

আমি দেখলাম পদ্‌মিনীর ওল্ড-টম উন্মত্তের মত ওই দেয়ালের গায়ে গায়ে আঁচড়ে কামড়ে ভেতরে ঢোকার নিষ্ফল চেষ্টা করছে। ওর গলা থেকে ক্রোধে ক্ষোভে মেশান অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ছুটে এলো। আমার ওভারকোট কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল রোলিং-শার্টারটা পর্যন্ত। তারপর আবার ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় উন্মত্ত লাফালাফি আরম্ভ করল।

শার্টারে তালা বন্ধ। আশেপাশে লোহালক্কড়ের অভাব ছিল না। ভেঙে ফেলতে সময় লাগল না। শার্টারটা খানিকটা তুলে ধরা মাত্র ওল্ড-টম তার বিরাট দেহটা তার তলায় গুঁজে দিল। পরক্ষণেই দেখলাম মাটি শুঁকতে শুঁকতে ভেতরের দিকে ছুটছে। ওর অবিশ্রান্ত ডাকের প্রতিধ্বনি উঠছে হল ঘরের ভেতর।

পদ্‌মিনী ছুটে বেরিয়ে এসেই একবার আমাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। ওল্ড-টম্ ততক্ষণে ওর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। হাঁটু মুড়ে নোংরা মেঝের ওপরেই বসে পড়ল পদ্‌মিনী, কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ একটা অবলম্বন খুঁজছিল। একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

আমি আর এগোইনি। দূরে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছি। চারিদিকে শুধু

আবর্জনা। আলো অন্ধকারের মধ্যে নোংরা মেঝেয় পদ্‌মিনী ওল্ড-টমের গলা জড়িয়ে ধরে থরথর করে কেঁপে যাচ্ছে। ওর গলার কোন আওয়াজ পাচ্ছিনা। ওল্ড-টমের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছি এতটা দূর থেকেও।

শেখর কোথায় জানিনা। কোন পাকে পড়ে এই দুপুর রাতে পদ্‌মিনী একা এখানে বন্দী দশায় তাও জানিনা। জানিনা-এর মাঝে আমার নিজের কি ভূমিকা। একবার মনে হ'ল, কোন কষ্ট কল্পিত রোমাঞ্চ কাহিনীর শেষ দৃশ্যে সম্মানীয় অতিথি শিল্পির ভূমিকা দেওয়া হয়েছে আমাকে। আগে কি ঘটে গেছে পরে কি ঘটতে যাচ্ছে দুইই আমার অজানা। ডাণ্ডি ছেড়ে গেলে আমার সঙ্গে আর কোন যোগসূত্র থাকবে না।

হলের মধ্যে ঘষা কাঁচের তৈরী একটা কেবিন গোছের। কনট্রাকটর সাহেবের ঘর। দরজা বন্ধ। কাঁচ অনেকটা ভাঙ্গা। ভেতরে টেলিফোনটা দেখা যাচ্ছে। কাঁচ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে পদ্‌মিনী। আমায় টেলিফোন করেছে।

শেখরের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে দিল পদ্‌মিনী। ও নিজে বাঙলা জানেনা, শেখরের হিন্দী জানার কথা নয়। চিঠি তাই ইংরিজিতে। লিখেছে, দেশে ফিরবার হঠাৎ সুযোগ পেয়েছি। আমি চললাম। খবর পেয়েছি, বাঙলার মুক্তিসেনার পেছনে আছে ভারতের নৈতিক সমর্থন, সামরিক সাহায্য। জয় আমাদের অনিবার্য। তবু তোমার আমার মাঝে অনেক প্রাচীর থেকে যাবে। তাই যে কথা কোনদিন প্রকাশ হয়নি, আজও লিখে যেতে পারলাম না। দুটো স্বীকারোক্তি করে যাবো, তাই এই চিঠি। আমার সোনার বাঙলার স্বার্থে তোমার গ্রেটেস্ট্ ট্রেজার উৎসর্গ করে গেলাম—আল্লাহ্ তোমায় রক্ষা করুবেন—এইটুকু ভরসায়। অন্যকথা—আমিও ভ্রষ্ট। মুন্নির গর্ভে তার প্রমাণ রেখে গেছি। ভট্‌চাযদার দয়ার দান স্বাধীন বাঙলার এক উত্তরপুরুষের ভ্রূণ উচ্ছেদের কাজে লাগিও—তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বাঙলার মাটিতে কোন পাঠানের গুলিতে প্রাণ দেব, ততদিন তোমার ধিক্ শতধিক্ আমার কোরাণ মন্ত্র হয়ে থাক। ফি-আমান্-ইল্লাহ্।

পদ্‌মিনীর কাছে গিয়ে মেঝে থেকে ওকে তুললাম। এই চিঠি পড়ার পরও একা ও এখানে কোন সাহসে এসেছে? আমায় কেন জানায় নি? ও বলুক আমাকে।

আমার অভিযোগের সঙ্গে স্নেহস্পর্শ ছিল। পদ্মিনী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আর আমায় কোন প্রশ্ন করতে হয়নি। ওর কান্নায় তরল একখণ্ড কাহিনীর সঙ্গে সভ্য মানুষের বর্বরতার এমন এক ইতিহাস শুনলাম যা ওদিকে পূর্ববাঙলার বুকে তখন মহাকাব্য রচনা করছে। সেই আদিম রিরংসার ইতিহাস।

পদ্মিনী গুছিয়ে কিছু বলে উঠতে পারে নি। তার প্রয়োজনও ছিল না, যা ঘটেছে তা অনুমান করে নেবার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা ছিলনা।

আমার দুবাহুর মধ্যে পদ্মিনীর লাঞ্ছিত কলুষিত দেহটা তখন থরথর করে কেঁপে যাচ্ছে। ওর রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে বারবার একটা অভিযোগ গুমরে উঠছে—ওর ভাগ্যে যদি এই ছিল, তবে সেদিন ভোরে আমি কেন—

—বলুন কেন? বলুন কেন? আমার বুকে নিদারুণ ক্ষোভে দশখানা আঙুলের নখ বসিয়ে দিচ্ছে পদ্মিনী। বিকৃতস্বরে বারবার ওই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। অশ্রুর লেশ মাত্র আর ওর চোখে নেই। ওর মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমি যেন পুড়ে যাচ্ছি।

অনেক জঞ্জাল পেছনে ফেলে আবার বরফে ধোয়া রাজপথ। সংকীর্ণ ফুটপাথের ওপর দুপাশে বরফ জমে পাথর হয়ে রয়েছে। পদ্মিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি আমি। ওল্ড-টম আমাদের অস্থির করে তুলছিল। ও জায়গা আর নিরাপদ নয়—ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করারও ঝুঁকি নিইনি আমি। তার চেয়ে ভোরবেলার এই হাইওয়ে বেশী নিরাপদ। এখন ভোরের আলো ফটফট করছে।

এরপর পথে কোন গাড়ি থামিয়ে লিফট্ নেওয়া, ডাণ্ডি ফিরে পরদিন থেকে আবার কর্তব্যের ঘানি টানা—এ গল্পের এটাই শেষ আর সহজ পরিণতি হতে পারত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল ওল্ড-টমের অভিপ্রেত অন্যরকম। ডাণ্ডির দিকে না ঘুরে ও চলল তার উল্টো দিকে—মুয়ের হেড গ্রামের দিকে। বরফ শুকতে শুকতে কিছুদূর যায় আবার লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে পদ্মিনীর কোট কামড়ে টানতে আরম্ভ করে।

ভীষণ পেছল পথ। হাঁটার অযোগ্য। ভোর রাতে এখন আর গাড়ীও যাচ্ছে না। আমরা তাই আইন না মেনে হাইওয়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি।

পদ্মিনীর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, ওর দেহভার কিছুটা আমার ওপর, তবু যথাসাধ্য দ্রুত ওল্ড-টমকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি দু'জনে। কি উদ্দেশ্যে ওযে আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে আমরা যেন তখন সেটুকু কৌতূহলেরও উর্দ্ধে।

মুয়ের-হেড পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে চলল ওল্ড-টম। এরপর সামনে শুধু বরফ আর বরফ। যতদূর দৃষ্টি যায় মানুষের বসতি নেই। পথ আবার দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। সামনে দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা পাহাড়। সম্ভবতঃ নিউটাইল হিলের স্কিঙ্-রেঞ্জ। শনি রবিবারে দলে দলে স্কচেরা ওখানে স্ফূর্তি করতে যায়। এখন কুয়াশায় অস্পষ্ট।

পথের ওপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওল্ড-টম। চারপাশে ঘুরে ঘুরে বরফের ঘ্রাণ নিচ্ছে। তারপর হঠাৎ পথ ছেড়ে বাঁ দিকে ঢালুর মধ্যে নামতে লাগল।

এখান থেকে পথের ধারে ঢালু খাদ। খাদের বুকে অসমতল জমিতে বরফ জমে পাথর হয়ে রয়েছে। আমরা এগোতে পারছিলাম না। ওল্ড-টম একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দূরে কিছু লক্ষ্য করল। ওর গলা দিয়ে চাপা আওয়াজ বেরুচ্ছে। হঠাৎ বিকট চীৎকার করে ছুট দিল।

আমাদের দু'জনের চোখের সামনে বরফে ঢাকা খাদের মধ্যে গড়াতে গড়াতে ছুটে চলে গেল ওল্ড-টম।

খাদের নীচে জমি আবার সমতল। হঠাৎ চোখে পড়ল বরফের ওপর থেকে উজ্জ্বল রূপোলী আলো ঠিকরে উঠছে জায়গা জায়গা থেকে। সামনে খাদের গায়ে, নীচে সমতল জমিতে ওই উজ্জ্বল রূপোলী আলোর পুঞ্জগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে ছোট বড় গোল বলের মত কি যেন পদার্থ জমে রয়েছে।

পদ্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে বহুকষ্টে নীচে নামলাম আমি। ওল্ড-টম বরফের ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিল। ততক্ষণে বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আবার উপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ আমাদের আরও টেনে নিয়ে যাবে।

আর একটু এগিয়েই আমরা দু'জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম হঠাৎ। সেইখানে দাঁড়িয়ে সামনের সেই অসহনীয় দৃশ্য দেখলাম যা দেখতে ওল্ড-টম আমাদের এতদূর টেনে এনেছে।

আমাদের পেছনে বরফে ঢাকা চড়াই উঠে গেছে হাইওয়ে পর্যন্ত। সামনে বরফে ঢাকা প্রান্তর দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে। বহুদূর দৃশ্যমান, তার পেছনে

অস্বচ্ছ কুয়াশা। আমাদের পঞ্চাশ গজ দূরে আধখানা বরফে গাঁথা শেখর—শেখরের মৃতদেহ। ডান হাতটা উর্দ্ধে তোলা। সেইহাতে ধরা একটা অতি আধুনিক অটোমেটিক মেসিনগান। আরও পেছনে আর একটা অমনি অস্ত্র বরফে প্রায় ঢাকা পড়েছে। তারও পেছনে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে জঞ্জাল ফেলার পোর্টার ক্যাব'টা। চারপাশে অনেকগুলো ভাঙ্গা আধভাঙ্গা কাঁচের পাত্র। আর ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র ছোট বড় রূপোলী বল—তার থেকে চোখ ধাঁধান আলো ঠিক্‌রে আসছে। বলগুলো জায়গায় জায়গায় পুঞ্জ বেঁধেছে।

জঞ্জাল ফেলার পোর্টার ক্যাব'টা ওই উঁচু পথ থেকে পিছলে নীচে নেবে এসেছে। তার পেছনে ছিল শেখরের বদ হতে শেখার প্রথম পাঠ—অনেকগুলে পাঁচ লিটার মাপের মারকারির জার—পদ্‌মিনীর সতীত্বের মূল্য, যা পাচার করে শেখর লণ্ডন-রেঙ্গুন এয়ার-ফেয়ার জোগাড় করতে চলেছিল। কোথায় তা সে সেই জানে।

দুটো চোখ খোলা, ওপরের আকাশে নিবদ্ধ, উর্দ্ধে তুলে ধরে রেখেছে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন একটা আগ্নেয়াস্ত্র—শেখর আমায় বলেছিল, ও খালি হাতে ফিরবে না। দেহটা জমে পাথর হয়ে গেছে।

দু'চোখে একটা বোবা প্রত্যয় এখনো বাঙ্ময়—আমি দেশে ফিরব।

বরফের ওপর বসে পড়ে জরায় স্থবির ওল্ড-টম হাঁপাচ্ছে। আর দেহে মনে দেউলে এক জোগন্ সেইভাবেই বরফের ওপর দুহাতে মুখ গুঁজে বসে থরথর করে কেঁপে যাচ্ছে। সবচেয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আমি নিরাসক্ত ভাবে এই দৃশ্য দেখছি।

এখান থেকে দিকচক্রবালে বিস্তীর্ণ তুষার ঢাকা প্রান্তর। ইকুয়েটরের ছাপান্ন ডিগ্রী উত্তরে এই ভোর রাতে আকাশ ভরা উজ্জ্বল আলো ফুটেছে। বরফের বুকে প্রতিফলিত হয়ে সে আলো আরো উজ্জ্বলতর। পারার অজস্র ছোট বড় বর্তুলগুলো এখন এরমাঝে উজ্জ্বলতম আলোর উৎস।

একবার শেখরের কবিতাটার কথা মনে পড়ল। অমন পরিস্থিতির মাঝে আমি আর একবার কবিতাটার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করলাম। আমরা যে যার ছোট ছোট বৃত্তে নাপাক কোমোডে বন্দী কীটের মত উত্তেজক কিছু—চিত্র-কল্পের মধ্যে জীবনের সংজ্ঞা খুঁজে পাই। তারপর হঠাৎ একদিন শেকলে টান পড়ে। মোংরা পয়ঃপ্রণালীর মুক্তিপথে নদী থেকে সাগরে—কোমোডের বন্দীত্ব থেকে মহাভূমায় গিয়ে মিশি।

এই কি শেখর বলতে চেয়েছিল? আর কোনদিন জানা যাবে না, কি বলতে চেয়েছিল শেখর। প্রাণ দিয়ে ও শুধু প্রমাণ করে গেল—রিডিকুলাস্ থেকে সাব্‌লাইম—মাত্র একপদ।

ব্রটি-ফেরীর নার্সিং হোমে অবিভাজ্য বৃহত্তর ভারতের আর একটি উত্তরস্থরীর জন্মলগ্ন আসন্নপ্রায়। তার কনিষ্ঠের প্রাণবিন্দু মুন্নির নাপাক জরায়ু থেকে দুনিয়ার এই জঞ্জালে ছাড়পত্রের দাবীদার!

এখানে কুয়াশার তিমির ঘিরে ভোরের সূর্য উজ্জ্বল হচ্ছে।

## শুদ্ধি-পত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি, | যা আছে | যা হবে |
| --- | --- | --- | --- |
| ২১ | ২৫ | স্না।নাগার | স্ন্যাক্‌বার |
| ৩০ | ৭ | আঁধার | আঁধারে |
| ৩৭ | ১৫ | শীর্ষস্থান | শীর্ষে স্থান |
| ৩৭ | ২৭ | পরিচালিত | পরিশীলিত |
| ৪৫ | ২০ | সন্তানটির | সন্তান কটির |
| ৭০ | ২৯ | সীল গিরিরাজ | নীল গিরিরেখা |
| ৭২ | ২০ | বিদ্বেষী, ব্রতী | বিদ্বেষব্রতী |
| ৭২ | ২৭ | আমিষ ভোজি লোভী | আমিষলোভী |
| ৮১ | ১, ২৬ | লব্ধ প্রতিষ্ঠিত | লব্ধপ্রতিষ্ঠ |
| ৮৬ | ২৬ | শেষ অস্তিত্বটা | শ্বেত অস্তিত্ব |